ইসলামী
সমাজে
নারী

সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী

ইসলামী সমাজে নারী

মাওলানা সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৪৫

স্বত্ব ঃ আধুনিক প্রকাশনী

৩য় প্রকাশ

জিলকদ	১৪২৯
অগ্রহায়ণ	১৪১৫
নভেম্বর	২০০৮

বিনিময় ঃ ১৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

عورت اسلامی معاشره میں-এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMI SHAMAJE NARI by Moulana Sayyed Zalaluddin Ansar Umri. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 165..00 Only.

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১১
প্রাচীন যুগে নারী	১৫
গ্রীস, রোম এবং নারী	১৬
আরব এবং নারী	১৮
ইউরোপ ও নারী	২১
ধর্মের দৃষ্টিতে নারী	২৩
ইহুদী ধর্ম ও নারী	২৩
খৃস্টধর্ম ও নারী	২৫
হিন্দু ধর্ম এবং নারী	২৬
নারী ও আধুনিক মতবাদসমূহ	২৮
ইসলামী সমাজে নারী	৪০
মৌলিক ধারণা	৪০
১. মানুষ সম্মানিত সৃষ্টি	৪০
২. ঈমান ও আমল মর্যাদার মাপকাঠি	৪১
৩. নারী পুরুষ উভয়েই সভ্যতার নির্মাতা	৪৪
৪. নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	৪৫
৫. অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা	৫১
৬. অভিন্ন আইন	৫৬
৭. জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির বিধান	৫৮
নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র	৬১
পটভূমি	৬১
নারীর কর্মতৎপরতার মর্যাদা	৬২
সমাজ একটি একক	৬৮
সমাজে ব্যক্তির সফলতা লাভের পূর্বশর্ত	৬৯
নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৭১
জুমআ ও দুই ঈদের জামায়াতে মহিলাদের অংশগ্রহণ	৭৩
মা, বাপ ও স্বামীর প্রতি আদেশ	৭৬
লিখন শেখানো	৭৮
নারী শিক্ষার আইনগত মর্যাদা	৭৯
শিক্ষার সুযোগ সুবিধা	৮১
চিন্তাগত প্রশিক্ষণ	৮১

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাহাবাদের যুগ	৮২
ফলাফল	৮৩
লেখার প্রচলন	৮৯
জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান	৯০
কর্মক্ষেত্রে নারী	**৯৬**
ঘরের বাইরে কাজ করার অনুমতি	৯৯
কৃষিকাজ	১০০
ব্যবসায়-বাণিজ্য	১০০
শিল্প ও কারিগরি	১০১
অধিকার সংরক্ষণ	১০২
সামষ্টিক স্বার্থের জন্য প্রচেষ্টা	১০৫
ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর অবদান	**১০৭**
মুসলিম নারীর ত্যাগ ও কুরবানী	১০৭
সামরিক ক্ষেত্রে অবদান	১০৯
দীনের প্রতিরক্ষা ও এ ব্যাপারে উৎসাহ দান	১১৭
সত্যের প্রকাশ	১২১
সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপদেশ দান ও তার ফলাফল	১২৩
সমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা	১২৯
মতামত ও পরামর্শের অধিকার ও তার সুফল লাভ	১৩০
বাস্তব সহযোগিতা	১৩৫
নারী এবং সামাজিক পদমর্যাদা	**১৩৮**
নারীর চিন্তা শক্তি	১৩৮
নারী দুর্বল	১৩৮
নারীর দুর্বলতার প্রতি সুবিচার	১৩৯
নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা	১৪১
নারীর সাক্ষ্য	১৪২
শুধু মহিলাদের সাক্ষ্যদান	১৪৩
নারী ও পুরুষের সম্মিলিত সাক্ষ্য	১৪৬
সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্যতা	১৪৭
নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে ফিকাহবিদদের ধ্যান-ধারণার পর্যালোচনা	১৪৮
সাক্ষ্যদান চার প্রকারের	১৫৩
হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে নারীর ওপর আস্থা	**১৬৩**
নারীর যোগ্যতা	**১৬৫**

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বতন্ত্র নারী সংগঠন	১৬৮
নারী এবং নেতৃত্বের পদমর্যাদা	১৭৩
নারী কোন প্রকার সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য ?	১৭৫
কয়েকটি মূলনীতির অনুসরণ	১৭৬
(১) বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থাকা	১৭৬
(২) স্বামীর আনুগত্য	১৭৭
নারীর যোগ্যতা	১৮০
(৩) অবাধ মেলামেশা বর্জন	১৮৪
বিভিন্ন যুদ্ধে মহিলাদের অংশ গ্রহণ কি নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রমাণ ?	১৮৯
ইতিহাস থেকে একটি ভ্রান্ত প্রমাণ ও তার পর্যালোচনা	১৯৩
যৌন সম্পর্ক	২০৫
প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত	২০৫
বৈরাগ্যবাদ	২০৭
অবাধ যৌনাচার	২১২
আধুনিক যুগ	২১৫
ইসলাম ও যৌন সম্পর্ক	**২৩২**
আল্লাহভীরুতার বৈরাগ্যবাদী দৃষ্টিকোণ	২৩২
যৌন তৃপ্তি (বৈধ সীমার মধ্যে)	**২৪০**
ব্যাভিচার হারাম	২৪৫
ব্যভিচার হারাম হওয়ার কারণসমূহ	২৪৬
ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ	**২৫০**
মহত্ত্বের অনুভূতি	২৫০
বিবেকের আহ্বান	২৫১
লজ্জাবোধের লালন	২৫৩
আখেরাতের মুহাসাবা	২৫৬
গোনাহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা	২৬০
স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের জন্য পরীক্ষা	২৬০
ব্যভিচারের পরিণাম	২৬১
পবিত্রতার পুরস্কার	২৬২
বিয়ের উদ্দেশ্য	২৬৩
লক্ষ অর্জনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা	২৬৫
লক্ষ অর্জনের অনুকূল কারণসমূহ	২৬৮

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ	২৭৫
দৃষ্টি আনত রাখা	২৭৬
শ্রবণ শক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা	২৭৮
জবানের হিফাজত বা বাক সংযম	২৭৯
পোশাকের গুরুত্ব	২৮০
বেগানা নারীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত নিষিদ্ধ	২৮১
সমাজ সংস্কার	**২৮৩**
মতবাদ বা আদর্শিক শক্তি	২৮৬
নৈতিক চরিত্রের মূল্য ও মর্যাদা	২৮৮
ব্যভিচারীদের হেয় করা	২৮৯
অবিবাহিত বা কুমার জীবনের উচ্ছেদ সাধন	২৯০
চার স্ত্রী রাখার অনুমতি	২৯২
নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার	২৯৩
বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার	২৯৫
বৈধ সম্পর্কের মর্যাদা	২৯৫
সামষ্টিক অনুভূতি	২৯৭
ইসলামী আইন	**৩০১**
এক ঃ স্থায়ী হারাম	৩০১
দুই ঃ গোপন সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৩০২
তিন ঃ বেশ্যাবৃত্তি পেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা	৩০২
চার ঃ অবাধ মেলামেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা	৩০৫
পাঁচ ঃ অশ্লীলতার প্রচার অবৈধ	৩১০
ছয় ঃ তাযীর	৩১২
সাত ঃ পাথর ও বেত্রাঘাতের শাস্তি	৩১৪

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নারী মানবতার অর্ধেক। পুরুষ মানবতার একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করলে আরেকটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। নারীকে উপেক্ষা করে মানবতার জন্য যে কর্মসূচীই তৈরী হবে তা হবে অসম্পূর্ণ। আমরা এমন কোনো সমাজের কল্পনাই করতে পারি না যা কেবল পুরুষ নিয়ে গঠিত, যেখানে নারীর কোনো প্রয়োজনই অনুভূত হয় না। নারী ও পুরুষ সমানভাবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী। নারী যেমন পুরুষের প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয় তেমনি পুরুষও নারীর প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়। তাদের উভয়ের মুখাপেক্ষীতা যেমন সামাজিক ও পারস্পরিক মেলামেশার, তেমনি যৌন এবং মনস্তাত্ত্বিকও। একদিকে সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন তাদের কাছে দাবী করে পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার, অপরদিকে যৌন চাহিদা তাদের বাধ্য করে পরস্পরের কাছে প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুসন্ধানের।

নারী ও পুরুষ উভয়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন যদি সঠিক এবং যৌন সম্পর্ক যদি বৈধ হয়, নারীর চেষ্টা-সাধনায় যে শূন্যতা থেকে যায় তা পুরুষ পূরণ করে এবং পুরুষের চেষ্টা-সাধনায় যে ঘাটতি ও অভাব থেকে যায় তা যদি নারী পূরণ করে, অনুরূপ যৌন সম্পর্ককে স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকতে দেয়া হয় এবং তাকে মজা লুটবার উপায় মনে করা না হয় তাহলেই কেবল সামাজিক জীবন উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু যদি নারী ও পুরুষের সামাজিক বন্ধন ও আচরণগত সম্পর্ক অসামঞ্জস্য এবং যৌন সম্পর্কে ভারসাম্যহীনতা থাকে তাহলে সমাজ পতন ও অবনতির দিকে ধাবিত হতে থাকে, কারণ সামাজিক বন্ধনে ভারসাম্য না থাকার ফলে সামাজিক জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্র শূন্যতায় ভরে যেতে থাকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হতে থাকে। এ দুটি অবস্থাই সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক। অনুরূপভাবে যৌন সম্পর্কে ভারসাম্যহীনতার দ্বারা সমাজ পথভ্রষ্টতার শিকার হয় কিংবা কৌমার্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইতিহাস বলে, যেসব জাতির মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা বেশী দিন জীবিত থাকতে পারেনি। আর কৌমার্য প্রীতি তো কোনো সভ্যতার পত্তনই হতে দেয়নি।

বর্তমান সভ্যতা নারী এবং পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি যৌন সমস্যার সমাধান দিতেও ব্যর্থ

www.bjilibrary.com

হয়েছে। এ সভ্যতা নারী এবং পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করতে যে ভুল করেছে তাহলো নারীকে সে তার অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে পুরুষের কাতারে দাঁড় করিয়েছে। নারীকে তাই পুরুষের কর্ম ক্ষেত্রে তৎপর থাকতে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতি যে ময়দানের জন্য তাকে সৃষ্টি করেছিল সে ময়দানে সে অনুপস্থিত। বর্তমান সভ্যতা যৌন আবেগ উত্তেজনাকে এতটা উত্তেজিত করেছে যে, তা মানুষের মন-মগজকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে মনোযোগ সরে যাচ্ছে এবং মজা লুটবার প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান তামাদ্দুনিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য যে, নারী ও পুরুষের ভ্রান্ত সম্পর্ক বর্তমান সভ্যতার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে এবং মানুষকে এমন এক অবস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যেখানে আরাম ও প্রশান্তির শত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সে তা থেকে বঞ্চিত।

এ পরিস্থিতিতে ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা কি তা এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়া স্বীকার করুক বা না করুক এটা সমসাময়িক সমাজ চিত্রে কোনো জোড়াতালি দেয়া নয় বরং এ যুগের জন্য তা এক নতুন ও ভিন্ন চিত্র। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কেবলমাত্র ইসলামী সমাজই নারী ও পুরুষের সামাজিক ও যৌন সম্পর্কের সঠিক ভিত্তি সরবরাহ করেছে। এ ভিত্তির ওপর যে সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে তা হবে সফল। এসব বাদ দিয়ে যে অনুভূতির ওপরই সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে তার ব্যর্থতা নিশ্চিত। ইসলামী সমাজে নারীর রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মর্যাদা কি কেউ যদি তা জানতে চায়, তাহলে এ গ্রন্থে সে এ বিষয়ে সন্তোষজনক তথ্য পাবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তা সবকিছু কুরআন ও হাদীসের আলোকে বলতে এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রমাণসহ পেশ করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এমন কিছু বিষয় এবং বক্তব্যও এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই। এসব বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে। কারণ ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্র এ উম্মতের সর্বোত্তম মেধা ও ধীশক্তির উৎপন্ন ফসল, যাদের গোটা জীবন কিতাব ও সুন্নাতের ইংগিত ও গূঢ় তত্ত্ব উদঘাটনে নিবেদিত ছিল। অতএব এ জ্ঞানভাণ্ডার নিসন্দেহে নির্ভরযোগ্য। তবে তার স্থান ও মর্যাদা কিতাব ও সুন্নাহর পরে। সুতরাং যেখানেই কোনো ধ্যান-ধারণা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী বলে দেখতে পেয়েছি অত্যন্ত সতর্কভাবে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছি এবং নিজের মতামত দলীল প্রমাণ সহ পেশ করেছি। তবে যে কোনো অবস্থায় আমার নিজের মতের যাঁচাই ও সমালোচনার অবকাশ

www.bjilibrary.com

রয়েছে। কলম থেকে একথাগুলো বেরিয়ে আসছে আর সাথে সাথে মন সবরকম জ্ঞানগত সমালোচনাকে স্বাগত জানানোর জন্য উন্মুখ ও প্রস্তুত হয়ে আছে। এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি

জালালুদ্দীন

৩০, জানুয়ারী, ১৯৬০ইং

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাচীন যুগে নারী

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রায় তিনশ' কোটি লোকের বাস।[১] শত-সহস্র ভাষায় তারা কথা বলে। তাদের জীবন যাপন, বসবাস, খাওয়া-দাওয়া, বিয়ে-শাদী এবং সুখ-দুঃখ প্রকাশের পন্থা ও পদ্ধতি নানা ধরনের। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা অনুসারে মানব জাতির বয়স দু'লাখ বছরেরও বেশী। এ দীর্ঘ কালপরিক্রমায় মানুষকে কি কি পরিস্থিতি ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে, কি কি পর্যায় অতিক্রম করে তারা বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, বিশ্বের কোন্ কোন্ স্থানে তাদের বসবাস ছিল, তারা কতটা জাতি-গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত ছিল, কোন্ বিশেষ যুগে কোন্ কোন্ শিল্প তারা আবিষ্কার করেছে এবং তারা কি অসভ্যতার অন্ধকার থেকে তাহযীব-তামাদ্দুনের দিকে অগ্রসর হয়েছে না উন্নতি ও সভ্যতার সাথে পূর্বেও তারা পরিচিত ছিল ? এটি এবং এ ধরনের আরো যত প্রশ্ন আছে সে সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ তার অতীত সম্পর্কে খুব কমই অবহিত। সত্তর বছরের একজন বৃদ্ধ তার জীবনের একটি বছরকে যেমন জানে মানুষও তার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে ততটুকুই জানে। তা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে অন্তত এতটুকু বলা যায়, মানব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতায়। এভাবেই তার বংশবৃদ্ধি ঘটেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য ও তাহযীব-তামাদ্দুনের ক্রমোন্নতি হয়েছে।

নারী ও পুরুষের প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক ছাড়া মানুষের মধ্যে আরো যে সব সম্পর্ক ও ঘনিষ্টতা আছে তা হয় এ প্রেম-প্রীতির প্রত্যক্ষ ফল নতুবা বাহ্যিক কোনো কার্যকারণ বা পরিস্থিতির সৃষ্টি। যেখানে এসব কার্যকারণ অনুপস্থিত সেখানে এসব সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না।

এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীকে ভালোবাসে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং এক পথচারী আরেক পথচারীর সমমনা হয়, অনুরূপভাবে এক শিক্ষার্থী আরেক শিক্ষার্থীর, এক ব্যবসায়ী আরেক ব্যবসায়ীর এবং একই পেশার একটি লোক আরেকটি লোকের সাথে নৈকট্য ও ঘনিষ্টতা অনুভব করে। কিন্তু দু'জনের প্রেক্ষিত পাল্টে যাবার সাথে সাথে তারা

১. লেখক ১৯৫৯ সনের শুরুতে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন।—অনুবাদক

www.bjilibrary.com

পরস্পরের কাছে অপরিচিত হয়ে যায় এবং তাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে নারী ও পুরুষের ঐক্যের ধরন এ নয় যে, কোনো শ্রেণীগত বৈশিষ্টাবলী কিংবা তামাদ্দুনিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শুরু করেছে বরং তাদের সম্পর্ক এমন একটি প্রকৃতিগত আকর্ষণের প্রকাশ যা তাদেরকে পরস্পর একত্র থাকতে বাধ্য করে। এজন্য বাহ্যিক কোনো কার্যকারণ ছাড়াই তারা একে অপরের দিকে এগিয়ে যায়। অথচ তাদের পসন্দ অপসন্দ এবং কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

নারী তার দেহের খুন দিয়ে মানব-বংশ ধারাকে লালনপালন করতে পারে ঠিকই কিন্তু ভূমি কর্ষণ করে নিজের আহার্যের সংস্থান এবং তীর-ধনুক হাতে শত্রুর মোকাবিলা করা তার জন্য অসম্ভব। কেননা, প্রকৃতি তাকে লৌহদৃঢ় পাঞ্জা এবং শক্তিশালী বাহু দান করেনি। তবে তার হৃদয়ে আছে স্নেহ-ভালোবাসা, সমবেদনা ও ত্যাগের স্পৃহা। তাই শিশু সন্তানের দেখা শোনা, ঘর সামলানো, খাবার তৈরী ও পোশাক প্রস্তুত করা সব সময়ই নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু পশু শিকার, কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দুশমনকে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব সব সময় পুরুষরা পালন করেছে। কারণ সে কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। আর এসব কাজের উপযোগী দৃঢ় বাহুও তার আছে।

কিন্তু নারী ও পুরুষের শক্তি ও যোগ্যতার এ পার্থক্য ইতিহাসের অধিকাংশ যুগে তাদের মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষের আছে বলবীর্য ও শক্তিমত্তা। তাই যেসব কাজ সে সহজেই করতে সমর্থ হয় নারী তা নিজের সাধ্যাতীত বলে মনে করে। এ কারণে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। কিন্তু তার পাশে নারীকে তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের মনে হয়েছে। কারণ সে দুর্বল এবং অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের মুখাপেক্ষী। তাই যেসব দেশ ন্যায় ও ইনসাফের জন্য খ্যাত ছিল, যেখানে রাতদিন নৈতিকতা ও মানবাধিকারের শিক্ষা দেয়া হতো সেসব দেশেও পুরুষের প্রাধান্য ছিল একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। আর সেখানে নারীকে অবজ্ঞা ও অবমাননার দৃষ্টিতে দেখা হতো। তাকে পশুর মতো কেনা বেচা করা হতো। এমন কি কখনো কখনো তাকে ওসব অধিকার থেকেও বঞ্চিত রাখা হতো যা ওই দেশে জীব-জন্তুও ভোগ করতো।

গ্রীস, রোম এবং নারী

প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কিছুটা বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য গ্রীক ও রোমান যুগ থেকে পাই। তারা তাহযীব-তামাদ্দুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় এতদূর উন্নতি করেছিলো যে, তার ওপর ভিত্তি করে অনেক

www.bjilibrary.com

সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এতসব উন্নতি সত্ত্বেও তাদের সমাজে নারীর স্থান ছিল অনেক নীচে। তারা নারীকে মানবতার জন্য একটা দুর্বহ বোঝা মনে করতো। সেবিকা হিসেবে পরিবারের মানুষের সেবা করা ছাড়া তাদের কাছে নারীর আর কোনো জীবন লক্ষ ছিল না।

গ্রীকরা যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও নারী সম্পর্কে এমন সব ধ্যান-ধারণা পোষণ করতো যা শুনে হাসি সম্বরণ করা কঠিন। কিন্তু তা দ্বারা তাদের দৃষ্টিতে সমাজে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান কি ছিল তা সহজেই বুঝা যায়। তারা বলতো, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার এবং সর্প দংশনের প্রতিকার সম্ভব কিন্তু নারীর কু-প্রভাব ও অকল্যাণের প্রতিকার সম্ভব নয়। পেণ্ডোরা নামের এক নারী সম্পর্কে তাদের সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, সে-ই সবরকম পার্থিব বিপদ আপদের উৎস। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, দুটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের জন্য আনন্দের কারণ। এক, বিয়ের দিন এবং দুই, তার মৃত্যুর দিন।

লেকী তার 'ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সামগ্রিকভাবে সতীসাধ্বী গ্রীক ললনাদের মর্যাদা ছিল চরম অধঃপতিত। তাদের গোটা জীবন অতিবাহিত হতো দাসত্বের শৃঙ্খলে। অর্থাৎ শৈশবে পিতামাতার, যৌবনে স্বামীর এবং বিধবা হলে ছেলেদের তত্ত্বাবধানে শৃঙ্খলিত থেকে। তার তুলনায় তার পুরুষ আত্মীয়দের অধিকার সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য মনে করা হতো। আইনগতভাবে তার তালাকের অধিকার ছিল বটে কিন্তু সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারতো না। কারণ আদালতে এ ধরনের কথা প্রকাশ করা গ্রীকদের লজ্জা-শরমবোধের পরিপন্থী ছিল....।" প্লেটো অবশ্য নারী পুরুষের সমতার দাবী করেছিলেন কিন্তু তা মৌখিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। বাস্তব জীবনে তার কোনো প্রভাব ছিল না। সেখানে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল নিরেট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী সন্তান উৎপাদন দেশের প্রতিরক্ষার কাজে আসবে। স্পার্টার আইনে একথা স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ছিল যে, অল্প বয়স্ক এবং দুর্বল স্বামীর উচিত তার অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে কোনো যুবকের সাথে বিয়ে দেয়া যাতে সেনাবাহিনীতে শক্তিশালী সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

একই লেখকের মুখ থেকে রোমান নারীকুলের দূরবস্থাও কিছুটা শুনুন ঃ

"রোমান আইন অনুসারে দীর্ঘদিন যাবত নারীর মর্যাদা ছিল যার পর নাই অধঃপতিত। বাপ বা স্বামী যিনিই পরিবারের প্রধান হতেন স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর থাকতো তার সীমাহীন কর্তৃত্ব। তিনি ইচ্ছা করলেই নারীকে বাড়ী থেকে বহিষ্কার করতে পারতেন। কন্যার পিতার কাছে উপহার-

www.bjilibrary.com

উপঢৌকন পাঠানোর কোনো রীতি প্রচলিত ছিল না। অধিকন্তু বাপের এতটা কর্তৃত্ব ছিল যে, কন্যাকে যেখানে ইচ্ছা বিয়ে দিয়ে দিতো। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতেও পারতো। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ইতিহাসের যুগে এসব অধিকার বাপের নিকট থেকে স্বামীর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছিল। এরপর স্বামীর কর্তৃত্ব এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, সে চাইলে স্ত্রীকে হত্যাও করতে পারতো। ৫২০ বছর পর্যন্ত কেউ তালাকের নাম পর্যন্ত শোনেনি। দাসদের মতো নারীর জীবনলক্ষ সেবা ও চাকরানীর কাজ বলে মনে করা হতো। পুরুষ বিয়ে করতো শুধু এ লক্ষ নিয়ে যে, সে স্ত্রীর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। তাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদের উপযুক্ত মনে করা হতো না। এমনকি কোনো ব্যাপারে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যে আইনগতভাবে তার কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। অবশ্য দৈহিক দুর্বলতার কারণে তাকে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। এতে কারো সন্দেহ নেই যে, পরবর্তী সময়ে রোমানরা নারীদের কিছু অধিকার দিয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বাস্তব সত্য যে, সে পুরুষের সমমর্যাদা কখনো পায়নি।"[১]

আরব এবং নারী

সভ্যতা ও তামাদ্দুনের এসব কেন্দ্রভূমিতেই যখন দুর্বল নারী জাতির অসহায়ত্ব এবং তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচারের চিত্র ছিল এই, তখন সভ্যতা ও তামাদ্দুন বিবর্জিত আরব সমাজে তারা কতটা অসহায় ও নিরাশ্রয় ছিল তা অনুধাবন করা মোটেই কষ্টকর নয়।

আরবের অধিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করতো। কন্যা সন্তান জন্ম নেয়া ছিল তাদের জন্য গভীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ। পুত্র সন্তান নিয়ে তারা গর্ব ও অহংকার করতো। কিন্তু কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করতো। পবিত্র কুরআন তাদের এ অনুভূতি ও মনোবৃত্তির অতি সুন্দর চিত্র অংকন করেছে ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط

"তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং মনোকষ্টে তার হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে

১. বিভিন্ন যুগে রোমান সাম্রাজ্যের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল এবং ক্রমান্বয়ে কিভাবে তার সংস্কার সাধিত হয়েছিল তা বিস্তারিত জানতে হলে ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা দেখুন।

www.bjilibrary.com

ওঠে। লোক চক্ষু থেকে সে নিজেকে আড়াল করে চলতে থাকে। কারণ এ দুঃসংবাদ লাভের পর কি করে সে মানুষকে মুখ দেখাবে। সে তখন ভাবতে থাকে, লাঞ্ছনা বহন করে তাকে জীবিত থাকতে দেবে না মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে?"–সূরা আন নাহল ঃ ৫৮-৫৯

হযরত উমর রা. বলেন ঃ

وَاللّٰهُ اِن كُنَّا فِى الجاهلية ما نعدّ للنساء امرأ حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم

"আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে আমরা নারীদেরকে কোনো মর্যাদাই দিতাম না। তারপর আল্লাহ কুরআন নাযিল করলেন, তাদের ব্যাপারে নির্দেশনা দিলেন এবং যা কিছু অংশ নির্ধারণ করা দরকার ছিল তা করলেন।"

নারীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এত চরমে পৌছেছিল যে, কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে সে সেটিকে অলক্ষুণে ঘর মনে করে পরিত্যাগ করতো। এর চেয়েও বড় কথা, মেয়েদের জন্য তাদের হৃদয়ে দয়ামায়া ও ভালোবাসার অনুভূতি ছিল না। তাই তারা কন্যাসন্তানদের জীবিত দাফন করতো। এ নিষ্ঠুরতার প্রকাশ এমন সব মানুষের তরফ থেকে হতো যাদের হৃদয়কে স্নেহ ও ভালোবাসার উৎস মনে করা হয়। এ প্রসংগে এমন কিছু দুঃখজনক ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যা শোনামাত্রই হৃদয় কেঁপে ওঠে। এক ব্যক্তি নবী স.-কে তার জাহেলী যুগের কাহিনী শুনিয়ে বললো ঃ "আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিল। আমি যখনই তাকে আহ্বান করতাম সে বড় আনন্দচিত্তে আমার কাছে দৌড়ে আসতো। এভাবে একদিন আমি তাকে ডাকলে সে আমার পেছনে পেছনে দৌড়ে এলো। আমি তাকে সাথে করে নিকটবর্তী একটি কূপের পাশে গেলাম এবং ধাক্কা দিয়ে কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনো সে আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করছিলো।" ঘটনাটি শুনে নবী স.-এর দুটি চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। এমন কি তার পবিত্র দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল।"[১]

এর চেয়ে বড় জুলুম আর কি হতে পারে যে, বাপের স্নেহসিক্ত হাত দুটি সন্তানের জন্য হিংস্র নেকড়ের থাবায় পরিণত হলো।

কায়েস ইবনে আসেম জাহেলী যুগে আট দশটি কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত দাফন করেছিল।[২]

---

১. সুনানে দারেমী, অনুচ্ছেদ–'মাকানা আলাইহিন্নাস কাবলা বাছিন নাবী স.

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা–৪৭৭-৪৭৮।

www.bjilibrary.com

নিপীড়িত এ নারী শ্রেণীকে যখন তারা বেঁচে থাকার অধিক তখন তার জীবনের সব অধিকার ছিনিয়ে নিতো। বিয়ের কোনো সীমা ছিল না। যতো সংখ্যক নারীকে ইচ্ছা বিয়ে করতো। ইসলাম কবুল করার ওয়াহাব আসাদী রা.-এর দশজন স্ত্রী ছিল।[১] গাইলান সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল।[২]

একই ভাবে তালাকের ব্যাপারেও কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষরা যখনই চাইতো এবং যতবার চাইতো স্ত্রীকে তালাক দিতো এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই রুজু বা প্রত্যাহার করতো।[৩] এভাবে পুরুষ তার স্ত্রীকে সারা জীবনভর উৎপীড়ন করতে পারতো। এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সে তার স্ত্রীকে নাজেহাল করার জন্য বললো ঃ "আমি তোমাকে সাথেও রাখবো না আবার পরিত্যাগও করবো না। স্ত্রী জানতে চাইলো, তা সে কিভাবে করবে ? সে বললো ঃ আমি তোমাকে তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার প্রাক্কালে রুজু করবো। এরপর আবার তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ না হতেই রুজু করবো।"[৪]

স্বামীর জীবদ্দশায় সে স্বামীর অধীন থাকতো। স্বামীর মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীরা তার পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব লাভ করতো। তারা নিজেরা কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করতো অথবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিতো। তাকে আদৌ বিয়ে না দেয়ার ব্যাপারেও তাদের এখতিয়ার ছিল।[৫]

বিধবার সম্পদ করায়ত্ব করার জন্য তাকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বঞ্চিত করতো। অনেক সময় কোনো অল্পবয়স্ক শিশুর বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত তার পুনর্বিবাহ ঠেকিয়ে রাখা হতো, যাতে উক্ত শিশু বয়োপ্রাপ্ত হয়ে তাকে বিয়ে করতে পারে।[৬]

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ ফিমান আসলামা ওয়া ইনদাহু নিসাউন আকছারু মিন আরবা'।

২. তিরমিযি, আবওয়াবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মা জাআ ফির রাজুলি ইউসলিমু ওয়া ইনদাহু আশারা নিসওয়াহ।

৩. আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ ফি নাসখিল মুরাযায়া বা'দাত তাতলীকাতিস সালাস।

৪. মুসতাদরিকে হাকেম দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮০। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াকুব ইবনে হামিদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন যে, একজন ছাড়া সবাই তাকে জয়িফ বলেছেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন যে, তাঁর থেকে ইমাম বুখারী তাঁর 'আফয়ালুল ইবাদ' গ্রন্থে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং ইবনে মাজা ও অন্যান্য মুহাদ্দীসগণও তাঁর রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। লিসানুল মিযান-৬ষ্ঠ খণ্ড।

৫. বুখারী, কিতাবুত তাফসীর; সূরাতুন নিসা; অনুচ্ছেদ ঃ লা-ইয়াহিল্লুলাকুম আন তারিসুন নিসায়া।

৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৫।

www.bjilibrary.com

এমন কি সৎমাকে বিয়ে করাও তাদের কাছে কোনো দূষণীয় ব্যাপার ছিল না। আবু বকর জাস্‌সাস লিখেছেন ঃ

وقد كان نكاح امرأة الاب مستفيضا شائعًا فِى الجاهلية

"জাহেলী যুগে সৎমাকে বিয়ে করা বহুল প্রচলিত ছিল।[১]

ঘটনাক্রমে কোনো সুন্দরী রূপসী এবং সম্পদশালী ইয়াতীম বালিকা যদি কারো তত্ত্বাবধানে এসে যেতো তাহলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করতো, কিন্তু ঠিকমতো মোহরানা আদায় করতো না।[২]

সম্পদের উত্তরাধিকারে নারীর কোনো অংশ ছিল না[৩]

ওহুদ যুদ্ধের পরের একটি ঘটনা। সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী নবী স.-এর কাছে এসে এ মর্মে অভিযোগ করলো যে, ওহুদ যুদ্ধে সাবেত শহীদ হয়েছেন। তার দু'টি মেয়ে আছে। কিন্তু সাবেতের ভাই তার পুরো সম্পদ হস্তগত করেছে। তার দুই মেয়ের জন্য সামান্য কিছুও রাখেনি। এখন বলুন, তাদের বিয়ে হবে কিভাবে ?[৪]

ইসলাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অংশ নির্দিষ্ট করে দিলে আরবরা অত্যন্ত বিস্মিত হলো। তারা নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! নারী কি অর্ধেকের হকদার ? অথচ সে না জানে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে না পারে আত্মরক্ষা করতে।[৫]

ইউরোপ ও নারী

বর্তমানে ইউরোপ নারী ও পুরুষের সাম্যের বড় দাবীদার। কিন্তু এ ইউরোপে এক শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বেও নারী পুরুষের যুলুম অত্যাচারের শিকার ছিল। এমন কোনো শক্তিশালী আইন ছিল না যা পুরুষের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করতে পারতো।[৬]

ইংল্যাণ্ডের আইনে এ বিষয়টি স্বীকৃত ছিল যে, বিয়ের পরে পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন আসে না। কিন্তু বিয়ের পরে নারীর ব্যক্তিত্ব পুরুষের ব্যক্তিত্বের একটা অংশে পরিণত হয়। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে নীতি গড়ে

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক; অনুচ্ছেদ ঃ ফি নাসখিল মুরাজায়া বা'দাত তাতলীকাতিস সালাস।
২. বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরাতুন নিসা।
৩. বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরাতুন নিসা, অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালাকুম নিসফু মা তারাকা আযওয়াজুকুম।
৪. তিরমিযি, আবু দাউদ, কিতাবুল ফারায়েজ, অনুচ্ছেদ ঃ মাজাআ ফী মিরাসিস সুলব।
৫. তাফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫৮।
৬. আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৮।

www.bjilibrary.com

উঠেছিল যে, নারীর জিম্মায় বিয়ের পূর্বের কোনো ঋণ থাকলে পুরুষ তা পরিশোধ করবে। কিন্তু তার কোনো ধন-সম্পদ ও সহায় সম্পত্তি থাকলে তা পুরুষের মালিকানায় চলে যাবে। তবে বিয়ের পূর্বে নারী তার সম্পদের ব্যাপারে কোনো চুক্তি বা বুঝাপড়া করে নিলে তা ভিন্ন কথা।

ভরণ পোষণের ব্যাপারেও কোনো উপযুক্ত আইন ছিল না। এ ব্যাপারে পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর মামলা দায়ের করার অধিকারও ছিল না। পুরুষ ইচ্ছা করলে নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারতো। পক্ষান্তরে তাকে স্ত্রীর সম্পদের বৈধ হকদার মনে করা হতো।

কোনো কাজ করার ব্যাপারে নারীর স্বাধীনতা ছিল না। সে তার নিজের ইচ্ছামত কোনো চুক্তি করতে পারতো না। এমনকি অর্থোপার্জন করে নিজের জন্য খরচ করা কিংবা পছন্দমত বিয়ে করার অধিকারও তার ছিল না।

মেয়েদেরকে পিতামাতার মালিকানা মনে করা হতো। পিতামাতা যার সাথে ইচ্ছা তাদের বিয়ে দিতো। বিয়ে ছিল একটি ব্যবসায় যার মাধ্যমে পিতামাতা মেয়েদের ছেলেদের কাছে বিক্রি করে দিতো। নারী স্বাধীনতার বিখ্যাত প্রবক্তা মিল (MILL) তার "পরাধীন নারী" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> "ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকান, দেখতে পাবেন, খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি যখন বাপ তার মেয়েকে যেখানে ইচ্ছা বিক্রি করে দিতো। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছার কোনো তোয়াক্কাই করা হতো না।"

খৃস্টধর্মের প্রসারের পূর্বে পুরুষ ছিল সবকিছুর একমাত্র মালিক। নারীর তুলনায় পুরুষের অপরাধের জন্য কোনো শাস্তি বা আইন কিছুই ছিল না। পুরুষ যখনই চাইতো স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতো। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ক ছিন্ন করার এখতিয়ার ছিল না। ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন আইনে পুরুষকে নারীর মালিক বলা হয়েছে। তবে কার্যত সে ছিল তার বাদশাহ। এমনকি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হত্যা করার পদক্ষেপকে আইনের পরিভাষায় ছোটখাট বিদ্রোহ বলে হাল্কাভাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু নারী ঐ একই অপরাধে অপরাধী হলে তাকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ ছিল যা বিদ্রোহের শাস্তি অপেক্ষাও কঠোর। বর্তমান সময়েও ইংরেজ আইনে অনেকগুলো দিক এমন আছে যাতে মনে হবে নারী পুরুষের খরিদ করা দাসী। এখনো গির্জায় বিয়ের সময় সারা জীবন স্বামীর আনুগত্য করার জন্য নারীর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয় এবং সারা জীবন এ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কিছু করতে পারে না বা করলেও কোনো সম্পদ গচ্ছিত করতে পারবে না। যদি করে তাহলে

www.bjilibrary.com

আপনা হতেই তা স্বামীর সম্পদ বলে গণ্য হয়। এ ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের আইন নারীর এতটুকু মর্যাদাও স্বীকার করতো না যা অন্য সব দেশে দাসেরাও ভোগ করতো।

ধর্মের দৃষ্টিতে নারী

গ্রীক, রোম, আরব, আজম (অ-আরব), ইউরোপ, এশিয়া, সর্বত্র নারী ছিল নির্যাতিতা। তার গোটা ইতিহাস নির্যাতন ভোগের ইতিহাস। এমনকি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিভিন্ন যুগে নেক কাজ, শরাফত, সদাচারণ, পবিত্রতা ও নিরপরাধিতা সম্পর্কে যেসব শিক্ষা এসেছে ক্রমান্বয়ে তারও অর্থ দাঁড়িয়েছিল এই যে, নারীর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। বরং তার নিকট থেকে দূরে সরে থাকার নীতি অবলম্বন করতে হবে। কারণ, তার সাথে সম্পর্ক মানুষকে অপরাধ ও গোনাহর নিকটবর্তী করে দেয়।

কালচক্রের সাথে সাথে এ ধারণা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে নারীর প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষও ততটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাকে শয়তানের দালাল এবং পাপের দরজা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার সাথে সম্পর্ক রাখা তাকওয়ার পরিপন্থী এবং দূরে অবস্থানকে আল্লাহভীতির প্রমাণ মনে করা হয়েছে।

এসব ধ্যান-ধারণা নিসন্দেহে নারীর সামাজিক মর্যাদাকে প্রভাবিত করেছে। ফলশ্রুতিতে সমাজে পুরুষের যে মর্যাদা ও সম্মান ছিল, নারী তা লাভ করতে পারেনি। পুরুষের যে অধিকার ছিল নারী তাও পায়নি। তার অবস্থান ছিল এমন পাপী ও অপরাধীর মত যাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার চোখে দেখা হয়।

ইহুদী ধর্ম ও নারী

দুনিয়ার যেসব ধর্ম শুধুমাত্র কিছু আকীদা এবং তত্ত্ব পেশ করেনি বরং পেশকৃত আকীদা ও তত্ত্বের ভিত্তিতে জীবনের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছে, ইহুদী ধর্ম তার একটি। এ ধরনের একটি ধর্ম নারী জাতি সম্পর্কে বাস্তববাদী ধ্যান-ধারণা পেশ করবে এরূপ আশা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধর্ম আমাদের সামনে এ ধারণা পেশ করে যে, পুরুষ সৎস্বভাব বিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল এবং নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট ও ভণ্ড। মানবজাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম আ. জান্নাতে মহাসুখে জীবন কাটাচ্ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তার স্ত্রী হাওয়া তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করলো এবং তাকে এমন একটি ফল খাওয়ালো যা খেতে আল্লাহ তাকে নিষেধ করেছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি আল্লাহর সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তার ভাগ্যলিপিতে কায়ক্লেশের জীবন লিপিবদ্ধ হলো।

www.bjilibrary.com

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি।"–আদিপুস্তক, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক-১১।

এর পরে আল্লাহ তা'আলা হাওয়াকে বললেন ঃ

"আমি তোমার গর্ববেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে ; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে ; ও সে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে।"–আদিপুস্তক, অধ্যায়-৩ ,শ্লোক-১৬।

অন্য কথায় আদম আ.-কে পথভ্রষ্ট করে যে অপরাধ করেছিল আল্লাহর তরফ থেকে তার সেই অপরাধের শাস্তি হলো সন্তান প্রসবকালীন কষ্ট এবং তার ওপর পুরুষের স্থায়ী কর্তৃত্ব। পুরুষ কিয়ামত পর্যন্ত নারীর ওপর এ কর্তৃত্ব চালাতে থাকবে। এ দর্শনের ফলশ্রুতিতে ইহুদী শরীয়তে পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব এতো বেশী যে, "কোনো স্ত্রীলোক যদি যৌবন কালে আপন পিতৃগৃহে বাস করিবার সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করে ও ব্রতবন্ধনে আপনাকে বদ্ধ করে, এবং তাহার পিতা যদি তাহার মানত, ও যদ্দারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধনের কথা শুনিয়া তাহাকে কিছু না বলে, তবে তাহার সকল মানত স্থির থাকিবে, এবং যদ্দারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির থাকিবে। কিন্তু শ্রবণদিনে যদি তাহার পিতা তাহাকে নিষেধ করে, তবে তাহার কোন মানত, ও যদ্দারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির থাকিবে না ; আর তাহার পিতার নিষেধ প্রযুক্ত সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করিবেন। আর যদি সে কোনো পুরুষের স্ত্রী হইয়া মানতের অধীনা হয়; কিংবা যদ্দারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, ওষ্ঠ-নির্গত এমন চপল বাক্যের অধীনা হয়, এবং যদি তাহার স্বামী তাহা শুনিলেও শ্রবণ দিনে তাহাকে কিছু না বলে, তবে তাহার মানত স্থির থাকিবে, এবং যদ্দারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির থাকিবে। কিন্তু যদি শ্রবণদিনে তাহার স্বামী তাহাকে নিষেধ করে, তবে সে যে মানত করিয়াছে, ও আপন ওষ্ঠ-নির্গত যে চপল বাক্য দ্বারা আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, [স্বামী] তাহা ব্যর্থ করিয়াছে, আর সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করিবেন। ...... স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও প্রাণকে দুঃখ দিবার প্রতিজ্ঞামুক্ত প্রত্যেক দিব্য তাহার স্বামী স্থির করিতেও পারে, তাহার স্বামী ব্যর্থ করিতেও পারে। ......

www.bjilibrary.com

পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয়ে এবং পিতা ও যৌবন কালে পিতৃগৃহস্থিত কন্যার বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে এই সকল আজ্ঞা করিলেন।"–গণনাপুস্তক, অধ্যায়-৩০।

এমনকি ইহুদী আইন অনুসারে পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। অনুরূপভাবে নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকারও ছিল না। (ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা)

খৃস্টধর্ম ও নারী

নারীর সাথে খৃস্টধর্মের আচরণ আরো অপসন্দনীয়। এ দুর্বল শ্রেণীকে খৃস্টধর্ম যতদূর নীচে নিক্ষেপ করা সম্ভব ছিল করেছে। নারী সম্পর্কে খৃস্টধর্মের অনুভূতি তারতুলীনের নিম্ন বর্ণিত বক্তব্য দ্বারা অনুমান করা যায় ঃ

"হে নারীকূল, তোমরা জানো না যে, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহর যে ফতোয়া ছিল তা যদি এখনো বর্তমান থাকে তাহলে উক্ত অপরাধ প্রবণতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরা তো শয়তানের দরজা। তোমরাই অতি সহজে আল্লাহর প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ পুরুষের ধ্বংস করছো।"

"সেন্ট পল" তার একটি পত্রে লিখেছেন ঃ

"নারী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক শিক্ষা করুক। আমি উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দিই না। কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে বলি। কারণ, প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে পতিতা হইলেন।"–তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পলের প্রথম পত্র, অধ্যায়-২ ঃ ১১-১৪।

তিনি অপর একটি পত্রে লিখেছেন ঃ

"কিন্তু আমার ইচ্ছা এই, যেন তোমরা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তক স্বরূপ খৃষ্ট এবং স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ; আর খৃষ্টের মস্তক স্বরূপ ঈশ্বর। যে কোনো পুরুষ মস্তক আবৃত রাখিয়া প্রার্থনা করে, কিম্বা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। কিন্তু যে কোনো স্ত্রী অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে, কিম্বা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। .... কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক হইতে নয়, বরং স্ত্রীলোক পুরুষ হইতে। আর স্ত্রীর নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত স্ত্রীর। এই কারণ স্ত্রীর মস্তকে কর্ত্তৃত্বের চিহ্ন রাখা কর্ত্তব্য–দূতগণের জন্য।"–করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পলের প্রথম পত্র, অধ্যায়-১১।

www.bjilibrary.com

হিন্দু ধর্ম এবং নারী[১]

ভারতবর্ষকে একটি ধর্মভিত্তিক দেশ মনে করা হয়। কারণ, এর অন্যান্য যে কোনো দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সবসময় বেশী প্রভাব বিস্তার করে আছে। এখানেও নারী দাসত্ব ও পরাধীনতার জীবন থেকে মুক্তি পায়নি। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইন রচয়িতা মনুরাজ নারী সম্পর্কে বলেছেন :

> "শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে স্বামীর অধীনে থাকবে এবং বিধবা হওয়ার পরে থাকবে পুত্রের অধীনে, কোনো সময়ই সে স্বাধীন থাকবে না।"–মনুস্মৃতি ১৪৫ : ৫।

> "নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, প্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন...স্বাধীন যেন না হয়।"–মনুস্মৃতি ১৪৫ : ৫।

> "কোরবানী এবং ব্রত পালন করা নারীর জন্য পাপ। তার উচিত শুধু স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামী গ্রহণের বিষয় মুখে আনাও নারীর উচিত নয়। বরং স্বল্পাহারী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেয়া উচিত।"–অধ্যায়–৫, ১৫৫-১৫৭।

> "মিথ্যা বলা নারীর আপন বৈশিষ্ট।"–অধ্যায় : ৯-১৭।

জনৈক ব্রাহ্মণ যিনি মনুজী মহারাজের মনুস্মৃতিতে বাচালতা থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং যার শিক্ষা দীর্ঘদিন যাবত রাষ্ট্র শাসনের মূলনীতি হিসেবে কার্যকরী ছিল, তিনি নারী জাতি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> "নদী, সশস্ত্র সৈনিক, শিং ও নখর বিশিষ্ট জন্তু, শাসক এবং নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।"–চানক্য নীতি-১ : ১৫।

> "মিথ্যা কথা বলা, অগ্র পশ্চাত না ভেবে কাজ করা, ধোঁকাবাজি, আহমকী, লোভ, অপবিত্রতা, নিষ্ঠুরতা নারীর স্বভাবজাত দোষ।"–অধ্যায়-২

> "রাজপুত্রদের নিকট থেকে নৈতিক শুচিতা, বিদ্বানদের নিকট থেকে মিষ্ট ভাষণ, জুয়াড়ীদের নিকট থেকে মিথ্যা বলা এবং নারীদের নিকট থেকে প্রতারণা শেখা উচিত।"–অধ্যায় : ১২ : ১৮

> "আগুন, পানি, নিরেট মূর্খ, সাপ-রাজ-পরিবার এবং নারী, এরা সবাই ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এদের ব্যাপারে সবসময় সাবধান থাকতে হবে।"
> –অধ্যায় ১৪ : ১২

---

১. হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে এসব তথ্য মাওলানা আকবর শাহ নাজিবাবাদী খান সাহেবের 'নেজামে সালতানাত' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

www.bjilibrary.com

"বন্ধু, চাকর এবং নারী দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু যখনই আবার সে সম্পদের অধিকারী হয় তখনই তার কাছে ফিরে আসে।"

—অধ্যায় ঃ ৫ ঃ ১৫।

ভারতে নারীর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হতো না। সতীদাহ প্রথাই তার যথাযথ প্রমাণ। এভাবে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে তার বেঁচে থাকার অধিকারও ছিনিয়ে নেয়া হতো।

হিন্দু ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টধর্ম তথা দুনিয়ার অন্য যে কোনো ধর্মের কেন্দ্রভূমি ছিল এমন সব এলাকা সভ্যতা ও তামাদ্দুনের দিক দিয়ে যা ছিল অতি অগ্রসর। আর ঐসব এলাকায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করেছে সবসময় পুরুষ। তাই আমাদের ধারণা, পুরুষরা এ ধর্মের নীতিমালায় এমন সব বিকৃতি সাধন করেছে যার ভিত্তিতে নারীর ওপর কর্তৃত্ব ও বাড়াবাড়ি করা তাদের জন্য সম্ভব হয় এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের আল্লাহর সনদের আশ্রয় নেয়া যায়। মহান আল্লাহ যুলুম ও বে-ইনসাফীমূলক কোনো নির্দেশও দিতে পারেন তা চিন্তাই করা যায় না। কারণ, তিনিই ন্যায় ও ইনসাফের উৎস।

❒

www.bjilibrary.com

নারী ও আধুনিক মতবাদসমূহ

যুলুমের পরিণাম কখনো ভালো হয় না। দীর্ঘদিন ধরে নারী নির্যাতিত হয়ে আসছিল। তার প্রতি যুলুম চরমে পৌঁছলে পরিণামও জঘন্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকলো। আধুনিক যুগে জীবনের বহু ক্ষেত্রে যখন বিপ্লব সাধিত হয়েছে তখন নারীর সামাজিক মর্যাদায়ও পরিবর্তন এসেছে। কাল পর্যন্তও তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত মনে করা হতো। কিন্তু আজ সে মর্যাদা ও মহত্বের দাবীদার। এক সময়ে পুরুষ তাকে সমাজে সঠিক স্থান ও মর্যাদা পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র সে শুধু তার আসল মর্যাদা লাভ করেছে তাই নয় বরং আরো এগিয়ে গিয়েছে এবং ক্রমাগত এগিয়েই যাচ্ছে। তার জীবনে এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে ঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেও স্বাধীন ছিলনা। কিন্তু আজ তাকে হাত ধরে ফিরিয়ে রাখতে পারে এমন লোক ঘরের বাইরে যেমন নেই ভিতরেও তেমনি নেই।

নারীকে স্বাধীনতার এ স্তরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সময়ের গতিধারাও ঐতিহাসিকভাবে সাহায্য করেছে। যে সময় সে পুরুষের যুলুমের পাঞ্জা থেকে মুক্তির জন্য সচেষ্ট ছিল ঠিক সেই সময় পাশ্চাত্য জগতে অতি দ্রুততার সাথে শিল্প বিপ্লব সাধিত হচ্ছিলো। এ বিপ্লব নারীর স্বাধীনতার সংগ্রামকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। ইতোপূর্বে সে ঘরে (যা তার কর্মক্ষেত্র বলে মনে করা হতো) বিদ্রোহ করতে চাইলেও জানতো না ঘরের বাইরে গিয়ে সে কি করবে এবং কি ধরনের জীবন সে বেছে নেবে? এ বিপ্লব তার সামনে ঘরের বাইরের এমন একটি চিত্র পেশ করলো যা পারিবারিক জীবনের তুলনায় বেশী সুন্দর এবং যার সাহায্যে সে গোলামীর শৃঙ্খল ছিন্ন করতে সক্ষম। এ নতুন চিত্র দেখে সে মা, বাপ এবং স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিলো। অথচ সে কোনো দিন এ ধরনের চিন্তাই করতে পারতো না। কারণ, এখন আর সে কোনো ব্যাপারে তার আজ্ঞাধীন নয়। সবদিকেই তার জন্য রুজি রোজগারের দরজা খোলা।

এ বিদ্রোহের পেছনে নারীর অন্তরে তার নিজের সংশোধনের চেয়ে পুরুষের বন্ধন থেকে মুক্তি এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা অধিক কাজ করেছিলো। সুতরাং সে সর্বপ্রথম যে কাজটি করলো তা হলো যে সমাজ ব্যবস্থা তাকে পুরুষের অনুগত ও অধীন করে রেখেছিলো তা সে ছিন্নভিন্ন করলো। অথচ ঐ ব্যবস্থাটি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানযোগ্য ছিল না। যদিও তার মধ্যে কিছু দোষ ত্রুটি অনুপ্রবেশ করেছিল, তা সত্ত্বেও তাতে অনেক নির্দোষ এবং কল্যাণকর উপাদানও ছিল। তাই উক্ত সমাজব্যবস্থার পরাজয় বা ধ্বংসের

www.bjilibrary.com

প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল তার শুদ্ধি ও সংস্কারের। কিন্তু কোনো মতবাদ ও জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে একবার প্রতিক্রিয়া শুরু হলে তা সর্বদাই চরম পরিণতি লাভ করে। সুতরাং পুরুষের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভের চরম জযবা নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকেও আপন চৌহদ্দির মধ্যে ধরে রাখতে দেয়নি। তা নারীকে এমন একটি স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যেখানে পৌঁছার পর নারী আর নারী থাকতে পারে না, বরং পুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়। অথচ এটি তার শরীরে জড়ানো একটি কৃত্রিম আবরণ মাত্র। প্রকৃত ব্যাপার হলো, না পুরুষ কখনো নারী হতে পারে আর না নারী কখনো পুরুষ হতে পারে। উভয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যোগ্যতা ও শক্তির অধিকারী। একই স্থানে, একই আবহাওয়ায় এবং একই পরিবেশে বেড়ে ওঠা নারী ও পুরুষ শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে এতটা ভিন্ন হয় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মত সুদূর ব্যবধানের পুরুষও ততটা হয় না। দু'জন পুরুষের মধ্যে স্বভাবগত পসন্দ অপসন্দের হাজারো পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পর এতটা সদৃশ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, তার অনুপাত বিপরীত মুখী পসন্দ অপসন্দের চেয়ে অনেক বেশী। কোনো নারী ও পুরুষের মধ্যে তুলনা করলে এ অনুপাত পাওয়া যাবে না। এ থেকে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে বর্ণ ও গোত্র, আবহাওয়া এবং ভৌগলিক ও ভাষার ব্যবধান কোনো মৌলিক গুরুত্ব বহন করে না। অবশ্য তার দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে যোগ্যতা দান করার ক্ষেত্রে তিনি সাদা-কালো ও লম্বা-খাটোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো পার্থক্য করেন না। তবে নারী ও পুরুষ হিসেবে যতটুকু পার্থক্য করা দরকার তা তিনি অবশ্যই করেন। ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, নারী পুরুষের পার্থক্য কোনো মামুলি বা ছোটখাট পার্থক্য নয়, বরং তা একটি মৌলিক পার্থক্য। এ পার্থক্য ও ভিন্নতাকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ দ্বারা মুছে ফেলা যায় না। কারণ, যেসব শক্তি ও যোগ্যতার মৌলিক উপাদান মানুষের মধ্যে আছে সে কেবল ওইগুলোরই শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এমন কোনো শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় যার উপাদান আল্লাহ্ তার মধ্যে দেননি। নারী হোক বা পুরুষ, সে তার মধ্যেকার প্রকৃতির দেয়া যোগ্যতাগুলোর ধ্বংস সাধন করতে পারে বটে। কিন্তু নতুন কোনো যোগ্যতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে না।

এটা এখন একটা বাস্তব, প্রত্যেক যুগের ইতিহাসই যার প্রমাণ পেশ করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো জ্ঞান-গবেষণা এটিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারেনি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসী লেখক এলেক্সিস ক্যারল তার MAN THE UNKNOWN গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

"নারী পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা মৌলিক। এসব পার্থক্য তাদের দেহের শিরা-উপশিরার গঠন পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়। নারীর ডিম্ব থলি থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় তার দেহের সব অংশের ওপর তার প্রভাব পড়ে। নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক ও মানসিক পার্থক্যের কারণও এটিই।"

ডক্টর ল্যামব্রোস গুনা তার গ্রন্থ 'নারীত্বের প্রাণ সত্তা'য় লিখেছেন ঃ

"নারী ও পুরুষ কেবল দৈহিক কাঠামো, দেহ অস্থির গঠন এবং শিরা-উপশিরা ও স্নায়ুতন্ত্রীর গঠনের দিক দিয়েই ভিন্ন নয় বরং এ বিচারেও ভিন্ন যে, তারা একই পরিমাণ বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করে না। তাদের রোগ-ব্যাধিও হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাদের চিন্তা ও নৈতিক পসন্দ অপসন্দের মধ্যেও পার্থক্য আছে।"

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে (যে সময় নারী স্বাধীনতা আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল) শিক্ষিত সমাজে এ ধরনের ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইনসাইক্লোপেডিয়ায় উল্লেখ আছে ঃ

পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গের গঠন ও আকৃতি যদিও একটি বড় পার্থক্য বলে মনে হয় কিন্তু এ একটি মাত্র পার্থক্যই নয় বরং নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত অন্য সব অংগ-প্রত্যংগই পুরুষের অংগ-প্রত্যংগ থেকে ভিন্ন।

নারী ও পুরুষের মধ্যেকার এই পার্থক্যের স্বাভাবিক দাবী হলো, যার মধ্যে যে ধরনের শক্তি ও যোগ্যতা আছে তার দ্বারা সেই ধরনের কাজ নেয়া। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ নীতিতেই কাজ হয়ে থাকে। কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে কখনো কৃষিকার্যে এবং কোনো শিক্ষাবিদকে কখনো সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয় না। একই লিংগের দুই ব্যক্তির মধ্যে যোগ্যতা, স্বভাবগত পসন্দ, রুচি ও সম্পর্কের ভিত্তিতে যেখানে পার্থক্য করা হয়ে থাকে সেখানে দু'টি আলাদা শ্রেণীর মধ্যে সে পার্থক্যকে কিভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব? অথচ উভয়ের দৈহিক গঠন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থা এবং উভয়ের আবেগ ও অনুভূতি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব দিয়ে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রকৃতিও তাদের দ্বারা দু'টি ভিন্ন ধরনের কাজ আঞ্জাম দিতে চায়।

কিন্তু আধুনিক ধ্যান-ধারণার ভ্রান্তনীতি তাদের উভয়কে একই কর্মক্ষেত্রে টেনে এনেছে এবং একই কর্মক্ষেত্রে সমান অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে—অথচ তার কাছে নারী ও পুরুষের যোগ্যতা ও সামর্থ একই রকম ও সমান হওয়ার এবং পুরুষ যে কাজ করতে পারে নারীও সে কাজ করতে সক্ষম এতদসংক্রান্ত শরীর বিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের কোনো সার্টিফিকেট নেই।

www.bjilibrary.com

এলেক্সিস ক্যারল নারী ও পুরুষের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেছেন ঃ

"এসব মৌলিক সত্য (যা নারী ও পুরুষের দৈহিক পার্থক্য প্রমাণ করে) অবহেলা করার কারণে নারী স্বাধীনতার ঝাণ্ডাবাহীরা দাবী করতে পেরেছে যে, নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার অভিন্ন এবং সমান হওয়া উচিত। অথচ বাস্তবে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসংখ্য পার্থক্য বিদ্যমান। নারী দেহের প্রতিটি কোষের ওপর তার নারীত্বের ছাপ পড়ে। তার বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। বিশেষ করে তার স্নায়বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। নারীর উচিত পুরুষের অন্ধ অনুকরণ না করে নিজের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চরিত্র নির্মাণ ও কর্মক্ষেত্র বাছাই করা। সভ্যতার ক্রমবিকাশে নারী অপেক্ষা পুরুষের ভূমিকা অধিক। তাই বলে নিজের বিশেষ দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে তার গা বাঁচিয়ে চলা উচিত নয়।"

ডক্টর ল্যামব্রোস গুনা লিখেছেন ঃ

"পুরুষ ও নারীর সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো মনে রাখতে হবে। উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ শুধু এভাবেই সম্ভব।"

প্রকৃত ব্যাপার হলো, নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের ধারণা পাশ্চাত্য এজন্য গ্রহণ করেনি যে, সে উভয়ের মধ্যেকার দৈহিক ও প্রাকৃতিক পার্থক্যকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে কিংবা তাতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে বরং এজন্য গ্রহণ করেছে যে, এ ধারণা তার দৃষ্টিতে নারীর প্রতি যুলুম-নিপীড়নের একমাত্র সমাধান। তার দৃষ্টিতে নারীর নির্যাতিত হওয়ার কারণ হলো, যুলুম-নিপীড়নের সবরকম সুযোগ সুবিধা পুরুষের করায়ত্ব। আর যেসব অধিকার থাকলে কারো জান, মাল ও ইজ্জত-আবরু নিরাপদ হতে পারে নারী তা থেকেও বঞ্চিত। তাই পুরুষ যেসব সামাজিক অধিকার ভোগ করে নারীরও সেসব অধিকার থাকা আবশ্যক। আর যেসব উপায় উপকরণের মাধ্যমে সমাজে সম্মান ও গৌরব অর্জন করা যায়, তা যেন কোনো একটি মাত্র শ্রেণীর করায়ত্ব না হয়ে পড়ে। পুরুষের মতো নারীও যেন বড় বড় পদে সমাসীন হতে এবং ভালো ভালো শিল্প ও উন্নত পেশা গ্রহণ করতে পারে। অন্যথায় এক শ্রেণীকে উন্নতির সবরকম সুযোগ সুবিধা প্রদান ও অপর শ্রেণীকে বঞ্চিত রাখার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, আমরা মানুষের একটি শ্রেণীকে সমাজে স্থায়ীভাবে লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত রাখতে চাই এবং তার উন্নতির জন্য আদৌ সচেষ্ট নই। কারণ, এটা ধ্রুব সত্য

www.bjilibrary.com

যে, সমাজের কোনো শ্রেণী অধঃপতিত হলে তারা সর্বদাই উন্নত শ্রেণীর যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। দুনিয়ার কেউ-ই ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীকে অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বিরত রাখতে পারে না।

এ পুরো ব্যাপারটাতে নারীর সামাজিক অধিকার ও সামাজিক দায়িত্বকে এক করে দেখা হয়েছে। অথচ এ দু'টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কোনো ব্যক্তির প্রতি ন্যায়, ইনসাফ ও সমতার আচরণ এক জিনিস আর তাকে কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব অর্পণ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিস। এ দু'টিকে এক মনে করা কিংবা একটির ওপর আরেকটিকে নির্ভরশীল মনে করা একটি মারাত্মক ভুল। কারণ, সে ক্ষেত্রে এর ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, যে কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব পালন না করলে সে সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। নারীর ওপর যদি যুলুম-অত্যাচার চলতে থাকে এবং সে তার সামাজিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় রাষ্ট্র এবং সমাজ তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে। রাষ্ট্র ও সমাজের কর্তব্য হলো, নারীর জন্য আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও তামাদ্দুনিক সুযোগ-সুবিধা লাভের ব্যবস্থা করা। যাতে সে স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ নাগরিক হিসাবে জীবন-যাপন করতে পারে। যে রাষ্ট্র তার এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারে না সে তার নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। কারণ, ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য হলো, যেসব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ সে তার সীমিত উপায়-উপকরণ দ্বারা অর্জন করতে পারবে না রাষ্ট্রের ব্যাপক ও শক্তিশালী উপায়-উপকরণ দ্বারা তা অর্জন করতে হবে। তাই কোনো নাগরিককে তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কোনো রাষ্ট্রের নেই। বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীকে সুযোগ-সুবিধা দেয়া এবং অপর আরেকটি শ্রেণীকে ন্যায় ও ইনসাফ থেকে বঞ্চিত করার অধিকারও কোনো রাষ্ট্রের থাকতে পারে না।

পাশ্চাত্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে সত্যকেই উপেক্ষা করেছে। কারণ, সে উন্নতি ও মর্যাদাকে কয়েকটি বিশেষ পেশা ও শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে। অন্য কথায়, সে মর্যাদা ও লাঞ্ছনার একটি নিজস্ব মানদণ্ড আবিষ্কার করে নিয়েছে। এ মানদণ্ড তৈরী করার সময় সে পুরুষের সবরকম ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিবেচনা করেছে ঠিকই, কিন্তু নারীর মেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিবেচনা করেনি। অতপর নারীকে এই বলে আহ্বান জানানো হয়েছে যে, যদি সে মর্যাদা ও গৌরবের প্রত্যাশা করে, তাহলে যেন এ মানদণ্ডের বিচারে সফলকাম হয়। অথচ যা হওয়া দরকার ছিল তা হলো, নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর মানুষের যার মধ্যে যে ধরনের যোগ্যতা আছে তাকে

www.bjilibrary.com

সেই ধরনের কাজ দিয়ে সেটাকে তার সফলতা ও বিফলতার মাপকাঠি বলে গ্রহণ করা। এভাবে প্রত্যেক শ্রেণী সমাজে তার স্থান করে নিতো এবং সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য তাকে অস্বাভাবিক পন্থায় চেষ্টা-সাধনা করতে হতো না।

বলা হয়ে থাকে, যে জিনিসকে নারীর প্রকৃতি বলা হয়, তা আসলে একটি কৃত্রিম অবস্থা। পুরুষের ক্রমাগত যুলুমের ফলে তা নারীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু যুগের পর যুগ ধরে নারীকে পদদলিত করা ও অবদমিত রাখা হয়েছে, তাই তার চিন্তা ও কর্মশক্তি থমকে দাঁড়িয়েছে। কেননা, যোগ্যতা যতক্ষণ পর্যন্ত বিকশিত হওয়ার সুযোগ না পায় ততক্ষণ তা সুপ্ত ও অবদমিত থাকে। নারীর যদি কাজ করার ও চলাফেরার স্বাধীনতা থাকতো তাহলে যেসব কর্মক্ষেত্র পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করা হয় সেসব ক্ষেত্রেও সে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হতো।

বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণের বিচারে এ দাবীর কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ, কর্মের স্বাধীনতা পেয়ে নারীর যেমন পুরুষের সমকক্ষতা প্রমাণের সম্ভাবনা আছে তেমনি এখন সে যে স্থানে আছে সেখানেই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। দু'টি সম্ভাবনাই যখন সমান তখন কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে বলা যাবে, নারীর মধ্যে পুরুষালী দায়-দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও বিদ্যমান ? বিশেষ করে যখন তার বর্তমান মানসিকতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করে যে, জীবন-সংগ্রামে তার ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তারপর এটা বাস্তবেরও পরিপন্থী যে, পুরুষরা সবসময় অত্যাচারীর ভূমিকা পালন করেছে এবং তার যুলুম-নিপীড়ন নারীর আবেগ অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেয়নি। কারণ, পুরুষের যদি যুলুম-নির্যাতনের শক্তি থেকে থাকে নারীর আছে রূপ ও সৌন্দর্যের চিত্তহারী যাদু, যা দ্বারা সে কঠোর হৃদয় ও নিষ্ঠুর মানুষকেও মোমের মতো বিগলিত করতে পারে। তাই ইতিহাসে পুরুষের যুলুম-অত্যাচারের নজীর যেমন পাওয়া যায় তেমনি এসব ব্যক্তিরা জান-প্রাণ দিয়ে নারীকে ভালোবেসেছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। এসব ব্যক্তিদের কারো কোনোদিকে ঝুঁকে পড়ার অর্থ ছিল গোটা পরিবেশ তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী বড় বড় সিংহাসন ও রাজমুকুটের একচ্ছত্র মালিকও হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সমাজ মনস্তত্ত্ববিদদের মতে নারী তার আপন গণ্ডির বাইরে কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি।

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ 'হিউলাক এলিস' তার 'নারী ও পুরুষ' নামক গ্রন্থে লিখছেন ঃ

৩—

www.bjilibrary.com

"নারী অন্যের সমবেদনা লাভের জন্য তড়পায়। তার মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার অনুভূতি ততোটা নেই যতোটা পুরুষের মধ্যে আছে।"

'এ দাবীর সমর্থনে এলিস মুষ্টিমেয় কিছু নারীর উদাহরণ পেশ করেন যারা বড় বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে এমন একজন নারীও নেই যিনি তাঁর জীবনের সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ কাজটি পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া করতে পেরেছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাদাম কুরী তার স্বামী কুরীর সাথে, কাব্যের ক্ষেত্রে মিসেস ব্রাউনিং তার স্বামী ব্রাউনিংয়ের সাথে এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে জর্জ ইলিয়ট মিষ্টার লিউসের সাথে যে কৃতিত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন তা পুরুষের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কারণেই সম্ভবপর হয়েছে।'

সুযোগ-সুবিধা লাভ সত্ত্বেও যেসব মেয়েরা পুরুষের কর্মক্ষেত্রে কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেনি তাদের সম্পর্কে সম্ভবত এই বলে যুক্তি দেখানো হবে যে, ব্যক্তিগতভাবে যদিও তাদের কাজের স্বাধীনতা ছিল কিন্তু নারী জাতির দীর্ঘ দিনের মানসিক ও কর্মগত অধঃপতন তাদের চিন্তা ও কর্মোদ্যমকে নিস্তেজ করে দিয়েছিল। পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সাহস পেতো না। আত্মনির্ভরশীল হয়ে কোনো কাজ করা এবং স্বাধীন মত পোষণ করার সাহস তাদের ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে সফলতার জন্য তাদের দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীন জীবন প্রয়োজন। এর পরেই কেবল আশা করা যেতে পারে তাদের মধ্যে সংকল্প, সাহস ও আত্মনির্ভরতার প্রাণসত্তা উজ্জীবিত হওয়ার।

এ যুক্তি আপাত দৃষ্টিতে সুন্দর হলেও বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ইতিহাসে এমন যুগও অতিবাহিত হয়েছে যখন চেষ্টা-সাধনার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ছিল। বর্তমানেও এমন কিছু অসভ্য জাতি আছে যাদের নারীরা কোনো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। বরং তারা জীবনের সব সমস্যাকে পুরুষের মতো সরাসরি মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মাঝে যে স্বাভাবিক পার্থক্য রেখেছিল তার সবটুকুই অবশিষ্ট আছে।

বর্তমান সভ্যতাও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক শতাব্দী কাল থেকে পুরুষের সাথে নারীকেও অংশীদার করেছে। কিন্তু কেউ কি বলতে পারে, এ স্বাধীনতা নারীর মেজাজে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছে?

প্রফেসর 'দোফারিনী' লিখছেন ঃ

"নারী ও পুরুষের দৈহিক ও চিন্তা শক্তির পার্থক্য প্যারিসের মতো সুসভ্য নগরীর বাসিন্দাদের মধ্যে যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি আমেরিকার বন্য অসভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।"

www.bjilibrary.com

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে প্রকৃতিগত পার্থক্যগুলো আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই শ্বেতবর্ণের পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা কালো বর্ণের অসভ্য নারী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী।

প্রকৃতিগত গণ্ডির বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য পাশ্চাত্য আরো একটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। তাহলো, নারী যদি সামাজিক ও তামাদ্দুনিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় তাহলে সভ্যতা ও তামাদ্দুনের গতি হ্রাস পেয়ে অর্ধেকে নেমে আসবে। এভাবে সভ্যতার পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে উন্নতির যে স্তরে পৌঁছতে সক্ষম সেখানে পৌঁছতে একশ' বছর লেগে যাবে।

অন্য কথায় এ যুক্তির উদ্দেশ্য হলো, নারীর পারিবারিক কর্মকাণ্ড ও চেষ্টা-সাধনার দ্বারা সমাজের কোনো উপকার সাধিত হচ্ছে না। সুতরাং তাকে এমন সব কাজ করতে হবে যা দ্বারা সমাজের সংস্কার ও উন্নতি হতে পারে।

এ যুক্তি অত্যন্ত ভ্রান্ত ও অজ্ঞতা প্রসূত। কারণ, সমাজ কোনো বিশেষ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান নয় যে, ঐ শিল্পের উন্নতিকেই সমাজের উন্নতি বলা যাবে। জীবনের বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। নারী যে শাখায় দায়িত্ব পালন করছে সেটিও তার একটি। এ শাখাটি ধ্বংস হয়ে গেলে সমাজও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে জন্য সমাজের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশের অর্থ হলো, তার সবগুলো শাখা নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নতি করবে এবং সামগ্রিকভাবে জীবনের মান উঁচু হবে। শ্রমিক তার শ্রমের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং সচ্ছল জীবন-যাপন করবে, সাংবাদিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কোনো বিরূপতার সম্মুখীন হবে না এবং ব্যবসায়ী ব্যবসা ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করবে। একইভাবে সামাজিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য হলো, নারীকেও তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে কাজ করার পুরো অবকাশ দেয়া। তার ওপর কোনো প্রকার অপ্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ আরোপ না করা এবং সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির নাম করে তাকে তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে না আনা। এটা কেবল তখনই বৈধ হতে পারে যখন আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে, নারী যে কাজ করছে তা সমাজের জন্য ক্ষতিকর কিংবা অন্ততপক্ষে অপ্রয়োজনীয়। তা না হলে প্রশ্ন দেখা দেবে শ্রমিক কেন কারখানা পরিত্যাগ করবে না, সাংবাদিক কেন সংবাদপত্র বন্ধ করবে না এবং ছাত্র ও শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে কেন বেরিয়ে আসবে না? বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই এ কাজকে যুক্তি-সংগত বলে মেনে নেবে না।

www.bjilibrary.com

বলা হয় যে, নারী নিঃসন্দেহে সমাজের কল্যাণের জন্যই কাজ করছে। কিন্তু তাকে নিতান্তই মামুলি ও নীচু কাজের উপযুক্ত বলে ধরে নেয়া হয়েছে। আর সে যদি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো খেদমত আঞ্জাম দিতেও চায় তবে তাকে সেজন্য অনুমতি দেয়া হয় না। অথচ যে কোনো পেশাজীবীরই অধিকার আছে পেশা পরিবর্তন করে যে কোনো শিল্পকে পুনরায় পেশা হিসেবে গ্রহণ করার।

এর জওয়াব হলো, নারী যে ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসূচী প্রস্তুত করাই বিবেক-বুদ্ধির স্বাভাবিক দাবী। কারো দৃষ্টিতে এ কর্মসূচী অপূর্ণাংগ মনে হলে তার উচিত প্রকৃতিকে জিজ্ঞেস করা, কেন সে একটি শ্রেণীকে পূর্ণতা লাভের সৌভাগ্য থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করেছে ? কিংবা তাকে নারীর যোগ্যতায় কমপক্ষে এতটুকু পরিবর্তন সাধন করতে হবে যাতে নারী তার প্রস্তাবিত কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হয়।

নারী একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই শুধু কাজ করতে পারে। বর্তমান তামাদ্দুনিক উন্নতি এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মনে করা হয়। কারণ, জীবনের যে বিভাগেই তামাদ্দুনিক উন্নতি হয়েছে সেখানে পুরুষের সাথে নারীও অংশীদার ছিল। নারী যদি সহযোগিতা না করতো তাহলে উন্নয়নের গতি স্তিমিত হয়ে পড়তো।

এ ব্যাখ্যা বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রকৃতি ও বস্তু বিজ্ঞানের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাই বর্তমান সভ্যতার উন্নতির প্রাণশক্তি। এর সাহায্যে মানুষ পদার্থের এমন অনেক রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয় যা ইতিপূর্বে তার আয়ত্তের বাইরে ছিল। এসব বাস্তব জ্ঞান ও আবিষ্কার বর্তমান সভ্যতার উৎস। এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গবেষণা লব্ধ এসব জ্ঞান পুরুষের চেষ্টা-সাধনার ফল। এতে নারীর অবদান খুব কম। এ ক্ষেত্রে নারী এমন কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি সভ্যতার ওপর যার গভীর প্রভাব পড়েছে। আর এ কারণেই আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের কোনো শাখায় নারী অগ্রপথিকের মর্যাদা লাভ করতে পারেনি।

কেন এমন হলো ?—কারণ, এটা তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র নয়। সে যদি এদিকে মনোযোগ দেয় তাহলে তার অবস্থা হবে একজন অপরিচিত ব্যক্তির মতো। তাকে এ ময়দানে কাজ করার যতো সুযোগ-সুবিধাই দেয়া হোক না কেন পুরুষের সাথে পাল্লা দেয়া তার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। তাই পাশ্চাত্যের বড় বড় চিন্তাবিদরা আজ স্বীকার করছেন যে, একজন নারীর নিকট থেকে যতোখানি প্রত্যাশা করা হয় সবরকম সুযোগ-সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও সে ততোটা

www.bjilibrary.com

উপযুক্ত প্রমাণিত হচ্ছে না। অথচ একজন কম শিক্ষিত পুরুষ একজন উচ্চ শিক্ষিত নারীর চেয়ে সমাজের বেশী কল্যাণ করছে।

এর কারণ হলো, সে কাজ করতে চায় পুরুষের কিন্তু তার নারীত্ব এ পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান গতিধারা তাকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার প্রকৃতিগত যোগ্যতা সেদিকে অগ্রসর হতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এ টানাপোড়েনে তাকে এক ধরনের আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। এ কারণে পাশ্চাত্য আজ দিশেহারা।

প্রফেসর আর্নল্ড টয়েনবি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অতীতে আমরা নিছক বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের সমস্যাসমূহ সমাধানের যে চেষ্টাই করেছি তা ব্যর্থ হয়েছে এবং আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা হাসির খোরাক যুগিয়েছে। আমরা এমন সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছি যার দ্বারা হাজার হাজার মানুষকে প্রাণান্তকর পরিশ্রমের হাত থেকে মুক্তি দেয়া যায়। এ কাজ করে আমরা মনে করলাম অনেক বেশী উন্নতি করেছি। কথাটি নিসন্দেহে সত্য। কিন্তু এর একটি ভয়ংকর ফল দাঁড়ালো এই যে, হতভাগা নারী আজ যে পরিশ্রম করতে বাধ্য হচ্ছে তা ইতিপূর্বে আর কখনো সে করেনি। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকার নারী সমাজের প্রতি লক্ষ করুন। পারিবারিক কাজকর্মের জন্য তারা বাইরের কোন সাহায্য থেকে বঞ্চিত। আর শুধু পারিবারিক কাজকর্মের পিছনেই সে তার পুরো সময়টা ব্যয় করবে এমন অবকাশ নেই। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, অসহায় নারী দ্বিগুণ পরিশ্রমের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। বাড়ীতে সে স্ত্রী এবং মা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। আর ঘরের বাইরের কোনো অফিস বা কারখানায় কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হচ্ছে।

যুদ্ধকালীন সময়ে ইংল্যাণ্ডের নারী সমাজের এ অবস্থা ছিল প্রায় গোটা দেশব্যাপী। অবস্থার এই গতিকে কোনো মতেই উৎসাহ ব্যঞ্জক বলা যায় না। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, যখনই নারী বাড়ীর চার দেয়াল পেরিয়ে বাইরে বেরিয়েছে তখনই সাধারণত পৃথিবীতে পতন যুগ শুরু হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসে খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীস উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছিল। নারী ছিল তখন তাদের ঘরের সৌন্দর্য। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের অব্যবহিত পরে যে সময় নগর রাষ্ট্রগুলো পতনমুখী ছিল ঠিক সেই সময়ই এমন একটি নারী আন্দোলন শুরু হয়েছিল যেমনটি বর্তমানে আমাদের সময়ে দেখা যায়।

নারীর ঘর ছেড়ে বাইরে বের হওয়া দুই ভাবে পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত ঃ এভাবে জীবনের বিরাট একটা অংগন অচল হয়ে যায় এবং তার অসংখ্য সমস্যা সমাধানহীন অবস্থায় থেকে যায়। কারণ, একমাত্র নারীই

www.bjilibrary.com

ওইসব সমস্যার সমাধান করতে পারে। ওইগুলোর সমাধান পুরুষের সাধ্যাতীত। দ্বিতীয়ত ঃ এ পদক্ষেপের কারণে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক এবং তাদের কর্মতৎপরতা এমন এক পথের দিকে মোড় নেয় ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অনুসারে সে পথের পথিক কখনো সফলতার মুখ দেখতে পারেনি।

সত্য বলতে কি, সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক ও তাদের সঠিক স্থান নির্ণয়ে না প্রাচীন ধ্যান-ধারণা সফলতা লাভ করেছে, না আধুনিক চিন্তাধারা তার সমাধান করতে পেরেছে।

আমাদের মতে, একমাত্র ইসলামই নারী ও পুরুষের মনস্তত্ত্ব, স্বভাবগত পসন্দ এবং চিন্তা কর্মশক্তির বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা করেছে। আর এ কারণেই সে সমাজব্যবস্থায় উভয়ের অবস্থান নির্ণয়েও পুরোপুরি সফল হয়েছে।

ইসলাম সর্বাগ্রে আমাদের সামনে এ সত্যটি পেশ করে যে, প্রকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ ও বেঁচে থাকার ব্যাপারটি বিপরীতমূখী দু'টি সত্তা অর্থাৎ নারী ও পুরুষের সাহায্যে টিকে আছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে এ দু'টি শ্রেণীর যাকে যে ধরনের কাজে লাগাতে চায় তাকে ঠিক সেই ধরনের যোগ্যতাও দিয়েছে। তাই নারী ও পুরুষের সত্যিকার পূর্ণতা হলো প্রকৃতির ইচ্ছা পূরণে নিজের সবটুকু যোগ্যতা ব্যয় করা।

এ মতাদর্শ অনুসারে সমাজে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র যদিও সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় কিন্তু শুধু এ কারণে সে অপর শ্রেণীটির ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না যে, তার মধ্যে এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আছে যা অন্য শ্রেণীটির মধ্যে নেই। অধিকন্তু কোনো শ্রেণীই তার কর্ম ও চেষ্টা-সাধনাকে লাঞ্ছনাকর, অসম্মানজনক মনে করতে বাধ্য হবে না। যেসব লোক প্রকৃতির দেখানোর পথে চলবে সমাজ তাদের আপন করে নেবে এবং সম্মানের চোখে দেখবে। পক্ষান্তরে প্রকৃতির দেখানো পথ থেকে সরে গিয়ে যেসব চেষ্টা-সাধনা হবে তা ঘৃণা ও নিন্দার যোগ্য বলে স্থিরকৃত হবে। সাথে সাথে তার বাস্তব ফল হবে এই যে, প্রত্যেক শ্রেণী তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ও পদক্ষেপ গ্রহণের পুরো সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু গণ্ডির বাইরে তার কর্মতৎপরতা হবে সবচেয়ে কম।

কেউ একথা বলে মতাদর্শটির অবমূল্যায়ন করতে পারেন যে, মানুষ কার্যতঃ উন্নত ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শ মেনে চলে না। বরং সাধারণভাবে সে এমন সব কর্মকাণ্ড ও কার্যকারণের পেছনে ছুটে চলে যা দ্বারা তার আবেগ অনুভূতি তৃপ্ত হয় এবং যা তার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে ধরা দেয়। তাই ইসলামী মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এ আশা করা যায় না যে, পুরুষ নারীর সাথে মমতার আচরণ করবে। কারণ, মানুষের সবচেয়ে বড় স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষা হলো অন্যের ওপর বিজয়ী হওয়া ও

www.bjilibrary.com

কর্তৃত্ব করা। স্বভাবত এ আকাঙ্ক্ষা তাকে বাধ্য করে তার চেয়ে দুর্বলরা যেন দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে অগ্রসর হতে বা সমকক্ষ হতে না পারে। বরং সে তাদেরকে দুর্বল করেই রাখতে চায়।

কথাটি দুনিয়ার আরো সব মতাদর্শের ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে। কিন্তু ইসলামী মতাদর্শ ধ্যান-ধারণাকে অনুরূপ মনে করা নিতান্তই ভুল। কারণ, এর পেছনে এক পরাক্রমশালী মহাসত্তার জীবন্ত থাকার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং তার সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের ভয় সর্বদা কার্যকর। এ বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো কাজ বা আচরণ করার অর্থ হলো মৃত্যুফাঁদকে মৃত্যুফাঁদ জেনেও তার মধ্যে কারো মুখ গলিয়ে দেয়া।

এসব সত্ত্বেও ইসলাম নারীর ভাগ্যকে পুরুষের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর এমনভাবে ছেড়ে দেয়নি যে, আল্লাহর ভয় যদি তাকে যুলুম ও অত্যাচার থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় তাহলে ভাল কথা। কিন্তু আল্লাহভীতি শিথিল হয়ে পড়লে সব রকমের যুলুম-নির্যাতনের পথ যেন উন্মুক্ত হয়ে যায়। বরং ইসলাম আইনগতভাবেও নারীর পজিশন এতটা সুদৃঢ় করে দিয়েছে যে, সে প্রকৃতিগত দুর্বলতা সত্ত্বেও সমাজে না কোনোদিন মযলুম ও অসহায় হয়ে পড়বে, না দারিদ্র ও বুভুক্ষার শিকার হতে বাধ্য হবে। তার বলার ও লেখার অধিকার থাকবে, সে রাষ্ট্রের সমস্ত উপায় উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা এতোটাই লাভ করতে পারবে যতোটা পুরুষ করে থাকে। তার প্রতি ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা হবে না। রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকেরই তার জান, মাল ও ইজ্জত আবরুর প্রতি হাত বাড়ানোর অধিকার থাকবে না। এমন কি মা-বাপ, স্বামী ও শাসকদেরও তার কাছে কোনো বে-আইনী দাবী পেশ করার অধিকার থাকে না।

আইনগত এ কড়াকড়ির পাশাপাশি ইসলাম পুরুষের মধ্যে স্নেহ-মায়া ও ভালোবাসার অনুভূতিও জাগিয়ে তোলে। ইসলাম বলে, নারী দুর্বল। তাই সে সমবেদনা, দয়ামায়া ও স্নেহ-ভালোবাসার পাত্রী, কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার লক্ষ নয়। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মহান আল্লাহর গুণ। নারীর তুলনায় পুরুষ যদি আল্লাহর এ গুণটির অধিক অংশ লাভ করে থাকে তাহলে ভালোবাসা ও সমবেদনার ক্ষেত্রেও তাকে অধিক ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, মহান আল্লাহ যতো বড় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ততো বড় দয়ালু ও স্নেহশীল। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের নেশা যে, ব্যক্তির মধ্যে পশু ও হিংস্র নেকড়ের স্বভাব সৃষ্টি করে দেয় সে যার পর নাই নির্বোধ ও অদূরদর্শী। এ আবেগ অনুভূতি এতো শক্তিশালী যে, আইন তাকে সামাল দিতে পারে না।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

❒

www.bjilibrary.com

ইসলামী সমাজে নারী

মৌলিক ধারণা

যে মতবাদ কোনো আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা ছাড়া উক্ত আদর্শকে বিশদভাবে বুঝা অসম্ভব। কারণ, তা দ্বারাই ঐ আদর্শের কাঠামো বা রূপরেখা নির্দিষ্ট হয়, মেজাজ গড়ে ওঠে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও তামাদ্দুনিক অধিকারসমূহও চিহ্নিত হয়। মোট কথা, এর ভিত্তিতেই জীবনের কাঠামো নির্মিত হয় এবং ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কারণে ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা, তার অধিকার ও এখতিয়ার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে হলে প্রয়োজন তার সম্পর্কে ইসলামের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারেও অবগতি অর্জন করা যাতে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত অবহিত হওয়া যায়।

১. মানুষ সম্মানিত সৃষ্টি

আপনি যদি ইসলামী শিক্ষার সারকথা জানতে চান তাহলে এক কথায় তার জবাব হলো, ইসলাম মানুষের মর্যাদা ও গৌরবের দাওয়াত। ইসলাম মানুষের পতন ও পশ্চাদপদতার গহ্বর থেকে তুলে মর্যাদা ও গৌরবের এমন এক উচ্চ স্থানে পৌঁছিয়ে দিতে চায় যা কল্পনারও অনেক ঊর্ধে। ইসলাম আত্মমর্যাদা ও মানুষের মহত্ত্বের শিক্ষা দেয়। সে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের দিকে এজন্য আহ্বান জানায় যাতে মানুষ একটি জায়গায় মাথা নত করে বিশ্ব-জাহানের সব সৃষ্টির চেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ মানুষ হিসেবে তার স্বভাব ও গুণাবলীর দিক থেকে প্রকৃতির এক মহান কৃতিত্ব। বাহ্যিক অবয়ব ও আভ্যন্তরীন গুণাবলী উভয় বিচারেই সে বিশ্ব-জাহানের এক সম্মানিত সত্তা দুনিয়ার কোনো সৃষ্টি শক্তি, মর্যাদা ও মহত্ত্বে তার সাথে তুলনীয় হওয়ার যোগ্য নয়।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۔ بنى اسرائيل : ٧٠

"আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। আর ভূ-ভাগে ও সমুদ্রে (দূরত্ব অতিক্রমের জন্য) তাদেরকে যানবাহন দিয়েছি, পবিত্র জিনিসের রিযিক দিয়েছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর তাদের মর্যাদা দিয়েছি।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০

www.bjilibrary.com

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○ - التين : ٤

"আমি মানুষকে সর্বোত্তম অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আত তীন ঃ ৪

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ط اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ○ - ص ٧١-٧٥

"যে সময় তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি মাটি দিয়ে এক মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। অতপর আমি যখন তা সম্পূর্ণরূপে বানাবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ্ ফুৎকার করবো তখন তার সামনে তোমরা সিজদায় পড়ে যাবে। সুতরাং ফেরেশতারা সবাই সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু ইবলিস তার বড়ত্বের অহংকার করলো এবং কাফের হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ হে ইবলিস ! আমি যাকে আমার দু' হাত দিয়ে বানালাম তাকে সিজদা করতে কিসে তোমাকে বাধা দিল ? তুমি বড়ত্ব জাহির করছো, নাকি তুমি কোনো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সত্তা ?"

–সূরা সোয়াদ ঃ ৭১-৭৫

এগুলো এবং এ ধরনের আরো বহু আয়াত সত্যিকার অর্থে দুনিয়াকে মানুষের সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক উন্নত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই তার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকানোর কোনো অবকাশ নেই। তার মহত্ত্ব ও মর্যাদা আঘাত প্রাপ্ত হয় এমন কোনো আচরণও তার সাথে করা যাবে না। এ নিয়ম-বিধির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণকারী ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদাকেই চ্যালেঞ্জ করে। সে এমন একটি আইনের ক্রটি অন্বেষণে ব্যস্ত যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিকগুলোও সমালোচনার উর্ধে এবং যার প্রতিটি বর্ণের ওপর পরিশুদ্ধতা ও সত্যতার মোহর লাগানো আছে।

২. ঈমান ও আমল মর্যাদার মাপকাঠি

এ ধারণা মেনে নেয়ার পর মানুষের (নারী হোক বা পুরুষ) মহত্ত্ব ও মর্যাদা ধূলির পৃথিবী ছেড়ে চন্দ্র ও তারকার দেশেরও উর্ধে পৌঁছে যায়। আর স্বাভাবিকভাবেই সে এমন একটি উচ্চ স্থান লাভ করে যার চেয়ে উচ্চতর স্থান

www.bjilibrary.com

কল্পনায়ও ধরা দেয় না। যদি সে তার চিন্তা ও কর্ম দ্বারা নিজেকে এ উচ্চতর স্থানের অযোগ্য প্রমাণ করে তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাকে মর্যাদা ও মহত্ত্বের আসনে বসাতে সক্ষম নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা সুস্থ চিন্তা ও সঠিক কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। যে আদর্শ ও মতবাদ নারীকে শুধু নারী হওয়ার কারণে নীচু ও লাঞ্ছনার যোগ্য মনে করে, মানবতার উচ্চতর আসন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং পুরুষকে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে উচ্চতর আসনের উপযুক্ত মনে করে, ইসলাম তাকে জাহেলী আদর্শ ও মতবাদ মনে করে। ইসলাম পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, মর্যাদা ও লাঞ্ছনার এবং মহত্ত্ব ও নীচতার মাপকাঠি হলো তাকওয়া-পরহেজগারী এবং চরিত্র ও নৈতিকতা। এ মাপকাঠিতে সে যতোটা খাঁটি প্রমাণিত হবে মহান আল্লাহর কাছে সে ততোটাই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ - النحل : ٩٧

"নারী বা পুরুষ যে-ই হোক না কেন, যে ভাল কাজ করলো সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে আমি তাকে একটি পবিত্র জীবন-যাপন করার সুযোগ দেব। আর যে উত্তম কাজ সে করছিলো আমি তাকে তার উত্তম পারিশ্রমিক দেব।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯৭

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ
وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ
وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ لا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا
عَظِيْمًا ○ - الاحزاب : ٣٥

"যেসব নারী ও পুরুষ মুসলমান, মু'মিন, আনুগত্যশীল, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সামনে নতশীর, সাদকাদানকারী, রোযাদার, যৌনাঙ্গের হিফাজতকারী এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারী— নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মাগফেরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৫

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

www.bjilibrary.com

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

"তাদের রব এ মর্মে তাদের দোয়া কবুল করলেন যে, নারী হোক বা পুরুষ হোক আমি তোমাদের কোনো আমলকারীর আমল নষ্ট করবো না। তোমরা পরস্পর এক, যারা আমার জন্য হিজরত করেছে, যাদেরকে বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, আমার পথে চলার কারণে যাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে, যারা লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সব অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব এবং এমন জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর ধারা বয়ে যাচ্ছে। এটা আল্লাহর নিকট থেকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার। আর আল্লাহর কাছেই উত্তম পুরস্কার রয়েছে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫

অর্থাৎ মানব জাতির দু'টি শাখার যেটিই তার আমলনামা কর্মের পবিত্রতা দ্বারা উজ্জ্বল করবে মর্যাদা ও সফলতা তার ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ হবে। বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাকে প্রশ্ন করা হবে না, তুমি মানুষের নারী বা পুরুষ কোন্ শ্রেণী বা গোষ্ঠীটির অন্তর্ভুক্ত ছিলে ? কিন্তু কেউ যদি তার জীবন গ্রন্থ দুষ্কর্ম দ্বারা কালিমা লিপ্ত করে তাহলে সে নারী হোক বা পুরুষ হোক সফলতা ও মর্যাদা লাভের আশা তার না করাই উচিত।

যেসব ঈমানদার তাদের জান-মাল, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগ অনুভূতি মহান আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত করে দিয়েছে কুরআন মজীদের এক জায়গায় তাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে ঃ

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ - التوبة : ١١٢

"তারা বার বার আল্লাহর প্রতি রুজু করে, তাঁর প্রশংসা করে, তাঁর উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে বিচরণ করে, রুকূ ও সিজদা করে, ভাল কাজে আদেশ করে, মন্দ কাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হিফাজত করে। (হে নবী) এসব মু'মিনদের সুসংবাদ দান করো।"–সূরা আত তওবা ঃ ১১২

www.bjilibrary.com

আরেকটি স্থানে নবী স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে তাঁদের মধ্যে এসব গুণাবলী সৃষ্টি করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, এসব গুণাবলী ছাড়া তাঁরা নবী স.-এর স্ত্রীর মর্যাদায় আসীন থাকতে পারে না। আর নবী স. সহজেই এমন সব স্ত্রী লাভ করতে পারবেন না যাঁরা এসব গুণাবলীর অধিকারিণী হবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝ - التحريم : ٥

"নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে তাঁর প্রভু অতি সত্বর তোমাদের বদলে তাকে এমন সব স্ত্রী দান করবেন যারা হবে তোমাদের চেয়ে উত্তম অর্থাৎ মু'মিন, মুসলমান, অনুগত তওবাকারিণী, ইবাদাত গোজার, রোযাদার, বিধবা অথবা কুমারী (উভয় প্রকার হতে পারে)।"–সূরা আত তাহরীম ঃ ৫

এ থেকে বুঝা গেল, কুরআনের দৃষ্টিতে নেকী, তাকওয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভের নিমিত্ত পুরুষের জন্য যে মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা হয়েছে নারীর জন্যও সেই একই মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ মানে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া পুরুষ যেমন তার মনযিলে উপনীত হতে সক্ষম নয় তেমনি নারীও তার মনযিলে উপনীত হতে সক্ষম নয়।

৩. নারী পুরুষ উভয়েই সভ্যতার নির্মাতা

কুরআন মজীদ আমাদের একথাও বলে যে, জীবনের সবরকম তৎপরতা ও উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। উভয়ে মিলে জীবনের কঠিন ভার বহন করেছে এবং উভয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সভ্যতা ও তমাদ্দুনের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। মানুষের এ দু'টি শ্রেণীর কোনোটিকেই কোনো জাতি বা আন্দোলন কোনো দিনই গুরুত্বহীন মনে করতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের প্রচার ও প্রসার এবং তার বিজয় লাভ ও প্রভাব বিস্তারে নারী ও পুরুষকে যেমন পাশাপাশি কর্মতৎপর দেখা যায় ঠিক তেমনি বাতিলের উন্নতি ও শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও তারা সমানভাবে অংশীদার হয়ে থাকে।

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ - التوبة : ٦٧

"মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারী একে অন্যের দোসর। তাঁরা খারাপ কাজের আদেশ দেয়, ভাল কাজ করতে নিষেধ করে এবং (কল্যাণের কাজে) নিজের হাত গুটিয়ে রাখে, তারা তো আল্লাহ্‌কেই ভুলে গেছে। তাই আল্লাহ্‌ও তাদের ভুলে গেছেন। মুনাফিকরাই নিশ্চিতভাবে ফাসেক।"
—সূরা আত তাওবা ঃ ৬৭

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ - التوبة : ٧١

"আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ্ এদেরকেই রহমত দান করবেন। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।"
—সূরা আত তাওবা ঃ ৭১

সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে সাধিত বিপ্লব নারী ও পুরুষের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা-সাধনার ফল। এ বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়ার পর বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়-ইনসাফের এমন কি যুক্তি অবশিষ্ট থাকে যা দ্বারা একজনকে মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য এবং আরেকজনকে অপমান ও লাঞ্ছনার যোগ্য মনে করা যেতে পারে? যুগে যুগে ভাঙা গড়ার ক্ষেত্রে উভয়েরই সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে তখন একজনকে সভ্যতা ও তামাদ্দুনের কর্মক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া কি বোকামী নয়? দুনিয়ার কোনো মানুষ কি নিজের দেহের একটি অংশকে অচল ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়ার পরও জীবন সংগ্রামে তার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম?

৪. নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের আগমনের পূর্বে গোটা দুনিয়া নারী জাতিকে একটি অকল্যাণকর তথা সভ্যতা ও তামাদ্দুনের জন্য অপ্রয়োজনীয় উপাদান মনে করে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছিল। তাকে অধঃপতনের এমন এক অন্ধকার গুহায় নিক্ষেপ করেছিল যেখান থেকে তার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের আশা করা ছিল বাতুলতা। দুনিয়ার এ আচরণের বিরুদ্ধে ইসলাম উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললো যে, গতিশীল জীবন নারী ও পুরুষ উভয়ের মুখাপেক্ষী। নারীকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, সে ধাক্কা খেতে থাকবে এবং

www.bjilibrary.com

তাকে জীবনের রাজপথ থেকে তুলে কাঁটার মতো দূরে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ, পুরুষকে সৃষ্টি করার যেমন একটা লক্ষ ও উদ্দেশ্য আছে তেমনি নারীকে সৃষ্টিরও একটা লক্ষ ও উদ্দেশ্য আছে। মানুষের এ দু'টি শ্রেণী দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অভীষ্ট লক্ষ পূরণ করেছেন।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○ اَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○ - الشورى : ٤٩-٥٠

"ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয় প্রকার সন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সর্ব জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত ও সর্ব শক্তিমান।"–সূরা আশ শুরা ঃ ৪৯-৫০

ইসলাম নারী জাতিকে লাঞ্ছনা ও অমর্যাদাকর অবস্থান থেকে এতো দ্রুততার সাথে উঠিয়ে এনে অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন ঃ

كُنَّا نَتَّقِى الْكَلَامَ وَالْاِنْبِسَاطَ اِلٰى نِسَاءِنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ هَيْبَةَ اَنْ يُّنَزَّلَ فِيْنَا شَيْئٌ فَلَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِيُّ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا ـ

"নবী স.-এর যুগে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কথা বলতে এবং প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেও ভয় পেতাম এই ভেবে যে, আমাদের সম্পর্কে কোনো আয়াত নাযিল না হয়। নবী স.-এর ইনতিকাল হওয়ার পর আমরা প্রাণ খুলে তাদের সাথে মিশতে শুরু করলাম।"[১]

এ নির্যাতিত শ্রেণীটির বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। কুরআন বললো, না তারাও জীবিত থাকবে এবং যে ব্যক্তিই তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে মহান আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ○ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ○ - التكوير : ٨-٩

"আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ কোন অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিলো।"–সূরা আত তাকবীর ঃ ৮-৯

১. বুখারী কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আল-ওসাতু বিন নিসা, ইবনে মাজা, অনুচ্ছেদ ঃ যিকরু ওফাতিহি ওয়া দাফানিহি স.

www.bjilibrary.com

নবী স. এ নির্যাতিত শ্রেণীকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনামা ও শিক্ষা দিয়েছেন আজ পর্যন্ত নারী অধিকারের কোনো দাবীদার তার চেয়ে ন্যায়ানুগ ও বাস্তব শিক্ষা পেশ করতে সক্ষম হয়নি। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنْعًاوهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ .

"আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, হকদারকে হক না দেয়া, সবরকম পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং মেয়ে সন্তানদের জ্যান্ত কবর দেয়া।"

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَن كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُوْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ .

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কন্যাসন্তান আছে, আর সে তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করেনি কিংবা তার সাথে লাঞ্ছনাকর আচরণ করেনি এবং পুত্রসন্তানকে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়নি আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[১]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَاَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ .

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তান লালন পালন করেছে, তাদেরকে উত্তম আচরণ শিখিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে জান্নাত লাভ করবে।"

হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

مَنْ بَلِى مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

"আল্লাহ যদি কাউকে কন্যাসন্তানের মাধ্যমে কোনো রকম পরীক্ষায় ফেলে থাকেন আর সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে তাহলে ঐসব কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে।"[২]

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ ঃ ফী ফাদলে মান আলা ইয়াতামা, মুসতাদরিক হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৭।

২. বুখারী, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ ঃ রাহমাতুল ওয়ালাদ ওয়া তাকাবিলুস্ ওয়া মুয়ানাকাতুহ, মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াসসিলাতি, বাবু, ফাদলুল ইহসান ইলাল বানাত।

www.bjilibrary.com

নবী স. কত দরদ ভরা ভাষায় বলেছেন ঃ

الا ادلك على افضل الصدقة ابنتك مردودة اليك ليس لها كاسب غيرك

"আমি কি তোমাকে সবচেয়ে মর্যাদা পূর্ণ সাদকার কথা বলবো না? তোমার যে কন্যাকে (বিধবা হওয়ার কিংবা তালাক দেয়ার কারণে) তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তুমি ছাড়া তার দায়িত্ব গ্রহণকারী বা উপার্জনকারী আর কেউ নাই।"[১]

عن انس رض قال قال رسول الله ﷺ من عال لجاريتين حتى تدركا دخلت الجنة انا وهو كهاتين واشار باصبعيه السبابة والوسطى بابان معجلان عقوبتهما فى الدنيا البغى والعقوق.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাসন্তানকে প্রতিপালন করে বড় করলো সে এবং আমি এভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। নবী স. তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে একথা বললেন। তিনি আরো বললেন ঃ দু'টি পথ এমন আছে যা দিয়ে দুনিয়াতেই অতি দ্রুত আযাব আসে। তাহলো, যুলুম ও সীমালংঘন এবং অবাধ্যতা।"[২]

এ হাদীসের শেষ বাক্যটিতে নবী স. একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার প্রতি ইংগিত করেছেন। অর্থাৎ যুলুম-নির্যাতনের সময় সীমা এমনিতেই খুব স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ করে যুলুমের যে তীর নিজের কলিজার টুকরাকে লক্ষ করে নিক্ষিপ্ত হয় তা মযলুমের বক্ষ ভেদ করার পূর্বেই যালেমের জীবন কাল নিশেষ করে দেয়।

গোটা বিশ্ব নারী জাতিকে অপরাধের উৎস, এবং সাক্ষাত পাপ ও গোনাহ মনে করে বসেছিল। কিন্তু বিশ্ব-জাহানের সেই সর্বকালের অতি পবিত্র ব্যক্তিত্ব যার প্রতিটি চলন-বলন ও আচরণ ছিল নৈতিকতায় ভরপুর, যিনি দুনিয়াকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির শিক্ষা দিয়েছেন, যাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এ জন্যে যে, পাপ ও অশ্লীলতায় ভরা বিশ্বে আমূল পরিবর্তন আনবেন। তিনি বলেছেন ঃ

حُبِّبَ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ .

---

১. ইবনে মাযা, আবওয়াবুল আদব, বাবু বিররুল ওয়ালেদ ওয়াল ইহসান ইলাল বানাত।

২. মুসতাদরিক হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা এবং তিরমিযী। তবে তিরমিযীর বর্ণনায় 'বাবানে মুআজজালানে' কথাটি নাই।

www.bjilibrary.com

"দুনিয়ার বস্তু নিচয়ের মধ্যে আমি ভালোবাসি নারী এবং সুগন্ধি আর আমার চক্ষু শীতলকারী হলো নামায।"[১]

অর্থাৎ নারীর প্রতি ঘৃণা পোষণ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি উদাসীনতা আল্লাহভীতির প্রমাণ নয়। আল্লাহভীতির অর্থ হলো, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা, তার প্রতি রুজু হওয়া এবং তাকে ভয় করা। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির আচরণ করার পাশাপাশি আল্লাহরও প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। বরং তার সন্তুষ্টিলাভের এটিই সঠিক পন্থা। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু এটা যেন, দুনিয়াটাই মানুষের সমস্ত চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষস্থলে পরিণত না হয়।

এক সময় নবী স.-এর স্ত্রীগণ উটের পিঠে সফর করছিলেন। নবী স. উষ্ট্রচালককে বললেন ঃ

رويداً اسوقك بالقوارير.

"কাঁচগুলোকে একটু দেখে শুনে যত্নের সাথে নিয়ে যাও।"[২]

হযরত ফাতেমা রা. সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

فَاِنَّمَا ابْنَتِيْ بُضْعَةٌ مِّنِّيْ يُرِيْبُنِيْ مَا رَابَهَا يُوْذِيْنِيْ مَا اذَاهَا .

"আমার মেয়ে আমারই রক্ত মাংস। যা তার সন্দেহ-সংশয় ও অশান্তির কারণ হয় তা আমারও সন্দেহ-সংশয় ও অশান্তির কারণ হয়। আর যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়।"[৩]

হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নবী স. কাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন ? তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ ফাতেমাকে।[৪]

একবার নবী স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার প্রিয়তম মানুষটি কে ? তিনি বললেন ঃ আয়েশা।[৫] এ দু'টি উক্তিই যথাস্থানে ঠিক। স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা রা. এবং সন্তানদের মধ্যে হযরত ফাতেমা রা. ছিলেন নবী স.-এর অতীব প্রিয় ব্যক্তিত্ব। এসব হাদীস থেকে আপনি নারী জাতি সম্পর্কে ইসলামের মেজাজ ও আবেগ অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে নারীদের প্রতি কি ধরনের আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করতে চায় ?

---

১. নাসায়ী, কিতাবু ইশরাতিন নিসা, অনুচ্ছেদ ঃ হুব্বুননিসা।
২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাবু রাহমাতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্নিসা-
৩. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, মুসলিম কিতাবুল ফাযায়েল, বাবু মিন ফাযায়েল ফাতেমা।
৪. তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, মা জাআ ফী ফাদলে ফাতেমা রা.।
৫. ঐ, ফাদলু আয়েশা রা.।

www.bjilibrary.com

ইসলামের এসব শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও কর্মে এমন একটি বিপ্লব আনলো যে, যারা এক সময় একটি নিষ্পাপ শিশুকে জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করতো না এবং এ নিষ্ঠুর আচরণ করতে গিয়ে যাদের ললাটে এক বিন্দু ঘাম পর্যন্ত দেখা দিতো না তারাই ঐসব শিশুর প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকে নিজেদের জীবনের পুঁজি মনে করতে লাগলো। আপন শিশু-সন্তান যাদের কোলে নিরাপত্তা পেতো না তারাই অন্যের সন্তানের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে গেল। আর যারা নারীর সাথে স্নেহ-ভালোবাস্যার আচরণ করতে জানতো না তারাই নিজেদের জীবন সন্ধায় এ নির্যাতিত মানব শ্রেণীর ভবিষ্যত চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো।

ওহুদের যুদ্ধের সময় হযরত জাবের রা.-এর পিতা তাকে বললেন ঃ বেটা, হয়তো এ যুদ্ধে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। জীবনের এ শেষ মুহূর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে কল্যাণকামিতার অছিয়ত করছি।[১]

সুতরাং হযরত জাবের রা. একজন যুবক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বোনদের দেখাশোনার জন্য একজন বিধবাকে নিজের জন্য পসন্দ করলেন। নবী স. যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে একজন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলো না কেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ

يا رسول اللّه ﷺ ان ابى قتل يوم احد وترك تسع بنات كن لى تسع اخوات فكرهت ان اجمع اليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن قال اصبت.

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। অর্থাৎ আমার নয়টি বোন আছে, তাদের দেখা শোনার প্রয়োজন আছে মনে করে আমি একজন অনভিজ্ঞ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা পসন্দ করি নাই। তাই এমন একজন নারীকে পসন্দ করেছি, যে তাদের চুল চিরুণী করে দিতে এবং দেখাশোনা করতে পারবে। নবী স. বললেন, তুমি ঠিকই করেছো।"

চিন্তা করুন, একজন যুবক, যার হৃদয়ের গভীরে আবেগের সমুদ্র তরঙ্গায়িত এবং যার উঠতি যৌবনের দাবী ও চাহিদা ভোগের উপকরণ কামনা করে সে নিজের ছোট ছোট বোনদের স্বার্থে আবেগকে অবদমিত করছে এবং কামনার পরিতৃপ্তির জন্য এমন একটি সমাধান বেছে নিচ্ছে যৌবনের উত্তালতা যা সহজে মেনে নিতে পারে না। এটা কি কোনো সাধারণ ত্যাগ ?

১. মুসতাদরিক হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৩।

www.bjilibrary.com

বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনানুসারে হযরত হামযা রা.-এর শাহাদাতের পর তিনজন তাঁর মেয়ের অভিভাবকত্বের দাবীদার হলেন।

একদিকে হযরত আলী রা. দাবী করলেন যে, সে আমার চাচাতো বোন। তাই তাকে প্রতিপালনের জন্য আমার দাবী অগ্রগণ্য।

অন্যদিকে হযরত জাফর রা. দাবী করলেন, আমি আলী রা.-এর চেয়ে তার লালন-পালনের অধিক হকদার। কেননা, সে যে আমার চাচাতো বোন শুধু তাই নয়, অধিকন্তু আমার স্ত্রী তার খালা। এজন্য দু'টি কারণে তার লালন-পালনের দায়িত্ব ও সুযোগ আমার হওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ হযরত যায়েদ রা. দাবী করে বসলেন যে, সে আমার ভাইয়ের (হযরত যায়েদ ছিলেন আনসার এবং হযরত হামযা রা. ছিলেন মুহাজির। নবী স. তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন) মেয়ে। তাই ভ্রাতৃ কন্যার প্রতিপালনের অধিকার চাচার চেয়ে আর কার বেশী থাকতে পারে ?[১]

চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এই যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছিল ইতিহাসের আর কোনো যুগে কি তার নজীর মিলবে ?

এসব শিক্ষার মধ্যে এতো শক্তি আছে যে, তা যুলুম ও নির্যাতনের দৃঢ় বাহুকে চুরমার করে দিতে পারে। যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে তার পক্ষে ন্যায় ও ইনসাফের সীমার বাইরে পা রাখা আদৌ সম্ভব নয়। তাই অসহায় ও দুর্বল নারীর প্রতি সে যুলুমও করতে পারে না।

৫. অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা

ইসলাম এসব উৎসাহব্যাঞ্জক কথা ও নৈতিক নির্দেশনা যথেষ্ট মনে করেনি বরং নারী ও পুরুষের অধিকার আইনগতভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং তা করেছে এমন সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য পূর্ণভাবে যে, নারীর জন্য কোনো অভিযোগের সুযোগ অবশিষ্ট নেই আর পুরুষের জন্য বাহুবল দেখানোরও কোনো অবকাশ বাকী নেই।

ইসলাম সমাজকে মানুষের অধিকারের সংরক্ষক এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জিম্মাদার বলে মনে করে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের কর্তব্য হলো, যে হাত যুলুম ও সীমা লংঘনের জন্য উত্তোলিত হবে তাকে কেটে ফেলা এবং

১. নাইলুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৭।

www.bjilibrary.com

যে পা হক ও ইনসাফকে পদদলিত করার জন্য অগ্রসর হবে তাও কেটে ফেলা। তাই কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِي الْاَلْبَابِ.

"হে জ্ঞানবানরা ! কিসাস তোমাদের জন্য জীবন দায়িনী ব্যবস্থা।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৯

শরীয়তের একটি সামগ্রিক স্থায়ী নীতি হলো, হন্তার প্রাণবধ করা। এ ক্ষেত্রে সে নারীকে হত্যা করছে না পুরুষকে হত্যা করছে তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ, একজন পুরুষের প্রাণ যেমন নিষিদ্ধ ও সম্মানিত তেমনি একজন নারীর প্রাণও নিষিদ্ধ ও সম্মানিত। তাই যে হাত এ দু'টির যে কোনো একটির খুন দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে সে যেন নিজের প্রাণের মূল্যই খুইয়ে বসেছে।

নবী স. ইয়ামানবাসীদের জন্য যেসব আইন লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে এ কথাটিও স্পষ্টভাবে ছিল ঃ

ان الرجل يقتل بالمرأة .

"কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।"

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসায়ী এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ইহুদী একটি মেয়েকে মাথা চূর্ণ করে হত্যা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঠিক একইভাবে তার থেকে কিসাস নিয়ে ছিলেন।[১]

হযরত উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এক মহিলার কিসাসে তিনি হত্যার অংশীদার কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন।

আবুয যানাদ বলেছেন ঃ

كان من ادركت من فقهانا الذين ينتهى الى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وابو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عنبه وسليمان بن يسار فى مشيخته جلة سواهم من نظرائهم من اهل فقه وفضل انهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عينا بعين واذنا باذن وكل شيئ من لجراح على ذالك وان قتل قتل بها.

১. আহকামুল কুরআন, জাস্সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬২।

www.bjilibrary.com

"আমাদের যেসব ফকীহর মতামত ফিকাহ শাস্ত্রে উদ্ধৃতির উপযুক্ত তাদের মধ্যে যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তারা হচ্ছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমবা, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার এবং তাদের পর্যায়ভুক্ত আরো ফকীহ ও জ্ঞানীগণ। তাঁরা সবাই বলেছেন ঃ কিসাসের ব্যাপারে নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। নারীর চোখ, কান এবং যে কোনো অংগের জখমের পরিবর্তে পুরুষের (যদি পুরুষ অপরাধী হয়) নিকট থেকে অনুরূপ বদলা নেয়া হবে। আর যদি কোনো পুরুষ নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে।"[১]

নারী যদি তার কোনো আত্মীয়ের হন্তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে অন্য কোনো আত্মীয় তার এ ক্ষমাকে রদ বা বাতিল করতে পারে না।

عَنْ عَائِشَةَ رضـ عَنِ النَّبِى ﷺ اَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُقْتَتَلِيْنِ اَنْ يَنْحَجِزُوْا وَالاَوَّلُ فَالاَوَّلُ وَاِنْ كَانَتْ اِمْرَاَةً.

"আয়েশা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন ঃ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যদি কিসাসের ব্যাপারে মতানৈক্য করে এবং কোনো নিকট আত্মীয় যদি তাঁকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে অন্য সব আত্মীয়কেও কিসাস গ্রহণের দাবী থেকে বিরত থাকতে হবে। এমনকি ক্ষমাকারী নারী হলেও।[২]

শুধু তাই নয় বরং যুদ্ধকালীন সময়ে সে যদি কোনো শত্রুকে আশ্রয় দান করে তাহলে তা বাতিল করা যাবে না। নবী স. বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَاْخُذُ لِلْقَوْمِ .

"নারীরা মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নিসন্দেহে শত্রুকে আশ্রয় দান করতে পারে।"[৩]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةَ لَتَجِيْرُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَجُوْزُ -

১. আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু আফুউন নিসা মিনাদদাম, নাসায়ী, কিতাবুল কাসামাহ, বাবু আফুউন নিসা আনিদ দাম।

২. ঐ

৩. তিরমিযী আবওয়াবুস সায়র, বাব ঃ মা জায়া ফী আমানিল মারআহ।

www.bjilibrary.com

"হযরত আয়েশা রা. বলেন, নারী যুদ্ধরত কোনো ঈমানদার লোককে আশ্রয় দিতে পারবে এবং তা কার্যকর হবে।"[১]

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। মক্কা বিজয়ের সময় উম্মে হানী নবী স.-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইবনে হুবাইরাকে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু আলী রা. বলছে সে তাকে হত্যা করবে। একথা শুনে নবী স. বললেন ঃ

قَدْ اَجِرْنَا مَنْ اَجِرْتَ يَا اُمَّهَانِىْ.

"উম্মে হানী, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।"[২]

এভাবে শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অনুমতি প্রদান করেছে এবং তাদের পারিশ্রমিকের ফলকে তাদের বৈধ অধিকার বলে স্বীকার করে। তার এ কাজে কেউ-ই আইনগতভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এমনকি স্বামীও স্ত্রীর সম্পদে কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকারী নয়। তেমনি স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর নিজের মর্জি খাটানোর কোনো আইনগত বৈধতা নেই।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ○ - النساء : ٣٢

"পুরুষের জন্য তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আর মেয়েদের জন্যও তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আল্লাহর কাছেই তোমরা তার নিয়ামতের জন্য প্রার্থনা করো।"[৩]-সূরা আন নিসা ঃ ৩২

উত্তরাধিকার আইনে এ নীতি বর্ণিত হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○ . النساء : ٧

"পুরুষের জন্য অংশ আছে সেই সম্পদে যা তার মা, বাপ ও ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন রেখে গেছে। আর মেয়েদের জন্যও অংশ আছে সে সম্পদে যা তার মা, বাপ ও ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছে। (সম্পদ)

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ঃ ফী আমানিল মারআহ।

২. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ঃ আমানুন নিসা ওয়া জাওয়ারুহুন্না।

৩. ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যেহেতু ভুল বুঝাবুঝি পরিলক্ষিত হয় এবং ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত লোকেরা ধোঁকায় পতিত হয় তাই ইসলামের উত্তরাধিকার আইন যে মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আমরা এখানে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি।

www.bjilibrary.com

কম বেশী যাই হোক না কেন তাতেই (উভয়ের জন্য) অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।"[১]–সূরা আন নিসা ঃ ৭

---

১. ইসলাম উত্তরাধিকার আইনের প্রথম যে মূলনীতি পেশ করে তা হলো ঃ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ। "একজন পুরুষের অংশ দু'জন স্ত্রীলোকের সমান হবে।"

দু' অবস্থায় এ নীতি কার্যকর হবে।

প্রথম অবস্থা হলো, ওয়ারিশ ব্যক্তি কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি মৃতের সাথে বৈধভাবে সম্পৃক্ত হবে। যেমন ঃ স্বামী ও স্ত্রী। দ্বিতীয় অবস্থা হলো, ওয়ারিশগণ যদি আত্মীয়তার দিক দিয়ে একই পর্যায়ের হয় এবং আসাবা (আসাবা হলো নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের অংশ দেয়ার পর যারা অবশিষ্ট সব সম্পদের অধিকারী হয়) হিসেবে মৃত্যের পরিত্যক্ত সব সম্পদের ওয়ারিশ হয়। যেমনঃ মৃত্যের ছেলেমেয়ে, ভাইবোন ইত্যাদি।

এ দুটি অবস্থায় বাহ্যত নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান করা হয়নি এবং পুরুষের তুলনায় নারীর আর্থিক পজিশন অনেক দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামের গোটা পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বাস্তব অবস্থা বিপরীত প্রমাণিত হবে। কিন্তু প্রকৃতিগত দুর্বলতা থাকার কারণে ইসলাম নারীর আর্থিক অবস্থা অতিমাত্রায় সংরক্ষিত ও দৃঢ় করে দিয়েছে। অথচ পুরুষের আর্থিক অবস্থা সর্বদা অনিশ্চিত ও অরক্ষিত। কারণ, ইসলাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক অংশ দিলেও দুটি পন্থায় তা পুষিয়েও দিয়েছে। একটি হলো, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে অর্থ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। নারী একাই এ অর্থের হকদার। অপরটি হলো, বিয়ের সময় যে সম্পদ, অলংকার ও উপহার উপঢৌকন প্রদান করা হয় নারীকেই তার মালিক হিসেবে গণ্য করেছে।

এ ক্ষেত্রে আরো একটি দিক আছে। তাহলো, ইসলাম গোটা পরিবারের আর্থিক, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায় দায়িত্ব মূলত পুরুষের কাঁধে চাপিয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক দায়-দায়িত্ব থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং বিয়ের পূর্বে নারীর আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করতে অভিভাবককে এবং বিয়ের পর স্বামীকে বহন করতে বাধ্য করেছে। এ অবস্থায় উত্তরাধিকারে উভয়কে সমান অধিকার প্রদান করা কেমন করে যুক্তিগ্রাহ্য ও ন্যায়ানুগ হতে পারে ?

এ দু'টি দিক বাদ দিলে ইসলাম যেখানে শুধু আত্মীয়তার বিষয় বিবেচনা করেছে সেখানে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা প্রদান করেছে। যেমন মৃতের ছেলে মেয়ের বর্তমানে তার পিতামাতা উভয়ে সমান অংশ লাভ করবে। তাছাড়াও বৈপিত্রেয় ভাইবোনের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও ইসলাম কোনো পার্থক্য করেনি।

ইসলামী শরীয়ত দ্বিতীয় যে মূলনীতিটি পেশ করেছে তা হলো ঃ

اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَفِى الْاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"প্রাপ্য প্রাপকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবিশষ্ট থাকবে তা নিকটাত্মীয় পুরুষদের প্রাপ্য।"–সহীহ মুসলিম–কিতাবুল ফারায়েজ

ইসলামী সমাজব্যবস্থার আরো একটি মূলনীতি ভালোভাবে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের এ দফাটি বুঝা সম্ভব নয়। উক্ত মূলনীতিটি হলো, ইসলাম পুরুষের ওপর আর্থিক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করার সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতার নিয়ম-বিধিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ নিয়ম-বিধি শুধু নৈতিক গুরুত্ব বহন করে না। বরং তার আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাও আছে। যদি কোনো লোক দারিদ্রের শিকার হয়ে পড়ে তাহলে যে ব্যক্তি তার অপেক্ষাকৃত নিকটাত্মীয় তার ওপরে সর্বাধিক আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা ও দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পিত হবে। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.bjilibrary.com

৬. অভিন্ন আইন

প্রাচীন ধর্মসমূহ নারী ও পুরুষকে একই মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই সেসব ধর্ম নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা আইন রচনা করেছিল। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন পুরুষ তেমনি নারীও। ইসলামের পয়গাম 'আন-নাস' বা মানব জাতির জন্য। কারণ তা 'রাব্বুন নাস' বা মানব জাতির রব এবং 'মালিকিন নাস' বা মানব জাতির মালিকের পয়গাম 'রব্বুর রিজাল' বা পুরুষদের রব এবং 'মালিকুর রিজাল' বা পুরুষদের মালিকের পয়গাম নয়। আল্লাহর আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর প্রতিশ্রুতি শুধু পুরুষ কিংবা নারী দিয়েছিল না। বরং 'আল-ইনসান তথা গোটা মানবকুল দিয়েছিল। তাই আল্লাহর দরবারে মানুষের এ দুটি শ্রেণীকেই প্রতিশ্রুতি পালনের প্রমাণ দিতে হবে।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝ لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ - الاحزاب : ٧٢-٧٣

"আমি আসমান, যমীন ও পাহাড়ের সামনে আমানত পেশ করলাম। কিন্তু তারা সবাই তা বহন করতে অপারগতা জানিয়ে অস্বীকার করলো এবং ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো, সে বড় যালেম ও অজ্ঞ। এটা এ জন্যে যেন আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেন। আর তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর তওবা কবুল করেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৭২-৭৩

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর)

এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। এতোটুকু উল্লেখ করার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, কোনো ব্যক্তি যখন জীবনের প্রতিটি উত্থান-পতন এবং প্রতিটি বিপদ-আপদে সর্বাধিক আশ্রয় ও সাহায্যদাতা হিসেবে পাশে দাঁড়ায় তখন বুদ্ধি-বিবেক এবং নৈতিকতা ও আইন কি এ দাবী করে না যে, অন্যদের অধিকার আদায়ের পরে যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে তা সে লাভ করুক ? তবে উত্তরাধিকার আইনে যেহেতু মূল গুরুত্ব বংশ সম্পর্ককে দেয়া হয়েছে তাই এই নিয়ম-বিধি অনুসারে এটা জরুরী নয় যে, পুরুষই সবসময় অধিক লাভ করবে। এ সম্ভাবনা অবশ্যই থাকবে যে, কোনো নারী মৃতের ঘনিষ্ট আত্মীয়া হওয়ার কারণে তার দূর সম্পর্কের পুরুষ আত্মীয়ের চেয়ে অধিক অংশ লাভ করবে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, এক ব্যক্তি স্ত্রী, এক মেয়ে, এক বোন এবং এক চাচাকে রেখে মৃত্যু বরণ করলো। এমতাবস্থায় ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে তার পরিত্যক্ত সম্পদের চতুর্থাংশ স্ত্রী এবং মেয়ে ও বোনের মধ্যে যেই হোক সে অর্ধাংশ আর চাচা চতুর্থাংশ অংশ লাভ করবে।

www.bjilibrary.com

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ঈমানদার নারী এবং ঈমানদার পুরুষের ব্যাপারে কোনো ফায়সালা দিলে সে ব্যাপারে তাদের আর কোনো এখতিয়ার থাকা ঠিক নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে সে স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬

ইসলাম যে শুধু স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য জীবনে চলার একটা পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাই নয় বরং একই পথ ও একই জীবনব্যবস্থা নির্দিষ্ট করেছে। ইসলাম নারীকে নগণ্য ও নীচু মর্যাদার এবং পুরুষকে সম্মানিত ও উঁচু মর্যাদার মনে করে আলাদা আলাদা আইন রচনা করেনি। ইসলামের শিক্ষা নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা দিয়ে সম্বোধন করে ও অভিন্ন নির্দেশনামা দান করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতি শ্রেণী বিভক্ত নয় কিংবা তাদের মধ্যে মর্যাদারও কোনো পার্থক্য নেই। বরং পুরুষ ও নারী একই রণাঙ্গনের সৈনিক। তাই তাদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হলেও লক্ষ ও উদ্দেশ্য অভিন্ন।

আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, ইবাদাত-বন্দেগী, অভ্যাস, আদান-প্রদান ও পারস্পরিক সম্পর্কের কোনো ক্ষেত্রেই ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেনি। তবে নারী ও পুরুষ হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই যতটা ব্যতিক্রম হওয়া দরকার, ইসলাম তা স্বীকার করেছে। নবী স. বলেছেন ঃ

اِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .

"নারীরা পুরুষের অর্ধাংশ।"[১]

আল্লামা ইবনুল আবেদীন হানাফী শরয়ী আইনের গোটা ভাণ্ডার ঘেটে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব, মাকরূহ ও নিষিদ্ধ বিষয়ে মাত্র পঁচাত্তরটি ক্ষেত্র এমন খুঁজে পেয়েছেন যেখানে ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে।[২] এর মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ই আবার সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ মেয়েরা নামাযের সময় কোথায় হাত বাঁধবে এবং পুরুষরা কোথায় হাত বাঁধবে? কাফনে মেয়েদের কয়টা কাপড় দিতে হবে আর পুরুষদের কয়টা কাপড় দিতে হবে? মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক

১. আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাবু ফিল রাজুলে ইয়াজিদুল বাল্লাতা ফী মানামিহি, তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাত, বাব ঃ ফীমান ইয়াসতাইকিযু ওয়া ইয়ারা বাললান ওয়ালা ইয়াযকুরু ইহতিলামান।

২. উত্তরাধিকার আইনও এর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

হওয়ার লক্ষণ কি ? এবং পুরুষদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ কি ? এর মধ্য থেকে মাত্র ছয় সাতটি মাসআলা সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। ইনশাআল্লাহ্ এগুলোর তাৎপর্য ও ধরন সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

৭. জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির বিধান

মোটকথা কুরআনের দাবী হলো ঃ আইনের ক্ষেত্রে, নৈতিক ক্ষেত্রে এবং অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে একই মর্যাদা দিতে হবে। উভয়েরই মর্যাদা ও অমর্যাদার মানদণ্ড এক হবে, উভয়ের উন্নতি ও সফলতার সুযোগ সমান হবে এবং উভয়েরই জানমাল ও ইজ্জত আবরু হিফাজত করতে হবে। কেন ? দুনিয়ার বর্তমান সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্য থেকে কুরআনই সর্বপ্রথম একথার দার্শনিক ও যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিয়েছে এবং অত্যন্ত জোরালো যুক্তি প্রমাণসহ বোধগম্য করে তা মানুষের সামনে পেশ করেছে। বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার হাজারো স্তর অতিক্রম করা সত্ত্বেও বিশ্ব আজও নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যের জন্য এর চেয়ে উত্তম ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেশ করতে পারেনি।

ইসলাম বলেছে, এ বিশ্ব-জাহান একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অত্যন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে তা কাজ করে যাচ্ছে। শত শত বছর অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তার চিত্রশালার বৈচিত্রে ও হৃদয় গ্রাহীতায় সামান্যতম পরিবর্তনও আসেনি। যুগের উত্থান পতন নিরবছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে কিন্তু তার স্বর্ণ খচিত মাহফিলের উজ্জ্বলতা ও বিস্ময়াবিষ্টতা যা ছিল তাই আছে, তাহলে কি সেই শক্তি, যা এই বিশ্ব-জাহানকে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করছে ? আর কি সেই আইন-বিধি যা তার জীবনের মুহূর্তগুলোকে দীর্ঘায়িত করছে ? এর উত্তরে কুরআন বলে যে, এ ক্ষেত্রে সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার নিয়ম-বিধি কার্যকর রয়েছে। অর্থাৎ এ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে তার নিজ অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণা বিদ্যমান। আর মহান আল্লাহ্ সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য তার স্ব-প্রজাতির একটি বিপরীত লিংগ বিশিষ্ট সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিপরীত সত্তাই তার আবেগ ও অনুভূতিতে সাড়া জাগিয়ে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং পৃথিবীর সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যে কোনো ভাটা পড়তে দেয় না।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ط يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ط

"তিনি তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর চতুষ্পদ জন্তুও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই তিনি তোমাদের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছেন।"–সূরা আশ শুরা ঃ ১১

www.bjilibrary.com

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٥ - الذريت : ٤٩

"আর প্রতিটি বস্তুকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা বুঝতে পারো।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪৯

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَيَعْلَمُوْنَ ٥ - يس : ٣٦

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি সবকিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন মাটিতে যা উৎপন্ন হয় তার, তাদের নিজেদের এবং যেসব জিনিস সম্পর্কে তারা জানে না, তারও।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৬

এসব আয়াত থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জোড়া বেঁধে সৃষ্টি করার নীতিটি ব্যাপকতার দিক দিয়ে গোটা সৃষ্টি জগতের সর্বত্র কার্যকর ও পরিব্যপ্ত। না মানুষ এর আওতা বহির্ভূত, না দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তু। এরূপ না হলে পরিবর্তনের বৈচিত্র, রূপ ও সৌন্দর্যের যাদুময়তা ও হৃদয়গ্রাহীতা মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং সব জিনিস এক অজানা নিরবতা ও তৃপ্তিহীনতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। মানুষের যৌন আবেগও তার বিপরীত লিংগের সাহচর্য ছাড়া তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। পুরুষের জীবনের এমন অনেক শূন্য দিক আছে যা কেবল নারীর সুন্দর ও কোমল হাতই পূর্ণ করতে সক্ষম। নারী তার জন্মগত চাহিদার যোগান, জীবনের স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব এবং প্রেম-সংগীতের সূক্ষ্ম তার। অনুরূপভাবে পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীর নারীত্বের আবাসভূমি বিরাণ হয়ে যায়। সে তার আবেগ অনুভূতির সৌন্দর্য এবং অস্থিরতা ও কুমারীত্বের সমাধান।

এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিতে ত্রুটি বা অপূর্ণতা বিদ্যমান। বরং এর প্রতিটি ফুল নিষ্কলংক এবং প্রতিটি কারুকার্য অনুপম। আল্লাহর কোনো সৃষ্টিতেই কোনো ত্রুটি ও অপরিপক্কতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবী এমনভাবে সজ্জিত করেছেন যে, এর একেকটি কারুকার্য অপরটির পূর্ণতা বিধান করেছে। জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার বিধান এরই একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ রূপ। অন্য কথায় দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু তার আপন যোগ্যতা ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশের জন্য এক একটি ক্ষেত্রের মুখাপেক্ষী। আর বিপরীত লিংগ বা গোষ্ঠীটি তার সেই ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। এটা এমন একটা সম্পর্ক যা প্রতিটি জোড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই সমপরিমাণে পরস্পরের মুখাপেক্ষী। এতে লাঞ্ছনা ও অপমানের কিংবা মর্যাদা ও গৌরবের কোনো প্রশ্নই আসে না। কুরআন মজীদ প্রতিবার

www.bjilibrary.com

নতুন নতুন পদ্ধতিতে এ সত্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। কুরআন মজীদের একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط - البقرة : ١٨٧

"তারা (মেয়েরা) তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক।"
--সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭

লক্ষ করুন, কত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা এটি। কুরআন যেন এখানে বলতে চাচ্ছে পুরুষের জীবনে এমন অনেক অতৃপ্ত দিক আছে একমাত্র নারীই যার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে পারে। একই ভাবে নারীর জীবনেরও অনেক ক্ষেত্র পুরুষ ছাড়া অপূর্ণ থেকে যায়। আর একটি স্থানে কুরআন বলছে, এ সম্পর্ক রাগ বা ঘৃণার সম্পর্ক নয়, বরং স্নেহ ও প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক। তা শত্রুতা বা বৈরিতার উপাদান দিয়ে গড়ে উঠেনি। বরং প্রেম-প্রীতি ও আগ্রহ-আকর্ষণ দিয়ে গড়ে উঠেছে। এ সম্পর্ক হিংসা-বিদ্বেষের বীজ বপনের জন্য নয়, বরং হৃদয় মনের গভীরে উত্তপ্ত ভালোবাসাকে লালনের জন্য।

وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - الروم : ٢١

"এটিও তার একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া-মায়ার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিসন্দেহে এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"--সূরা আর রূম ঃ ২১

উল্লেখিত এসব মূলনীতিই ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এসব মূলনীতি বাদ দিয়ে ইসলামী সমাজের কল্পনাও করা যায় না।

❐

www.bjilibrary.com

নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র

ইসলামী সমাজে মুসলিম মেয়েদের ভূমিকা কি হবে এবং তাদের কর্ম তৎপরতাই বা কি হবে কুরআন মজীদ এ প্রশ্নের জবাব নবী স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে দিয়েছেন ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاُوْلٰى○- الاحزاب : ٣٣

"তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সেজেগুজে রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়াবে না।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩

পটভূমি

মহান আল্লাহর এ নির্দেশের পটভূমি এই যে, হিজরতের পর নবী স. ও সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রটিকে নীতি ও নৈতিকতার আবাসভূমি বানানোর অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যে স্বপ্নকে তাঁরা মক্কায় বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি তা মদীনার পবিত্র ভূমিতে বাস্তবায়িত করে দেখাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যেসব শক্তি মানবতা ও নৈতিকতা এবং ন্যায় ও আল্লাহভীতির প্রসারকে তাদের মৃত্যু ঘন্টা বলে মনে করছিল তারা কোনো অবস্থাতেই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। এ উদ্দেশ্যে নবী স. তাঁর প্রচেষ্টা শুরু করার সাথে সাথে চারদিক থেকে ঝড়ের গতিতে ফিতনা-ফাসাদ শুরু করা হলো। ছয়টি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই প্রচণ্ড বিরোধিতার কালো মেঘ মদীনার দিক দিগন্ত এমনভাবে ছেয়ে ফেললো যে, মাঝে মাঝে আশংকা হতো হয়তো ন্যায় ও সত্যের আলো চিরদিনের জন্য নিভে যাবে এবং দুনিয়াটা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বাতিলের কব্জায় চলে যাবে। ফাসাদের এ উৎস মদীনার বাইরেই শুধু ছিল না বরং অভ্যন্তরেও মুনাফেকী ও শত্রুতার অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। মুনাফিকদের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ছিল যেন নৈতিকতা ও আল্লাহভীতির চারাগাছ মদীনাতে দৃঢ়মূল হতে না পারে এবং তাদের নিজেদের জীবনের পাতাগুলোতে যেমন নেকী ও তাকওয়ার পবিত্র নকশা খোদিত নেই তেমনি মদীনার গোটা পরিবেশও যেন তা থেকে মুক্ত থাকে। তাদের এ বিপর্যয়কর প্রচেষ্টার একটি বড় লক্ষ ছিল মানুষের নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন। কারণ, ইসলামী সমাজের এ মৌলিক স্তম্ভটি বিধ্বস্ত করা ছাড়া তারা তাদের যথেচ্ছাচার চালাতে ও প্রবৃত্তির দুনিয়া গড়তে সক্ষম ছিল না।

www.bjilibrary.com

এ দ্বিমুখী এবং সিদ্ধান্তকর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কল্পনা করুন এবং বলুন ঃ এরূপ নাজুক মুহূর্তে দুনিয়ার কোনো বুদ্ধিমান মানুষের সিদ্ধান্ত কি হবে ? সম্ভবত তার সিদ্ধান্ত হবে এ জাতির প্রত্যেক সদস্যকে শত্রুর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে প্রস্তুত হতে হবে এবং যতোদিন পর্যন্ত দেশ ও সমাজ সব রকমের বিপদাশংকা থেকে মুক্ত না হবে ততোদিন পর্যন্ত তাদের অস্ত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। দুনিয়ার এ সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে ইসলাম দেশ ও জাতিকে রক্ষার নতুন নীতিমালা ও আইন রচনা করলো। পুরুষদের সম্পর্কে ইসলামের সিদ্ধান্ত হলো, তাদেরকে প্রতিটি সমস্যার সরাসরি মোকাবিলা করে তার মস্তক চূর্ণ করতে হবে। কিন্তু জাতির কন্যাদেরকে তাদের মায়ের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা হলো যে, তারা এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ অবশ্যই করবে, তবে গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যে থেকে। তারা দীন ও ঈমানের ধ্বংসকারী শক্তির মোকাবিলা করতে থাকবে, তবে নিজেদের চরিত্র ও কর্ম এবং সম্মান ও আত্মমর্যাদাকে বাড়ীর নিরাপদ গণ্ডিতে রক্ষা করে।

এ পটভূমির আলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে দাবী করা যায় যে, ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষার দায়িত্ব মূলত পুরুষের ওপর অর্পণ করেছে। আর নারীর চেষ্টা-সাধনার গতি গৃহের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বাজারের বণিক, অফিসের কারনিক, আদালতের বিচারক এবং সেনাবাহিনীর সৈনিক হয়ে কাজ করা নারীর প্রকৃত মর্যাদা নয়। তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হলো গৃহ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু বকর জাস্সাস লিখেছেন ঃ

وفيه الدلالة على ان النساء مامورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج

"এ আয়াতটি এ বিষয়ের দলীল যে, নারীকে তার গৃহের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে।"[১]

নারীর কর্মতৎপরতার মর্যাদা

ইসলাম জীবন গঠনের জন্য যে নকশা পেশ করেছে তার সম্পর্ক ইবাদাতের সাথে হোক বা আদান-প্রদানের সাথে, পারিবারিক শৃঙ্খলার সাথে হোক বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সাথে এবং অর্থনৈতিক বিধি-বিধানের সাথে হোক বা সভ্যতার নীতিমালার সাথে, কোনো অবস্থায়ই সে নারীর প্রকৃত মর্যাদা ব্যাহত হতে দেয়নি।

ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদাতসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই অবহিত। মূলত এগুলোই ইসলামী জীবন-বিধানের রূহ বা প্রাণসত্তা। এসব ইবাদাতের

১. আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৩

www.bjilibrary.com

একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তা ব্যক্তিকে সম্বোধন করে ঠিকই কিন্তু পালন করার নির্দেশ দেয় সমষ্টিগতভাবে। নামায পড়তে হবে জামায়াত বদ্ধভাবে, রোযা রাখতে হবে সবাই মিলে একই মাসে, যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, হজ্জ আদায় করতে হয় সমবেতভাবে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে। এসব ব্যবস্থা এজন্য, যাতে ব্যক্তি নিজের প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র প্রীতি বা বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে নিজের মধ্যে সমাজ বিমুখ মনোভাব সৃষ্টি করে না নেয়। আর প্রতি পদক্ষেপেই সে যেন মনে করে যে, সে একটি সমাজের অংশ। এ সমাজকে ভাঙা বা গড়ার দায় দায়িত্ব তার উপরই বর্তায়।

সমষ্টিগত কোনো কাজ কেবল তখনই সমাধান হতে পারে যখন ব্যক্তি তার ব্যক্তি সত্তাকে পরিত্যাগ করে সামষ্টিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়। এজন্য ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় পরিত্যাগ করতে হবে, শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং শ্রমিককে শ্রম দেয়া ছেড়ে দিতে হবে। মোদ্দাকথা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তার বর্তমান অবস্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সামষ্টিক ইবাদাতে অংশগ্রহণের চেয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে তৎপর থাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোনো সামষ্টিক কর্মসূচী থেকে নারীর বিরত থাকা সমাজের জন্য ততোটা ক্ষতিকর নয় যতোটা তার নিজের কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করা ক্ষতিকর। সমবেতভাবে ইবাদাতের মাধ্যমে যে কল্যাণ লাভ হয় বিভিন্নভাবে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব। কিন্তু নারী তার কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা কোনোভাবেই পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আনুষ্ঠানিক ইবাদাত হোক বা জীবনের অন্য কোনো কর্তব্য হোক তা সমষ্টিগতভাবে পালন করা নারীর ওপর ফরযই করা হয়নি কিংবা হলেও এমন সব আনুষ্ঠানিক ইবাদাত ও করণীয় ফরয করা হয়েছে যা তাকে তার আসল লক্ষ সম্পর্কে গাফিল করতে পারে না। আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত নামাযের কথাই ধরুন। পুরুষের জন্য নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু নারীর জন্য নামায ফরয হলেও জামায়াতের সাথে আদায় করা জরুরী নয়। পুরুষ যদি বিনা কারণে জামায়াত পরিত্যাগ করে তাহলে তাকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় সাবধান করার যোগ্য মনে করা হয়। পক্ষান্তরে গৃহের নিভৃত কোণে কোনো একটি জায়গায় নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করতে নারীকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়।

নবী স. বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

خير مساجد النساء قعر بيوتهن .

"গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠ হলো নারীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ।"[১]

বিখ্যাত সাহাবা আবু হুমায়েদ সায়েদীর স্ত্রী নবী স.-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে মসজিদে নামায পড়তে চাই। এতে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন ঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি সত্যিই তা চাও। কিন্তু জেনে রাখ, তোমার বাড়ীর কোনো ছোট কামরায় নামায পড়া তোমার জন্য প্রশস্ত কামরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম, কামরার মধ্যে পড়া বাড়ীর মধ্যে পড়া থেকে উত্তম এবং মহল্লার মসজিদে পড়া নামাযের চেয়ে বাড়ীর মধ্যে অবস্থান করে পড়া উত্তম। অনুরূপ তোমার মহল্লার মসজিদে পড়া নামায আমার এই মসজিদে পড়া নামাযের চেয়ে উত্তম।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন ঃ আবু হুমায়েদ সায়েদীর স্ত্রীর ওপর নবী স.-এর বাণীর এতোটা প্রভাব পড়েছিল যে, তিনি ঘরের নিভত অংশকে তার নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন এবং সারা জীবন সেখানেই নামায পড়েছিলেন।[২]

জুম'আর নামায শুধু সংঘবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশই নয় বরং জাতির প্রতিটি ব্যক্তিকে পরস্পর ঘনিষ্ট করার এবং দীনি শিক্ষা ও হেদায়াত সম্পর্কে অবহিত করারও একটা সর্ব্রোত্তম মাধ্যম। কিন্তু ইসলামী শরীআত সংঘবদ্ধভাবে ইবাদাত করার এ ক্ষেত্র থেকেও নারীকে অব্যাহতি দিয়েছে।

عن طارق ابن شهاب عن النبى ﷺ قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة عبد مملوك او مرأة او صبى اومريض.

"তারেক ইবনে শিহাব নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ক্রীতদাস, নারী, শিশু এবং রোগী এ চার প্রকার লোক ছাড়া প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জুম'আর নামায ফরয।"

জীবদ্দশায় যেমন একজন মু'মিনের ইসলামী সমাজের কাছে হক বা অধিকার আছে ঠিক তেমনি যখন সে এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করবে তখনও তার হক বা অধিকার আছে। তার জীবদ্দশায় যেমন ইসলামী সমাজ তাকে সম্ভাব্য সবরকম আরাম দিতে সচেষ্ট থেকেছে। তেমনি যখন তার এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে তখনও যাথাযোগ্য মর্যাদায় দাফন করবে।

১. মুসনাদে আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৭, ও মুসতাদরিকে হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৯।

২. মুসনাদে আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭১, আল-ইসতিয়াব, ইবনু আবদিলবার, তাযকিরায়ে উম্মে হুমায়েদ আল আনসারিয়া।

www.bjilibrary.com

কিন্তু উম্মে আতিয়া রা. বর্ণনা করছেন ঃ

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.

"আমাদেরকে জানাযার সহগামী হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নবী স. এ ব্যাপারে আমাদের ওপরে কড়াকড়ি আরোপ করেননি।"[১]

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কোনো কোনো সময় তিনি এ ব্যাপারে কড়াকড়িও করেছেন। হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা নবী স.-এর সাথে একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় তিনি কোনো কোনো স্ত্রীলোককে পেছনে অনুগামী হতে দেখে (রাগতভাবে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি এটি বহন করছো ? তারা বললো, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার দাফনের কাজে কি তোমরা অংশ গ্রহণ করবে ? তারা বললো, না। এবার নবী স. বললেন ঃ তোমাদের যখন এখানে কোনো কাজ নেই তখন সাথে আসার কি প্রয়োজন আছে ? এজন্য কোনো পুরস্কার বা সওয়াব তোমরা পাবে না। মাথা ও চুলের সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে যাও।[২]

ন্যায় ও সত্যকে অবলম্বন করার নাম ইসলাম। মুসলমান সে যে সত্যকে মেনে চলার অঙ্গীকার করে। এ অঙ্গীকার করার পর প্রতিটি পদক্ষেপেই একজন মু'মিনের পরীক্ষা হতে থাকে। কিন্তু এ পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্যায় আসে তখন যখন ন্যায় ও সত্যের শত্রু সমস্ত শক্তি নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং হক ও বাতিলের জীবন ও মরণের মুহূর্ত সমাগত হয়। ন্যায় ও সত্যকে রক্ষা করার জন্য তখন জীবন বাজি রেখে অগ্রসর হওয়া একজন বিশ্বাসী বান্দার অলংঘণীয় কর্তব্য। এ নাজুক মুহূর্তেও যুদ্ধের ময়দানে নারীর বিশ্বস্ততার প্রমাণ চাওয়া হয়নি। বরং গৃহের গণ্ডিকেই তার পরীক্ষার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং স্বামী, ছেলে, মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণকামিতাই তাকে তার ঈমানের প্রমাণ হিসেবে মনে করা হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُنَّ بِالْبَيْتِ فَانَّهُ جِهَادُكُنَّ.

"হযরত আয়েশা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন ঃ তোমরা গৃহকর্মে লেগে থাকো। এটাই তোমাদের জিহাদ।"[৩]

এক মহিলা সাহাবী নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ الْجِهَادُ عَلَى الرِّجَالِ فَاِنْ اَصَابُوْا اَثَرُوْا وَاِنْ اسْتَشْهَدُوْا كَانُوْا اَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَمَا يَعْدِلُ ذَالِكَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ.

১. বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাবু ইত্তিবায়িন নিসাইল জানাযাহ্।

২. ফাতহুল বারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৮।

৩. মুসনাদে আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড-৬৮।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তা'আলা পুরুষের ওপর জিহাদ ফরয করেছেন। তারা বিজয়ী হলে গণীমাত লাভ করে এবং শহীদ হলে নিজের রবের কাছে জীবিত অবস্থায় রিযক প্রাপ্ত হয়। আমাদের কোন কাজটি তাদের এ কাজের সমকক্ষ হবে ? নবী স. বললেন ঃ

اِطَاعَةُ اَزْوَاجِهِنَّ وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوْقِهِنَّ.

"স্বামীর আনুগত্য ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা।"[১]

কিন্তু আল্লাহর পথে জান-মাল ও আরাম-আয়েশ কুরবানী করার অনুপ্রেরণা থেকে কোনো মুসলিম নারীর হৃদয়-মন মুক্ত হতে পারে না। শরীআত এ প্রেরণা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করেছে ঠিকই, কিন্তু সেজন্য চেষ্টা-সাধনা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে। এজন্য নারী তার শান্তি ও আরাম-আয়েশকে পরিত্যাগ করবে। কিন্তু জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন এবং জাতীয় ও সামাজিক সমস্যার গিট খোলার জন্য নয় বরং গোলামী ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার নবায়নের জন্য। তারা ঘরের বাইরে আসবে ঠিকই, কিন্তু পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তা আবাদ করার সংকল্পকে আরো পাকাপোক্ত ও মজবুত করার চিন্তা নিয়ে। হযরত আয়েশা রা. নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, নারীদের ওপর কি জিহাদ ফরয ?

এ প্রশ্নের পেছনে যে আবেগ অনুভূতি কাজ করেছে তার প্রতি লক্ষ রেখে নবী স. জবাব দিলেন ঃ

نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

"হ্যাঁ তাদের ওপরেও জিহাদ ফরয। তবে এমন জিহাদ যাতে যুদ্ধ নেই। আর তা হলো, হজ্জ ও উমরা।"[২]

জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য নবী স.-এর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করা হলে তিনি কোনো সময় জবাব দিয়েছেন ঃ

جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ.

"তোমাদের জিহাদ হলো হজ্জ।"

আবার কখনো আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে যে কষ্ট সহ্য করতে হয় তার মহত্ত্ব ও মর্যাদার অনুভূতি সৃষ্টি করে তাদের জিহাদের স্পৃহাকে পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। তাই কখনো তাঁর কাছে এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হলে তিনি বলেছেন ঃ

---

১. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড, ৩৩৬-পৃষ্ঠা।
২. ইবনে মাযা, আবওয়াবুল মানাসিক, বাবুল হাজ্জ, জিহাদুন নিসা।

www.bjilibrary.com

نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ.

"তোমাদের জন্য হজ্জই সর্বোত্তম জিহাদ।"[১]

নারীর প্রকৃত মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য তাকে অর্থোপার্জনের চেষ্টা-সাধনা থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অন্য কারো তো দূরের কথা তার নিজের আর্থিক দায়দায়িত্বও তার উপর এজন্য অর্পণ করা হয়নি যাতে নিজের বা অন্য কারো উদর পূর্তির জন্য তাকে বাড়ীর আঙিনা ডিঙাতে না হয়।

তবে যদি কোনো মহত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাকে গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েও থাকে কিংবা কোনো ইবাদাত সামষ্টিকভাবে আদায়ের ব্যবস্থাকে তার জন্য উপকারী বা আবশ্যকীয় মনে করা হয়ে থাকে তাহলে সাথে সাথে এমন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রতি মুহূর্তে তার এ অনুভূতিকে জাগ্রত করে যে, যেখান থেকে সে বেরিয়ে এসেছে সেটিই তার প্রকৃত ক্ষেত্র। গৃহ থেকে বের হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সে নারীত্বের সীমারেখাও অতিক্রম করেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নারীদেরকে মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই শর্তে দেয়া হয়েছে যে, তারা পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করবে না এবং পুরুষপনা জাহির করবে না। বরং তাদের কাতার হবে পুরুষের কাতার থেকে ভিন্ন। এ ভিন্নতা এবং দূরত্ব যতো বেশী হবে শরীআতের দৃষ্টিতে তা ততো বেশী প্রিয় ও পসন্দনীয়।

عَنْ اَبِيْ هريرة رض قال قال رسول اللّه ﷺ خير صفوف الرّجال اولّها وشرّها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولّها.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হলো পেছনের কাতার। আর মেয়েদের সর্বোত্তম কাতার হলো সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হলো প্রথম কাতার।"[২]

পুরুষদের সর্বশেষ এবং নারীদের সর্বপ্রথম কাতার এজন্য নিন্দনীয় যে, এখানে নারী ও পুরুষ পরস্পরের অধিক নিকটবর্তী হয়। আবার পুরুষদের প্রথম কাতার এবং নারীদের শেষ কাতারের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ এ অবস্থায় তাদের মধ্যে অধিক দূরত্ব বজায় থাকে। ইসলাম নারীদের ব্যাপারে যে নীতি অবস্থান গ্রহণ করেছে এ কর্মপদ্ধতি তার অবশ্যম্ভাবী ফল। এতে

১. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাবু জিহাদিন নিসা।
২. মুসলিম, কিতাবুস সালাত ও আসহাবুস সুনানিল আরবায়া।

www.bjilibrary.com

একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম নারীকে কখনো তার নিজস্ব ক্ষেত্র ছেড়ে অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি দেয় না। বরং তাকে সমাজের বিভিন্ন কর্ম তৎপরতা থেকে মুক্ত করে শুধু একটি ক্ষেত্রেই তৎপর রাখতে চায় যার দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

সমাজ একটি একক

কিন্তু কোনো সমাজ ব্যক্তিকে যখন সমাজের কোনো বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত করে তখন তার অর্থ এ নয় যে, সে অন্য সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। বরং এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে, সে তার চিন্তা ও কর্মের বেশীরভাগ যোগ্যতাটুকু উক্ত বিভাগে ব্যয় করবে। কারণ মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত পরিবার হোক বা কোনো গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হোক স্বল্প জনসংখ্যা অধ্যুষিত কোনো পৌরসভা হোক কিংবা কোনো বড় নগরীর কর্পোরেশন হোক, কোনো প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা হোক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার বা উচ্চস্তরের ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষ হোক, অথবা এছাড়া অন্য কোনো শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অর্থনৈতিক সংগঠন হোক এসবই বাহ্যিকভাবে আলাদা আলাদা মনে হয়। কিন্তু মূলত এসব একই সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশ। সামাজিক কাঠামো সামগ্রিকভাবে এসবের মুখাপেক্ষী। কারণ; এককভাবে এর কোনোটিই সামাজিক জীবনের সব প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করতে পারে না। বরং সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পরিবার ব্যক্তির চিন্তাগত প্রশিক্ষণের সূচনা করলেও স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় তার উন্নয়নে সাহায্য করে। পৌরসভা তার স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করলেও বিচারালয় তার অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এজন্য কোনো সময় সে জ্ঞান ও বিদ্যার অন্বেষণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধ্য হবে, কোনো সময় বণিক হিসেবে তাকে বাজার ও বন্দরে যেতে হবে, নিজের অধিকার সংরক্ষণের জন্য কখনো তাকে বিচারালয়ে ধর্ণা দিতে হবে এবং অধিকার সন্ধানে কখনো কৃষিক্ষেত্রে বা কারখানার দিকে দৌড়াতে হবে। এক কথায় ব্যক্তির তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সব প্রয়োজনীয় উপকরণ গোটা সমাজের মধ্যে ছড়ানো আছে। তাই সে তার চেষ্টা-সাধনা কোনো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। কোনো কৃষকের পক্ষে গোটা জীবনের বিস্তৃতিকে তার এক চিলতে ভূমির মধ্যে গুটিয়ে সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। কোনো শিক্ষার্থীই এমন কোনো পন্থা বা পদ্ধতির অধিকারী নয় যে, সে গোটা সমাজের সব প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু শিক্ষার জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কোনো বিচারকের বিচার কক্ষ তাকে গোটা দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষী করে দিতে পারে না। তাই সমাজের কর্তব্য হলো, ব্যক্তির বিভিন্নমুখী প্রয়োজন যেসব সামাজিক সম্পর্ক দাবী করে তা থেকে তাকে বিরত না রাখা।

www.bjilibrary.com

সুতরাং ইসলামও নারীকে পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার চিন্তা ও কর্মের জগতকে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়নি। আবার সামাজিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন অধিকারসমূহ থেকেও তাকে বঞ্চিত করেনি। বরং ইসলাম তাকে এতোটা যোগ্য করে গড়ে তোলে যাতে সে সমাজে সফল ও সার্থক জীবন যাপন করতে পারে।

সমাজে ব্যক্তির সফলতা লাভের পূর্বশর্ত

সমাজে সফল ও যথাযথ ভূমিকা পালন করার জন্য কোনো ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন ঃ

প্রথমটি হলো, তাকে সঠিক চিন্তা শক্তির অধিকারী হতে হবে, যাতে সে সহজেই ভাল-মন্দ এবং লাভজনক ও ক্ষতিকর বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। এ ধরনের যোগ্যতা যে শুধু ব্যক্তির ক্রমোন্নয়ন ও বিকাশের জন্য জরুরী তাই নয়, বরং সমাজের গঠন এবং উন্নয়নও এর ওপরে নির্ভরশীল। কারণ, এছাড়া ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সংহতি সৃষ্টি হতে পারে না যা একজনকে অন্যজনের জন্য কল্যাণকর হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। ব্যক্তি যদি সমাজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল না থাকে এবং তার কাছে সমাজের কি কি অধিকার আছে এবং সমাজ তাকে কোন কোন অধিকার দিতে বাধ্য সে সম্পর্কে অনবহিত থাকে আর এ বিষয়ও যদি তার অজানা থাকে যে, সমাজকে গঠন এবং সুবিন্যস্তকারী উপাদানসমূহ কি আর কি কি কারণে তা পতনমুখী হয় তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপেই তার ব্যক্তি স্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে সংঘাতের আশংকা বিদ্যমান থাকে। আর সমাজ যে লক্ষ ও উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলে তার চেষ্টা-সাধনা সে লক্ষে নিয়োজিত হয় না। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ব্যক্তিকে এমন যোগ্য করে গড়ে তোলা যাতে সে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও অবস্থায় যে দায়িত্বই আঞ্জাম দিক না কেন ন্যায় অন্যায় এবং সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। সে শাসক হলে তাকে জানতে হবে শাসিতদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে। আর শাসিত হলে জানতে হবে আনুগত্যের মূলনীতি ও পূর্বশর্ত কি ? যদি সে বিচারক হয় তাহলে তাকে আইন ও ন্যায় বিচারের দাবীসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। আর যদি তাকে ন্যায় বিচার প্রার্থী হতে হয় তাহলে তা অর্জনের পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ হলে চলবে না।

এসব যোগ্যতার সাথে সাথে ব্যক্তির সফলতার দ্বিতীয় শর্ত হলো, তাকে তার সত্যানুভূতি ও সৎচেতনা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ থাকতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও কারিগরি এক কথায় যে ক্ষেত্রেই সে

অগ্রসর হতে চাইবে তাতে যেন কোনো কিছুই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আর এ অধিকারের ওপর কোনো দিক থেকে হস্তক্ষেপ হলে সমাজের এতোটা শক্তি থাকতে হবে যে, তা রোধ করতে ও তার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। অন্যথায় ব্যক্তি নিজের ভালো-মন্দ ও লাভ-ক্ষতি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার পরও ঠিক তেমনি ব্যর্থতার শিকার হতে থাকবে যেমন অজ্ঞতা বশত কেউ ধ্বংসের মুখোমুখী হয়।

তৃতীয় শর্ত হলো, ব্যক্তির কাছে সমাজের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার দাবী করা হলে তাকে সমাজের কল্যাণের জন্য সঠিক পন্থায় কাজ করার অধিকার দিতে হবে। তাকে যখন সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেয়া হয় না তখন তার নিজের কল্যাণের জন্য কাজ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। কারণ, ব্যক্তির ভ্রান্তি যেমন সমাজের ক্ষতির কারণ হয় তেমনি সমাজের বিশৃঙ্খলাও ব্যক্তি ধংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমরা যখন সমাজকে ব্যক্তির কাজ-কর্ম পর্যালোচনার অধিকার প্রদান করি তখন ব্যক্তির ও সমাজের সমালোচনা, পর্যালোচনা ও সংস্কার সংশোধনের অধিকার থাকা উচিত।

এ তিনটি শর্তকে বিশ্বের যে কোনো গণতান্ত্রিক বিধান স্বীকার করে নেয়। কেননা, এর ওপর ভিত্তি করেই ব্যক্তি সমাজে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করার যোগ্যতা অর্জন করে। আমরা এ তিনটি শর্তকে সংক্ষেপে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কাজের সুযোগ এবং সমাজ নির্মাণ ও সংস্কারের স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

আসুন, এবার আমরা দেখি, ইসলামী সমাজব্যবস্থা নারীর ক্ষেত্রে এ তিনটি শর্ত পূরণ করে কি না? আর করলেও যতোটা পূরণ করে, ভবিষ্যতে তার ফলাফল কি দাঁড়াতে পারে এবং অতীতে কি দাঁড়িয়েছিল?

❑

www.bjilibrary.com

নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

এটা বাস্তব যে, ইসলামের পূর্বে আরবরা অনিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন জীবন-যাপন করতো। জীবন সম্পর্কে তাদের কোনো সুশৃঙ্খল ও সঠিক ধারণা ছিল না। তারা এ নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনাও করতে চাইতো না। তাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ছিল এ বস্তুজগত ও এর আরাম-আয়েশকে কেন্দ্র করে। এ পৃথিবীর বাইরে আর কোনো বাস্তব জগত আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারতো না। ইসলাম তাদের সামনে জীবনের এমন একটি দর্শন পেশ করলো যাতে ছিল নৈতিক বিধি-বন্ধন, বৈধ-অবৈধ এবং হালাল-হারামের বিধান। এ দর্শনে শাস্তি ও পুরস্কার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা যেমন ছিল তেমনি ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের স্বীকৃতি এবং তাঁদের আনুগত্যের শিক্ষা। তারা ধীরে ধীরে এ দর্শনকে গ্রহণ করতে থাকলে তার ভিত্তিতে ইসলাম তাদের জন্য একটি সমাজ গঠনের কাজ শুরু করলো। সমাজ গঠনের এ কাজ চলাকালীন সময়েই মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো, বাইরের কোনো মেয়ে যদি এ সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য হতে চায় তবে তার নিকট থেকে নিম্ন বর্ণিত নৈতিক নীতিমালা ও আইনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا
وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ
اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ - الممتحنة : ١٢

"হে নবী ! ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে যখন এ মর্মে বাইয়াতের জন্য আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোনো অপবাদ গড়ে নেবে না এবং কোনো ভালো কাজে তোমার অবাধ্য হবে না তাহলে তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"–সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২

এ আয়াতে নারীদের থেকে দীন ইসলামের যে নীতিমালা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে পুরুষকে তা থেকে বাদ দেয়া হয়নি। কারণ,

www.bjilibrary.com

পারিবারিক জীবনের সাথে তাদের যতোটা সম্পর্ক তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক পরিবারের বাইরের জীবনের সাথে। এ থেকে জানা যায়, দীন ইসলামের মূলনীতি ও গোটা বিধানকে মর্যাদা দানের দাবী শুধু পুরুষের কাছে করা হয়নি বরং নারীর কাছেও একই দাবী করা হয়েছে। আর এ দাবী পূরণের জন্য দীনের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হওয়া দরকার, যাতে নারীরাও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও সমস্যার ক্ষেত্রে কুরআনের হেদায়াত কি এবং কুরআন কিভাবে তার সমাধান করে তা অবহিত হতে পারে। সুতরাং উক্ত আয়াতে তাদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে তার মধ্যে এ কথাও আছে যে, তারা কোনো সৎকাজে রাসূলের অবাধ্য হবে না। বাহ্যত এটি একটি ক্ষুদ্র বাক্যাংশ। কিন্তু এদ্বারা সমাজে তাকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে বলা হয়েছে। এভাবে প্রতি পদক্ষেপে তাকে রাসূলের অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা সে জন্য রাতদিন সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতো। ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের পথে যেসব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতো তা তাদেরকে নিরাশ বা ভগ্নোৎসাহ করতে পারতো না। বরং এরূপ প্রতিটি জটিলতা তাদের আকাঙ্ক্ষার ঘোড়ার জন্য চাবুকের কাজ দিতো।

আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে হযরত আয়েশা রা. বলেন ঃ

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الاَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّيْنِ.

"আনসারী মহিলারা কতই না ভালো ! দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিপক্কতা লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।"[১]

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কতো গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন। হযরত আয়েশা রা.-এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি থেকেই তা বুঝা যায় ঃ

كَانَتْ تنزل علينا الاية فى عهد رسول الله ﷺ فنحفظ حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها ولا نحفظها.

১. মুসলিম, কিতাবুল হায়েয

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হতো।[১] আমরা যদিও তার শব্দগুলো হুবহু ধরে রাখতাম না কিন্তু তার হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিতে গেঁথে নিতাম।"

জুমআ ও দুই ঈদের জামায়াতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

জুমআ ও দুই ঈদের খুতবার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা। শরীআত নারীর জন্য এসব জামায়াতে অংশগ্রহণ আবশ্যক করে দেয়নি। কারণ, তাতে অনেক সময় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের সম্ভাবনা বেশী থাকে। অধিকন্তু এভাবে পারিবারিক জীবনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার আশংকাও বিদ্যমান। কিন্তু শরীআত সাধারণভাবে নারীকে এসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে।

উম্মে আতিয়া রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويعتزل الحيض المصلى ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت فقلت لها الحيض قالت نعم اليس الحائض تشهد العرفات ـ وتشهد كذا وتشهد كذا ـ

"প্রাপ্তবয়স্কা, পর্দানশীন এবং ঋতুবতী মেয়েদের ইদগাহে হাজির হওয়া উচিত। তবে যেসব মেয়েদের ঋতু এখনো চলছে তাদের নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকা উচিত। তারা মু'মিনদের সাথে ভালো কাজে এবং দোয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। (হাদীস বর্ণনাকারিণী বর্ণনা করেছেন ঃ) আমি উম্মে আতিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ঋতুবতী মেয়েরাও কি শরীক হবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তারা কি আরাফাতে এবং অমুক অমুক জায়গায় হাজির হয় না ?"[২]

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইবাদাত ও জ্ঞান চর্চার এসব মজলিসে নারীরা ব্যাপকভাবে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করতো। খাওলা বিনতে কায়েস আল-জাহনিয়া রা. নবী স.-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

১. আল-ইকদুল ফারীদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৬।
২. বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব ঃ ইযা লাম ইয়াকুন লিলমারআতে জালবাব।

www.bjilibrary.com

كنت اسمع خطبة رسول الله ﷺ يوم الجمعة وانا فى مؤخّر النساء.

"জুমআর দিনে আমি নবী স.-এর খুতবা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।"[১]

এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বা উপস্থিতি কোনো মেলা বা চিত্তবিনোদন মূলক অনুষ্ঠানে উপস্থিতির মতো ছিলো না বরং তারা এসব সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতেন।

হারেসা ইবনে নুমানের এক কন্যা বর্ণনা করেন ঃ

مَا حَفِظْتُ ق اِلاَّ مَنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمْعَةٍ .

"আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা ক্বাফ মুখস্ত করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুমআর খুতবায় এটি পড়তেন।"[২]

মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী স. নিজেও এতোটা লক্ষ রাখতেন যে, কোনো সময় যদি উপলব্ধি করতেন, তাঁর বক্তব্য মেয়েরা ঠিকমত শুনতে পায়নি তাহলে পুনরায় তাদের কাছে গিয়ে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এক ঈদের সময়ের উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন ঃ

فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.

"তাঁর মনে হলো, তিনি তার বাণী মেয়েদের কাছে পৌছাতে পারেননি। তাই পুনরায় তাদের নসীহত করলেন এবং সাদকা ও ভালো কাজের আদেশ দিলেন।"[৩]

এ প্রসঙ্গে ইবনে জুরাইজ র. তাবেয়ী আতা র.-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

اترى حقًّا على الامام ذالك ويذكّرهنّ.

"আপনাদের মতে কি নারীদের নসিহত করা ও উপদেশ দেয়া ইমামের জন্য জরুরী ?"

জবাবে তিনি বললেন ঃ

اِنَّه لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَالَهُمْ لاَيَفْعَلُوْنَه.

---

১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৭।
২. মুসলিম, কিতাবুল জুমআ, আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব ঃ আর রাজুলু ইয়াকতুবু আলা কাউসিন।
৩. বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম, বাব ঃ ইযাতুল ইমামিন নিসায়া ওয়া তা'লী মিহিন্না।

www.bjilibrary.com

"এটা নিসন্দেহে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।"[১]

এটি কড়াকড়িভাবে মেনে না চলার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

জ্ঞানান্বেষণের জন্য ইসলাম নারী মানসে যে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছিলো তা উক্ত গুটিকয়েক সাধারণ মাধ্যম দ্বারা পূরণ হচ্ছিলো না, তাই তাদেরকে মাঝে মধ্যে বাড়তি সুযোগ দিয়ে এ জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করতেন। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا يَاقِيهِنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ.

"মেয়েরা নবী স.-কে বললো ঃ আপনার কাছে সবসময় পুরুষদের ভিড় লেগে থাকে। (তাই আমরা আপনার মূল্যবান উপদেশ থেকে বঞ্চিত থেকে যাই।) আপনি আমাদের জন্য আলাদা একটা দিন ধার্য করে দিন। সুতরাং নবী স. একটি দিন নির্দিষ্ট করে তাদের কাছে গেলেন, তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে বুঝিয়ে বললেন এবং সৎকাজের আদেশ দিলেন।"[২]

হযরত হুযাইফার বোনও একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ

قالت خطبنا رسول اللّه ﷺ فقال يامعشر النساء اما لكن فى الفضة ما تحلّين اما انه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره لاعذبت به.

"তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ স. আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বললেন, হে মেয়েরা! রৌপ্যের গহনা পত্রে তোমাদের আকর্ষণ নেই কেন ? তোমরা রৌপ্যের গহনা ব্যবহার করো না কেন ?[৩] শুনে রাখো, তোমাদের মধ্য থেকে যে মেয়েই স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধান করে তা প্রদর্শন করে বেড়াবে সেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।"

কোনো কোনো সময় নবী স. এ ধরনের শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন।

عَن ام عطية رض انَّ رسول اللّه ﷺ لمَّا قدم المدينة جمع نساء الانصار فى بيتٍ فارسل الينا عمر بن الخطاب رض فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثمَّ قال انا رسول رَسُولِ اللّه ﷺ اليكنَّ

১. বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব ঃ মাওইযাতুল ইমামিন নিসায়া ইয়াওমাল ঈদ।
২. বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম, বাব ঃ হাল ইউজয়ালু লিন্নিসায়ি ইয়াওমূন আলা হিদাতান।
৩. মুসনাদে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৭।

www.bjilibrary.com

وامرنا بالعيدين ان نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز.

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. মদীনায় আসলে আনসারী মহিলাদের একটি ঘরে একত্রিত করে নসীহত করার জন্য উমর ইবনে খাত্তাবকে পাঠালেন। তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরা সালামের জবাব দিলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। এভাবে হযরত উমর রা.-এর মাধ্যমে জানা গেল যে, দুই ঈদের দিনে যেন আমরা যুবতী এমনকি ঋতুবতী মেয়েদেরকেও সাথে নিয়ে ঈদগায় যাই। আমাদের জন্য জুমআর নামায ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করেছেন।"

মা, বাপ ও স্বামীর প্রতি আদেশ

নারীর শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থল হলো তার নিজের গৃহ। তাই পিতামাতা ও স্বামী যাতে নারীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শিখায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করে সে দিকে ইসলাম তাদের দৃষ্টি দিতে বলেছে। কুরআন বলছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ۔ التحريم : ٦

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাও।"–সূরা আত তাহরীম ঃ ৬

জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য শিক্ষা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এখানে এ বিষয়টিও মনে রাখা দরকার যে, 'আহল' শব্দের মূল অর্থ স্ত্রী।

মালেক ইবনে হুয়াইরিস বলেন ঃ আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী স.-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যে সময় তিনি উপলব্ধি করলেন আমরা বাড়ী ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি তখন তিনি বললেন ঃ

اِرْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا وَعَلِّمُوْاهُمْ وَمُرُوْهُمْ .

"নিজের স্ত্রী পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং সেখানেই অবস্থান করো। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলতে নির্দেশ দাও।"[১]

১. বুখারী. কিতাবুল আযান, বাবুল আযান ফিল মুসাফিরীন।

www.bjilibrary.com

হযরত উমর রা. কুফাবাসীদের উদ্দেশ করে লিখেছেন ঃ

عَلِّمُوْا نِسَاءَكُمْ سُوْرَةَ النُّوْرِ.

"তোমাদের স্ত্রীদের সূরা নূর শিক্ষা দাও।"

অনগ্রসর ও অধপতিত নারী সমাজকে অগ্রসর করার জন্য নবী স. তাদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন এ ব্যাপারে অশেষ পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَاَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَاَحْسَنَ اَلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করলো, তাদেরকে শিষ্টাচার ও সদাচরণ শিক্ষা দিলো, বিয়ে দিলো এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করলো, সে জান্নাত লাভ করবে।"[১]

এ বিষয়টি পিতামাতার সাথে সম্পৃক্ত। স্বামীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

ثَلاَثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَ فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا.

"তিন শ্রেণীর মানুষ দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। তার মধ্যে একজন হলো, যে ব্যক্তির অধীনে কোনো ক্রীতদাসী আছে। সে তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা-দীক্ষা দেয় এবং পরে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে বিয়ে করে।"[২]

এ হাদীসের আলোকে যে ব্যক্তি তার স্বাধীন স্ত্রীর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে সেও একটি সওয়াবের অধিকারী হবে। কারণ, সে হাদীসে উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের একটি পূরণ করেছে।

কোনো এক সময় নবী স. এক মহিলাকে একজন দরিদ্র ও অভাবী লোকের সাথে বিয়ে দিলেন। লোকটি কুরআনের কয়েকটি সূরা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ মোহরানার পরিবর্তে তুমি তোমার স্ত্রীকে এই সূরা কয়টি শিখিয়ে দেবে।[৩]

এভাবে নবী স. কোনো নারীকে অর্থ-সম্পদের পরিবর্তে জ্ঞান ও বিদ্যা সম্পদ অর্জনের অধিকার দান করলেন, কোনো কোনো সময় তিনি কুরআনের বিশেষ

১. আবু দাউদ. কিতাবুল আদাব, বাব ঃ ফাদলু মান 'আল ইয়াতামা।
২. বুখারী, কিতাবুল ইল্ম বাব ঃ তা'লীমুর রাজুলি আমাতাহু ওয়া আহলাহু।
৩. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ বাব ঃ তাজবীজুল মু'সির, মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ।

www.bjilibrary.com

বিশেষ কিছু অংশের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা তাদের স্ত্রীদের শিক্ষা দেয়ার আদেশ দিতেন। উদাহরণ হিসেবে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায়। এ দু'টি আয়াতে ঈমান ও দীনের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ خَتَمَ سُوْرَةُ الْبَقَرَةَ بِاٰيَتَيْنِ اُعْطِيْهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلِّمُوْهُنَّ وَعَلِّمُوْهُنَّ نِسَاءَكُمْ ـ

"আল্লাহ তা'আলা যে দু'টি আয়াত দিয়ে সূরা বাকারা শেষ করেছেন, তা আরশের নীচে অবস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা নিজেরাও তা শিক্ষা করো এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকেও শিক্ষা দাও।"[১]

নবী স. নিজেও এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন যাতে তাঁর অধীন স্ত্রীলোকেরা দীনের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকে। নবী স.-এর এক কন্যা বর্ণনা করেন ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُوْلُ قَوْلِىْ حِيْنَ تُصْبِحِيْنَ سُبْحَانَ اللّٰهَ وَبِحَمْدِهِ لَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْلَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

"নবী স. নিজে তাকে শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ সকাল হলে তুমি বলবে ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ মা শাআল্লাহু কানা ওয়া মা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন" অর্থাৎ পবিত্রতা ও প্রশংসা মহান আল্লাহর। একমাত্র তাঁর নিকট থেকে শক্তি লাভ করা যেতে পারে। আল্লাহ যা করতে চান তাই হয়ে যায়। আর যা চান না তা হয় না। জেনে রাখো, আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিব্যপ্ত করে আছে।"[২]

লিখন শেখানো

নারীর ইসলামের নীতিমালা ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া, শুধু এতোটুকু বিষয়কে নবী স. যথেষ্ট মনে করেননি বরং তিনি তাদের জন্য পুঁথিগত শিক্ষাও আবশ্যিক মনে করেছেন, যাতে শুধু শ্রবনেন্দ্রীয়ই তাদের

১. দারেমী, কিতাবু ফাদায়েলিল কুরআন, বাব ঃ ফাদলু আউয়ালি সূরাতুল বাকারা ওয়া আয়াতুল কুরসী।

২. আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ঃ মা ইয়াকূলু ইয়াআসবাহা।

www.bjilibrary.com

জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম না হয়ে চক্ষুও আরেকটি মাধ্যম হতে পারে এবং স্মৃতিশক্তির সাথে সাথে গ্রন্থের পৃষ্ঠাও তাদের ধ্যান-ধারণার সংরক্ষক হতে পারে। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি হযরত হাফসা রা.-এর কাছে বসেছিলেন। এ সময় নবী স. বললেন ঃ

اَلاَ تُعَلِّمِيْنَ هٰذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ

"তুমি একে যেমন লিখতে শিখিয়েছো তেমনি কি ক্ষুর ফাটা রোগের দোয়াও শিখাবে না ?"[১]

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি ইতিপূর্বে লিখতে শিখেছিলেন।

নারী শিক্ষার আইনগত মর্যাদা

এসব বাণী ও উক্তি শুধু উৎসাহব্যঞ্জক ও নৈতিকতামূলক নয় বরং এর পেছনে নিয়ম-বিধি ও আইনের সমর্থনও আছে। অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা ইবনুল হাজ্জ লিখেছেন ঃ

فلو طلبت المرأة حقها فى امر دينها من زوجها ورفعته الى الحاكم وطالبته بالتعليم لامر دينها لان ذالك لها اما بنفسه او بواسطة اذنه لها فى الخروج الى ذالك لوجب على الحاكم جبره على ذالك كما يجبره على حقوقها الدنيوية اذ ان حقوق الدين اكدواولى.

"নারী যদি স্বামীর কাছে তার দীনি অধিকার ও দীনি শিক্ষার অধিকার দাবী করে তাহলে স্বামী নিজে সরাসরি তার সে দাবী পূরণ করবে অথবা এ উদ্দেশ্যে তাকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করবে। আর এ অধিকার লাভ করার দাবী বিচারকের কাছে পেশ করলে পার্থিব অধিকার পূরণের ব্যাপারে বিচারক যেমন স্বামীকে বাধ্য করবে এ অধিকার পূরণের জন্যও ঠিক তেমনি বাধ্য করবে। কারণ, দীনি অধিকারসমূহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার যোগ্য।"[২]

হিজরী ২৯৫ সনে ওফাত প্রাপ্ত হানাফী ইমাম ফকরুদ্দীন হাসান ইবনে মনসূর তার বিখ্যাত ফতওয়া গ্রন্থে এ ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা নারীর জন্য কখনো ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং কখনো সুন্নাত ও মুস্তাহাবের পর্যায়ে থাকে আর এ ক্ষেত্রে সে স্বামীর নির্দেশ কতোটা কোন্ সীমা পর্যন্ত মেনে চলবে এবং কোন্

১. আবু দাউদ, কিতাবুত তিব, বাব ঃ ফির রাকা, মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭২।
২. আল মাদখালু লি ইবনিল হাজ্জ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৭।

www.bjilibrary.com

অবস্থায় স্বামীর বিরোধিতা করার অধিকার তার আছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

واذا ارادت المرأة ان تخرج الى مجلس العلم بغير اذن الزوج لم يكن لها ذالك فان وقعت لها نازلة فسالت زوجها وهو عالم فاخبرها بذالك ليس لها ان تخرج بغير اذنه وان كان الزوج جاهلا وسأل عالما عن ذالك فكذالك وان امتنع الزوج عن السوال كان لها ان تخرج بغير اذنه لان طلب العلم فيما يحتاج اليه فرض على كل مسلم ومسلمة فيقدم على حق الزوج وان لم يقع لها نازلة وارادت ان تخرج الى مجلس العلم لتعلم مسائل لصلوة والوضوْع فان كان الزوج يحفظ تلك المسائل ويذكر لها ذالك ليس لها ان تخرج بغير اذنه فان كان الزوج لايحفظا المسائل فالاولى له ان يأذن لها بالخروج فان لم يأذن فلا شَيْءٍ عليه.

"স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো জ্ঞানচর্চার মজলিসে অংশগ্রহণ করতে চায় তাহলে সে অধিকার তার নেই। তবে সে যদি কোনো সমস্যার মুখোমুখী হয় তাহলে স্বামীকে জিজ্ঞেস করবে। স্বামী যদি আলেম বা জ্ঞানী হন তাহলে নিজেই তাকে সে বিষয়ে করণীয় বলে দেবেন। আর যদি অশিক্ষিত বা অজ্ঞ হন এবং অন্যের কাছে জেনে স্ত্রীকে অবহিত করেন তাহলেও স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া বের হওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু স্বামী যদি অন্যের কাছে জেনে স্ত্রীকে অবহিত না করেন তাহলে স্ত্রী অনুমতি ছাড়াই কোনো জ্ঞানচর্চার মজলিসে গিয়ে বিষয়টি জেনে নিতে পারেন। কারণ, প্রয়োজনে জ্ঞান অর্জন মুসলিম নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপরে ফরয হয়ে যায়। তাই এমতাবস্থায় জ্ঞানার্জনের অধিকারকে স্বামীর অধিকারের ওপরে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। নারীর যদি কোনো নির্দিষ্ট মাসয়ালা জানার প্রয়োজন না হয় বরং সে নামায, অযু ইত্যাদি বিষয়ে মাসয়ালা শেখার জন্য কোনো জ্ঞানচর্চার মজলিসে শরীক হতে চায় আর স্বামী যদি ঐ সব মাসয়ালা সম্পর্কে জানেন এবং স্ত্রীকে তা শিক্ষা দিতে থাকেন তাহলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাড়ীর বাইরে যাওয়া উচিত হবে না। স্বামী নিজে যদি ঐসব মাসয়ালার সমাধান না জানেন তাহলে তার কর্তব্য হবে স্ত্রীকে কোনো মজলিসে শরীক হওয়ার অনুমতি প্রদান করা। তবে কোনো বিশেষ প্রতিবন্ধকতা থাকলে স্বামীর এ অধিকারও আছে যে, তিনি তাকে বাইরে যেতে অনুমতি দেবেন না। এতে কোনো দোষ হবে না।"

www.bjilibrary.com

শিক্ষার সুযোগ সুবিধা

ইসলামী শিক্ষার গভীর অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, নারীর চিন্তার বিকাশ ও বিবর্তনে পরিবেশ যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্য শরীআত নারীকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজে উপকৃত হতে ও অন্যের কল্যাণ সাধন করতে সবরকম সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

ইতিপূর্বে এ মর্মে একটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার দাসীকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয় এবং তারপর দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তবে সে দ্বিগুণ পুরস্কারের অধিকারী হবে। এ হাদীসটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখুন। দাসীকে শুধু শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার জন্য নবী স. এ সুসংবাদ দেননি বরং সে তার পা থেকে দাসত্বের শৃংখল ছিন্ন করা আবশ্যিক বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, এটি তার মুক্ত ও স্বাধীন জীবন যাপনের পথে প্রতিবন্ধক।

চিন্তাগত প্রশিক্ষণ

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রমবিকাশে পরিবেশগত আনুকূল্য এবং শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার চেয়ে তার নিজের প্রচেষ্টার দখল থাকে অনেক বেশী। সে তার চিন্তা শক্তিকে কতোটা কাজে লাগায়, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা নতুন কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কোন্ কোন্ সত্যকে জানতে চেষ্টা করে তার ওপরও তার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। শরীআত একদিকে নারীর চিন্তাগত মান বৃদ্ধির জন্য বাইরের সবরকমের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তার অন্তর্গত যোগ্যতাকেও উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছে, যাতে নারী তার ভেতরে প্রকৃতি প্রদত্ত সুপ্ত চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে শেখে।

নবী স.-এর স্ত্রীদের সামাজিক ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দেয়ার পর কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط - الاحزاب : ٣٤

"তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত ও হিকমতের কথা শেখানো হয় তা স্মরণ রাখো।"–সূরা আল আহ্যাব ঃ ৩৪

অর্থাৎ একটু চিন্তা করে দেখো, তোমাদের ঘরে রাত-দিন যেসব জ্ঞান ও হিকমতের চর্চা হয় তার দাবী কি এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আখেরাতের জবাবদিহির বিশ্বাস কি ধরনের জীবন দাবী করে ? বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত ঘটনাতে এ ধরনের প্রচেষ্টার বহু নযীর দেখতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা এ ধরনের দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

৬—

www.bjilibrary.com

এক মহিলা নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো ঃ আমার মা হজ্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সে অবকাশ দেয়নি। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি ? নবী স. বললেন ঃ

حجى عنها أرأيت لو كان على امك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء.

"হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো। তোমার মা যদি কারো কাছে ঋণী থাকতো তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না ? অতএব আল্লাহর যেসব নির্দেশ পালন করা হয়নি তা পালন করো। কারণ, আল্লাহ্ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে তার বান্দার চেয়ে বেশী হকদার।"[১]

হযরত আনাস রা.-এর মা উম্মে সালামা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মেয়েরা যদি স্বপ্নে যৌনতৃপ্তি লাভ করে তাহলে কি তাদের ওপর গোসল ওয়াজিব হবে ? নবী স. বললেন ঃ হ্যাঁ, যদি তার বীর্যপাত হয়। একথা শুনে উম্মে সালামা বললেন ঃ মেয়েদেরও কি বীর্যপাত ঘটে ? (এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো এ জন্য যে, নারীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা খুব কম ঘটে থাকে)। তিনি বললেন ঃ

نَعَمْ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

"হ্যাঁ, তা না হলে সন্তান তার (মায়ের) মতো হয় কিভাবে ?"

ভেবে দেখুন ! এ একটি কথার দ্বারা নবী স. উম্মে সালামার ধ্যান-ধারণা কতগুলো বিষয়ের প্রতি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।[২]

সাহাবাদের যুগ

নবী স.-এর পরবর্তী সাহাবাগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। ইসলামী শরীআত তাদের স্কন্ধে যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলো এখানে তা সবিস্তারে বর্ণনা করার সুযোগ নেই। অবশ্য নিম্ন বর্ণিত ঘটনা থেকে তার একটি আভাস পাওয়া যাবে।

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, যেসব মহিলা কৃত্রিম চুল পরে, উল্কি আঁকে এবং ঘসে ঘসে দাঁতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তাদের ওপরে আল্লাহর লা'নত। একথা শুনে এক মহিলা বলে উঠলো ঃ আপনার স্ত্রীও তো

---

১. বুখারী, আবওয়াবুল উমরা, বাবুল হাজ্জ ওয়ান নাযর আনিল মাইয়েত।
২. বুখারী, কিতাবুল ইল্ম, বাবুল হায়াউ ফিল ইল্ম। মুসলিম, কিতাবুল হায়েজ, বাবু ওজুবুল গোসলে আলাল মারায়া বি-খুরুজিল মানী মিনহা।

www.bjilibrary.com

এসব করে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ যাও আগে দেখে আস। তারপর অভিযোগ আকারে উত্থাপন করো। সুতরাং মহিলাটি তাঁর বাড়ীতে গেল। তার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন ঃ আমার স্ত্রী যদি শরীআত বিরোধী এসব কাজে লিপ্ত হতো তাহলে সে আমার কাছে থাকতে পারতো না।[১]

একইভাবে সাহাবায়ে কিরাম রা. সাধারণত সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা-সাধনা করতেন তাতে পুরুষের সাথে নারীও অন্তর্ভুক্ত থাকতো।

আয়েযা নাম্নী এক মহিলা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

رأيت ابن مسعود يوصى الرجال والنساء ويقول من ادرك منكم من امرأة او رجل فالسمت الاول.

"আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে এই বলে নসীহত করতে দেখেছি যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তোমাদের মধ্য থেকে যেই ফিতনার যুগের মুখোমুখি হবে সে যেন নবী স.-এর সাহাবাদের কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।"[২]

ফলাফল

এ ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও মনোযোগ দানের ফল হলো এই যে, কাল পর্যন্ত যে নারী জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল আজ সে তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ালো। চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে যার কোনো অস্তিত্ব অনুভূত হতো না, সে জ্ঞান ও হেদায়াতের সূর্য রূপে দীপ্তি ছড়াতে থাকলো।

হযরত আয়েশাকে দেখুন, তাঁর প্রিয় ছাত্র উরওয়া ইবনে যুবাইর তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারিণী হওয়ার কথা এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

ما رأيت احدا من الناس اعلم بالقران ولا فريضته ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا انسب من عائشة ـ

"আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রা.-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখিনি।"[৩]

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাহ, বাব ঃ তাহরীমু ফি'লিল ওয়াসেলাহ।
২. মুকাদ্দামাতু সুনানিদ দারেমী, বাব ঃ ফী কারাহিয়াতি আখযির রায়।
৩. তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭।

www.bjilibrary.com

আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইবনে যুবায়েরের বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তার প্রশংসা করা হলে তিনি বলেন ঃ কাব্য বিষয়ে আয়েশা রা.-এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি কথায় কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।

মূসা ইবনে তালহা বলেন ঃ

ما رأيت احدا افصح من عائشة.

"আমি হযরত আয়েশা রা.-এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি।"[১]

লোকেরা হযরত আয়েশা রা.-এর কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানের তুলনায় চিকিৎসা বিষয়ক অধিক জ্ঞান দেখে বিস্মিত হতো।

ইবনে আবী মুলায়কা হযরত আয়েশা রা.-কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব দেখে চমৎকৃত হইনা কারণ, আপনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর কন্যা। আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা -এর বাগ্মীতা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যা কিভাবে শিখেছেন ?

তিনি বললেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধি দল তাঁর চিকিৎসা করতো। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।[২]

অংক শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবাগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসয়ালা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[৩]

আমরা বিনতে আবদুর রহমানও হযরত আয়েশা রা.-এর একজন ছাত্রী। ইবনে ইমাদ হাম্বলী নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

الفقيهة الفاضلة عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية نشأت فى حجر عائشة فاكثرت الرواية عنها وهى العدل الضابطة لما يوخذ عنها.

"আমরা বিনতে আবদুর রহমান আনসারী ছিলেন বিজ্ঞ ফিকাহবিদ। তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর কোলে লালিতপালিত হয়ে বেড়ে উঠেন এবং তাঁর নিকট থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১. আল ইসাবা ফী তামীযিস্ সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩৬০।
২. মুসতাদরিক, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১।
৩. ঐ

www.bjilibrary.com

তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মজবুত স্মৃতিশক্তি ও ধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সর্বদা গৃহিত হতো।"[১]

ইবনে হাব্বান তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ

كانت من اعلم الناس بحديث عائشة.

"তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।"[২]

তাবেয়ীদের যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইমাম যুহরীকে বললেন ঃ আমি তোমার মধ্যে জ্ঞান পিপাসা লক্ষ করছি। আমি কি তোমাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দেখিয়ে দেবো না ?

যুহরী বললেন ঃ হাঁ, অবশ্যই।

তিনি বললেন ঃ আমরা বিনতে আবদুর রহমানের মজলিস ছেড়ে থেকো না। কারণ, তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর লালিত পালিত (তাই তার জ্ঞানের বড় উত্তরাধিকারিণী)।[৩]

ইমাম যুহরী বলেন ঃ তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি আমরা বিনতে আবদুর রহমানের খেদমতে হাজির হলে জানতে পারলাম, প্রকৃতই তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

হাফেজ ইবনে হাজার উম্মে সালামা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

كانت ام سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرائ الصائب -

"উম্মে সালামা পরমা সুন্দরী হওয়ার সাথে সাথে পরিপক্ক জ্ঞান-বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।"[৪]

হযরত উম্মে সালামা রা.-এর কন্যা হযরত যায়নব র. সম্পর্কে হযরত ইবনে আবদুল বার র. বলেন ঃ

كانت من افقه اهل زمانها -

"তিনি তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফহীহদের অন্যতম ছিলেন।"[৫]

আবু রাফে' সায়েগ বলেন ঃ

كنت اذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت ابى سلمه -

১. শাজারাতুয যাহাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৪।
২. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৯।
৩. তাযকিরাতুল হুফফাজ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৬।
৪. আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫৯।
৫. আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু যায়নাব বিনতে আবী সালামা।

www.bjilibrary.com

যখনই আমি ফিকাহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদীনার কোনো মহিলার কথা স্মরণ করি তখনই যায়নব বিনতে আবু সালামার কথা মনে পড়ে যায়।[১]

উম্মুল হাসান নামে উম্মে সালামার একজন দাসী ছিলেন। তিনি এতোটা যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত তাবলীগ ও ওয়াজ নসীহত করতেন।[২]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া সম্পর্কে ইমাম নববী-এর উক্তি হলো :

كانت عاقلة من عقلاء النساء.

"তিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারিণী ছিলেন।"[৩]

হযরত আবু দারদার স্ত্রী উম্মে দারদার জ্ঞান ও মর্যাদা এতো উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী র. তাঁর আমল বা বাস্তব জীবনের কাজকে সহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন :

كانت ام الدرداء تجلس فى صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة.

"উম্মে দারদা ছিলেন একজন ফকীহ মহিলা। তিনি নামাযে পুরুষের মতো করে বসতেন (তাই তাঁর এ কাজ দলীল হিসেবে গণ্য)।"[৪]

আল্লামা ইবনে আবদুল বার তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

كانت من فضلاء النساء وعقلائهن وذوات الرأى منهن مع العبادة والنسك.

"তিনি বিবেক-বুদ্ধি ও মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও দক্ষতার অধিকারিণী মহিলাদের মধ্যে গণ্য হতেন। এর সাথে তিনি ছিলেন ইবাদাত গোজার এবং মুত্তাকী।"[৫]

ইমাম নববী তো তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে সবাই একমত বলে উল্লেখ করেছেন :

واتفقوا على وصفها بالفقة والعقل والفهم والجلالة.

"তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সবাই একমত।"[৬]

---

১. আল ইসাবা ফী তামীযিস, সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৭।
২. তবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫০।
৩. তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৯।
৪. বুখারী, কিতাবুল আযান, অনুচ্ছেদ : সুন্নাতুল জুলুস ফীত্ তাশাহহুদ।
৫. আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু উম্মে দারদা।
৬. তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬০।

www.bjilibrary.com

ফাতেমা বিনতে কায়েসের জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় এ থেকে যে, একটি ফিক্‌হী মাসয়ালার ব্যাপারে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত উমর ও হযরত আয়েশার সাথে বিতর্ক চালিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তার মতের পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। এর চেয়েও বড় ব্যাপার হলো, মুসলিম উম্মার অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

كانت من المهاجرات الاول ذات عقل وافر وكمال.

"তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারীদের একজন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী।"[১]

হযরত আনাস রা.-এর মা উম্মে সুলাইম ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবী। হাফেজ ইবনে হাজার নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর মর্যাদার উল্লেখ করেছেন ঃ

ومناقبها كثيرة شهيرة.

"তাঁর মর্যাদা ও গুণাবলী অনেক এবং সর্বজন বিদিত।"[২]

ইমাম নববী বলেন ঃ

كانت من فاضلات الصحابيات.

"তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারিণী মহিলা সাহাবী।"[৩]

উম্মে আতিয়া সম্পর্কেও ইমাম নববী র. একই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وهي من فاضلات الصحابيات والغازيات منهن مع رسول الله ﷺ.

"তিনি জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারিণী সাহাবা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদেও শরীক হয়েছেন।"[৪]

যেসব রাবী উম্মে আতিয়া রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাফসা বিনতে সিরীন তাদের অন্যতম। তিনি বার বছর বয়সেই কুরআন মজীদ শিক্ষা শেষ করেছিলেন।[৫] তিনি ছিলেন বসরার বাসিন্দা। বসরার অধিবাসী বিখ্যাত কাজী ও ফকীহ্ ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া বলেন ঃ

---

১. তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৩।
২. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭২।
৩. তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৩।
৪. তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪।
৫. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১০।

www.bjilibrary.com

ما ادركت احدا افضله على حفصة.

"আমি এমন কোনো লোক দেখিনি যাকে হাফসা বিনতে সিরীনের চেয়ে অধিক মর্যাদা দিতে পারি।"[১]

তাবেয়ীদের ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর এক ছাত্রের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরদিনই সে শিক্ষার মজলিসে অংশ গ্রহণ করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকলে তাঁর কন্যা বললো ঃ

اجلس اعلمك علم سعيد.

"আপনি এখানেই থেকে যান। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব আপনাকে যা শেখাতে সক্ষম তা এখানে আমিই আপনাকে শিখিয়ে দেব।"[২]

অনুরূপ ইমাম মালেক র.-এর কন্যার জ্ঞান ও মর্যাদার অবস্থা ছিল এই যে, ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যয়নকালে কোথাও ভুল করে ফেললে তিনি ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম মালেক র.-এর এতোটা আস্থা ছিল যে, করাঘাত শুনে তিনি ছাত্রদের বলতেন ঃ

ارجع فالغلط معك.

"আবার পড়ো। তোমরা কোথাও ভুল করছো।"[৩]

কোনো যুগের জ্ঞান ও চিন্তাগত উন্নতির সঠিক পরিমাপ মুষ্টিমেয় নাম করা ব্যক্তিত্ব দ্বারা করা যায় না। এজন্য অখ্যাত তথা সাধারণ মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানের স্তর অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এরপরই কেবল আমরা সে সময়ের সাধারণ জ্ঞানগত মান সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এজন্য আমরা ইসলামের ইতিহাসে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এমন মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সেসব মহিলার কথাও উল্লেখ করেছি জীবনীকারদের দৃষ্টিতে যাদের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। এখানে আমরা এ ধরনের আরো দু'জন মহিলার নাম উল্লেখ করতে চাই। যাতে নারীকে উন্নত চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী বানাতে ইসলাম যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার মূল্যমান পরিমাপ করা যায়।[৪]

নওফেলের কন্যা উম্মে ওরাকা ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

كانت قد قرأت القران وامرها ان تؤم اهل دارها.

১. তাযযিবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৯।
২. আল মাদখালূ লিইবনিল হাজ্জ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৫।
৩. ঐ
৪. আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামাতুন নিসা।

www.bjilibrary.com

"তিনি ভালোভাবে কুরআন অধ্যয়ন করেছিলেন। নবী স. তাকে নামাযে বাড়ীর লোকদের ইমামতি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[১]

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ একটি মাসয়ালা বর্ণনা করলে উম্মে ইয়াকুব নাম্নী বনী আসাদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ

لقد قرأت مابين يوحى المصحف فما وجدته.

"আমি পুরো কুরআন মজীদ পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন তা কোথাও পাইনি।"[২]

বিখ্যাত মালেকী ইমাম আশহাব র. একবার এক দাসীর নিকট থেকে সবজী ক্রয় করলেন। তৎকালীন রীতি ছিল, সবজীর মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করার পরিবর্তে সবজী বিক্রেতাকে রুটি বা খাদ্য দেয়া। আশহাব র.-এর কাছে সেই মুহূর্তে রুটি ছিল না। তিনি দাসীকে বললেন ঃ সন্ধ্যা বেলায় রুটি বিক্রেতার নিকট থেকে রুটি আসলে তুমি এসে নিয়ে যাবে। দাসী বললো ঃ জনাব, এটা তো না জায়েয। খাদ্য দ্রব্যের বেচাকেনার ক্ষেত্রে শরীআত তো তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ করতে আদেশ করেছে।[৩]

লেখার প্রচলন

ইতিহাস পাঠ থেকে জানা যায়, নারী সমাজের মধ্যে পড়ার মতো লেখাও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল এবং তারা লেখার রীতি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে এতোটা জ্ঞান অর্জন করেছিল যে, চিঠি-পত্রাদি লেখা এবং বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা লিপিবদ্ধ করে রাখা তাদের জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। নীচে উল্লেখিত দু'টি ঘটনা থেকেই বিষয়টি অনুমান করা যায় ঃ

বাবী বিনতে মু'আউয়েম বলেন ঃ আমরা কয়েকজন মহিলা আসমা বিনতে মাখরামার নিকট থেকে আতর খরিদ করলাম। তিনি শিশিতে আতর ভর্তি করে আমাদের বললেন ঃ

اكتبن لى عليكن حقى.

"তোমাদের কাছে আমার অর্থ পাওনা থাকলো তা লিখে দাও।"[৪]

---

১. মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়াস যিনাহ, অনুচ্ছেদ ঃ তাহরীমু ফিল ওয়াসিলা, বুখারী, কিতাবুল লিবাস, অনুচ্ছেদ ঃ আল মুতানাম্মিসাত।
২. আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামাতুন নিসা।
৩. আল মাদখালু লিইবনিল হাজ্জ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৫।
৪. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২০।

www.bjilibrary.com

আয়েশা বিনতে তালহা রা. ছিলেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নী। হযরত আয়েশার সাথে সম্পর্ক এবং জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক তাঁর কাছে চিঠি- পত্র এবং উপহার পাঠাতো। তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে এসব চিঠিপত্র এবং উপহারের কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ চিঠিপত্রের জবাব দাও এবং উপহারের বিনিময়ে উপহার পাঠাও।[৩]

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান

নারীদের এ যোগ্যতা সমাজের কি কল্যাণ সাধন করেছে এবং দীন ইসলাম ও জ্ঞানের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করেছে, ইতিহাসের পাতা থেকে এসব প্রশ্নের যে জওয়াব পাওয়া যায় তাহলো তাদের উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দান করেছে। তারা পুরুষের পাশাপাশি এ জাতিকে দিকনির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়েম র. বলেন ঃ

والذين حفظت عنهم الفتوى من اصحاب رسول الله مأة ونيف وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যেসব সাহাবার ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশী। এর মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত।"

তাদের মধ্যেও আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এতো অধিক যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে একজনের ফতোয়া একত্রিত করলে একটি বিশাল গ্রন্থ হয়ে যাবে। এ সাতজনের মধ্যে হযরত উমর রা., হযরত আলী রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হযরত আয়েশা রা.-এর মতো ব্যক্তিত্বও অন্তর্ভুক্ত আছেন।

ফতোয়া দানকারী সাহাবাদের দ্বিতীয় সারিতে হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উসমান রা.-এর সাথে সাথে আছে হযরত উম্মে সালামার মতো মহিলা সাহাবা। তাঁদের প্রত্যেকের ফতোয়া সংকলিত করে একেকটি ছোট আকারের গ্রন্থ রচিত হতে পারে।

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরেক দল সাহাবা আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব কম। এসব সাহাবাদের মধ্যে আছেন হযরত হাসান রা., হযরত

৩. আল আদাবুল মুফরাদ—বাবুল কিতাবাতু ইলান নিসা ওয়া যাওয়াতুহুন্না।

www.bjilibrary.com

হুসাইন রা., আবুযর রা., আবু উবায়দা রা. ও অন্যান্য সাহাবাগণ। হযরত উম্মে আতিয়া রা., হযরত হাফসা রা., হযরত উম্মে হাবীবা রা., হযরত সাফিয়া রা., লায়লা বিনতে কায়েস রা., আসমা বিনতে আবু বকর রা., উম্মে শরীফ রা., খাওলা বিনতে তাওয়ীত রা., উম্মে দারদা রা. আতেকা বিনতে যায়েদ রা., সাহলা বিনতে সুহাইল রা., হযরত জুয়াইরিয়া রা., হযরত ময়মূনা রা., হযরত ফাতেমা রা., ফাতেমা বিনতে কায়েস রা., উম্মে সালামা রা. যয়নাব বিনতে উম্মে সালামা রা., উম্মে আয়মান রা,, উম্মে ইউসুফ রা., এবং গামেদিয়া রা.-ও এ দলের অন্তর্ভুক্ত।[১]

জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড়, নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সবাই তাদের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মার এসব মহীয়ষী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা এসব সমস্যার জট খুলে তাঁদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে কত লোক আসতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

كان الناس يأتونها من كل مصر.

"প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকে হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে লোক আসতো।"[২]

একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, দূর দূরান্ত থেকে এসব লোক শুধু সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যই আসতো না বরং এসব সাক্ষাতের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করাই হয়তো তাদের উদ্দেশ্য হতো।

হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা রা. হযরত উমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং হযরত আবু হুরাইরার মতো ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভংঙ্গির অধিকার সাহাবাদের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

সাহাবাদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফেজ ছিলেন। হযরত আয়েশা রা.ও তাঁদের একজন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই হাজার, দুই শ' দশটি। হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং হযরত আনাস রা. ছাড়া আর কোনো সাহাবার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এতো অধিক নয়।[৩]

---

১. ইলমুল মুওয়াকিঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯ থেকে ১১।
২. আল আদাবুল মুফরাদ ; অনুচ্ছেদ ঃ আল কিতাবাতুল ইলমে নিসা ওয়া জাওয়াবিহিন্না।
৩. শাজারাতুয যাহাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩।

www.bjilibrary.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ এবং সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে এতো ব্যাপক জ্ঞান থাকার কারণে বড় বড় সাহাবা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য তাঁর কাছে আসতেন।

হযরত আবু মূসা আশয়ারীর মতো পণ্ডিত ও ফিকাহবিদ সাহাবা হযরত আয়েশা রা.-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতো আরো অনেকের অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ما اشكل علينا اصحاب رسول الله ﷺ حديث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما.

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবারাও কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং সে বিষয়ে তাঁর কাছে কোনো না কোনো জ্ঞান লাভ করতাম।"[১]

মদীনার ফকীহ বলে খ্যাত উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস কাসেম ইবেন মুহাম্মাদ রা. সম্পর্কে ইবনে ইমাদ হাম্বালী লিখেছেন ঃ

وكافا من الاخذين عن عائشة الذين لايكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها.

"যারা হযরত আয়েশা রা. থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছেন এরা দু'জনও তাদের শামিল। তারা হযরত আয়েশা রা.-এর মতামত ও সিদ্ধান্ত কখনো অগ্রাহ্য করতেন না। বরং তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকেই মাসয়ালা উদ্ভাবন করতেন।"[২]

হাফেজ ইবনে হাজার র. বলেন ঃ

وقد حفظت عنه شيئًا كثيرا وعاشت بعده قريبا من خمسين سنة فاكثر الناس الاخذ عنها ونقلوا عنها من الاحكام والاداب شيئًا كثيرا حتى قيل ان ربع الاحكام الشرعية منقول عنها رضى الله عنها.

"হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনে বহু কিছু স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন এবং নবী স.-এর

১. তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু ফাদলি আয়েশা রা.।
২. শাজারাতুয যাহাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২।

www.bjilibrary.com

ইন্তিকালের পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষ তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে ও শুনতে পেরেছেন এবং অনেক হুকুম-আহকাম ও শিষ্টাচার তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, শরীআতের এক-চতুর্থাংশ হুকুম-আহকাম তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।"[১]

হাফেজ ইবনে হাজার র. আরেক স্থানে হযরত আয়েশা রা. থেকে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞানার্জনকারী আটাশি জন লোকের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিরাট সংখ্যক লোক তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী এসব লোকের মধ্যে আছেন আমর ইবনুল আস রা, আবু মূসা আশআরী রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মতো রাজনীতিবিদ এবং আবু হুরাইরা রা., ইবনে আব্বাস রা. ও ইবনে উমরের মতো মুহাদ্দিস ও ফকীহ। আরো আছেন সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মতো বিখ্যাত তাবেয়ী এবং আলকামা ইবনে কায়েসের মতো নামযাদা ফকীহ। তাঁদের মধ্যে যেমন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস ছিলেন তেমনি ছিলেন নারী এবং পুরুষ।[২]

হযরত সাফিয়া রা.-এর জ্ঞান থেকে মুসলিম উম্মাহ কি পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়েরের একটি বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন ঃ হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে হযরত সাফিয়া রা.-এর খেদমতে হাজির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম কুফার কিছু সংখ্যক মহিলা পূর্বেই তাঁর খেদমতে বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় এবং হায়েজ ও নাবীযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।[৩]

এভাবে কত জায়গার মানুষ যে তাঁর নিকট থেকে কত শত মাসয়ালা জেনে নিয়েছে তার কোনো সীমা-সংখ্যা নেই।

হযরত উম্মে সালামার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ বত্রিশ জন রাবীর নাম-ঠিকানা বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ এছাড়া আরো অনেক লোক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪] এসব বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাহাবা এবং বিখ্যাত তাবেয়ী উভয় শ্রেণীর লোক আছেন।

মারওয়ানের একটি বিষয়ে জানা দরকার ছিল। তিনি বলেন ঃ

---

১. ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮২-৮৩।
২. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৩।
৩. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৭।
৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫৬।

www.bjilibrary.com

كيف نسأل احدا عن شيئ وفينا ازواج النبى.

"আমাদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ বর্তমান থাকতে কোনো বিষয়ে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে যাব কেন ?"

তাই তিনি লোক মারফত হযরত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার সে সমস্যার সমাধান করে দেন।[১]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যকার ইলমী মতপার্থক্য দূর করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের দীন সম্পর্কিত জ্ঞান বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন ঃ

وقد كانت الصحابه مختلفون فى الشيئ فتروى لهم احدى امهات المؤمنين عن النبى ﷺ شيئا فياخذون به ويرجعون اليه ويتركون ما عندهم له

"কোনো বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য হলে এবং উম্মুল মু'মিনীনদের কেউ সে বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে তাঁরা সাথে সাথে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সমস্ত মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।"[২]

রাবী' বিনতে মু'আওয়েযের কাছে বিভিন্ন মাসয়ালা সম্পর্কে জানার জন্য কখনো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হাজির হতেন এবং কখনো হাজির হতেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.। তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মদীনার খ্যাতনামা ফিকাহবিদ সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রা., আম্মার ইবনে ইয়াসারের নাতি আবু উবায়দা, আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ এবং ইবনে উমরের ক্রীতদাস নাফে'র মতো জ্ঞানী-গুণী এবং সুধীজনও।[৩]

ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে সমকালীন যেসব পণ্ডিত ও হাদীস বিশারদ হাদীস বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেছেন তারা হলেন কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রা., সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব রা., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রা., আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান রা. এবং শা'বীর মত পণ্ডিতবর্গ।[৪]

উম্মে আতিয়া সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবদুল বার লিখেছেন ঃ

---

১. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৩।
২. যাদুল মা'আদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২১।
৩. আল ইসতি'আব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু বাবী বিনতে মু'আওয়েয।
৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৪।

www.bjilibrary.com

وشهدت غسل ابنة رسول الله ﷺ وحكت ذالك فاثنت وحديثها اصل فى غسل الميت وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة ياخذون عنها غسل الميت ولها عن النبى ﷺ احاديث روى عنها انس بن مالك ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين.

"তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যার জানাযার গোসলে শরীক ছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। মৃতকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীসই মূল ভিত্তি। সাহাবা এবং বসরার তাবেয়ী উলামাগণ তাঁর নিকট থেকেই মৃতকে গোসল করানোর নিয়ম-কানুন শিখেছিলেন। এ হাদীসটি ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তার বর্ণিত আরো অনেক হাদীস আছে যা আনাস ইবনে মালেক, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন এবং হাফসা বিনতে সিরীন বর্ণনা করেছেন।"

"আমরা বিনতে আবদুর রহমানের বর্ণিত হাদীসসমূহ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের দৃষ্টিতে এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাযম রা.-কে তা লিখে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। জ্ঞান লাভের জন্য আমরা বিনতে আবদুর রহমানের কাছে শুধু আবু বকর ইবনে হাযম রা.-ই নয় বরং ইমাম যুহরী রা. এবং ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদের মতো অতুলনীয় জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকেও হাজির হতে হয়েছে।"[১]

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের কন্যা 'আয়েশা রা.-এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালেক র. আইয়ুব সুখতিয়ানী এবং হাকাম ইবনে উতায়বার মতো ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণকেও দেখা যায়।[২]

ইমাম শাফেয়ী র. হযরত হাসান রা.-এর নাতনী সাইয়েদা নাফিসা র.-এর কাছে গিয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।[৩]

এ ক'টি ইংগিত দ্বারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীদের ইলমী খেদমতের শুধু একটি সার্বিক ও মোটামুটি চিত্র সামনে আসতে পারে। ইতিহাস কোনো যুগেই কোনো শ্রেণীর গোটা কর্মকাণ্ডকে আলোচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেনি এবং করতে সক্ষমও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাস যে তথ্য সংরক্ষিত রেখেছে শুধু তার ভিত্তিতেই যদি এসব মহীয়সী নারীর জ্ঞান ও চিন্তাগত কীর্তিসমূহের সবিস্তার বর্ণনা তুলে ধরা হয় তাহলে একটি বিশাল গ্রন্থ তৈরী হতে পারে।

---

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৩।
২. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৬।
৩. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান লি ইবনে খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৯।

www.bjilibrary.com

কর্মক্ষেত্রে নারী

ইসলাম নারীর চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতা শুধু জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং তার কর্মতৎপরতার ব্যাপক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই সে জ্ঞান ও সাহিত্যের ময়দানে যেমন অগ্রসর হতে পারে তেমনি কৃষি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ময়দানে সমৃদ্ধির অধিকার রাখে। শিল্প-কারিগরী এবং বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করার অনুমতি যেমন তার রয়েছে তেমনি রয়েছে জাতীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করার অনুমতি। এ ক্ষেত্রে অনুমতির অর্থ এ নয় যে, তার চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতা শুধু বরদাশ্ত করা হয়েছে বা মেনে নেয়া হয়েছে। বরং তার অর্থ হলো, জীবন এবং গতি ও অনুভূতির সেব চাহিদা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় তাকে অবদমিত এবং ধ্বংস করার কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। বরং ওগুলোকে পূর্ণতায় পৌছানোর জন্য তাকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

একটি ঘটনা থেকেই বিষয়টি অনুমান করা যায়। কোনো এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাদা ইবনে সামেতের স্ত্রী উম্মে হারাম রা.-এর ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ তিনি মুচকি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম খুশীর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন ঃ আমার উম্মতের যেসব উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ জিহাদ করার জন্য সমুদ্র যাত্রা করবে আমাকে স্বপ্নে তাদের দেখানো হলো। জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রার সাওয়াব এতো বেশী যে, তারা জান্নাতে বাদশাহদের মতো সিংহাসনে সমাসীন থাকবে। উম্মে হারাম রা. বললেন ঃ দোয়া করুন, আল্লাহ আমাকেও যেন তাদের মধ্যে শামিল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির দোয়া করলেন। এরপর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পুনরায় যখন জেগে উঠলেন তখনও তাঁর চেহারায় আনন্দ ও খুশির চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। উম্মে হারাম জানতে চাইলে নবী স. উম্মে হারামকে পূর্বের সে একই কারণ জানালেন। উম্মে হারাম এবারও দোয়া করার জন্য আবেদন জানালে তিনি বললেন ঃ এতো অধৈর্য হচ্ছো কেন? তুমি অগ্রবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছ।"[১]

চিন্তা করে দেখুন! জিহাদ করতে হবে, তাও আবার সমুদ্র পাড়ে গিয়ে। এটি জীবনের সর্বাধিক ধৈর্য এবং ত্যাগ ও কুরবানীর কাজ। আর তাতে নারীর অংশ গ্রহণের সুযোগ হওয়ার জন্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম

---

১. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ গাযওয়াতুল মারআতিল বাহরা।

www.bjilibrary.com

দোয়া করছেন। অথচ তার জন্য জিহাদ ফরয নয়। এ থেকেই ইসলামের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা যায়। ইসলাম চায় না নারী সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে একেবারেই দূরে থাকুক এবং নিজস্ব গণ্ডি বহির্ভূত অন্য কোনো কাজ আদৌ না করুক। তবে এ বিষয়টি বাস্তব ও সত্য যে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে কামিয়াবীর জন্য যেসব গুণাবলী থাকা দরকার, যেমন ঃ কষ্ট সহিষ্ণুতা, সরলতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রকৃতিগতভাবে নারীর মধ্যে তার অভাব থাকে। আর এসব গুণাবলী কেবল তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষকে বিরোধী শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়। কিন্তু যেহেতু পারিবারিক জীবনের কর্মকাণ্ডের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণে নারী এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে দূরে অবস্থান করে, তাই তার মধ্যে এসব গুণাবলী সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ খুব কমই থাকে। বরং গৃহাভ্যন্তরের শান্ত জীবন অতি সহজেই তার মধ্যে লৌকিকতা, আয়েশ ও আরাম প্রিয়তা, হালকা মেজাজ ও প্রকৃতি এবং অস্থির চিত্ত হওয়ার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। ইসলাম চেষ্টা করে যাতে তার মধ্যে এসব মন্দ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে না পারে এবং সে জীবনের কঠিন পরিস্থিতিসমূহের মোকাবেলা দৃঢ়তার সাথে করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে শরীআত তাকে কর্মময় ও সহজ সরল জীবন যাপনের শিক্ষা দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই শ্রেণীর লোক সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা জাহান্নামী হবে। তার মধ্যে একটি শ্রেণী হলো ঃ

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةٍ كَذَا وَكَذَا.

"এমন সব মহিলা যারা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ থাকে, চপল ও নৃত্যের ভঙ্গিতে হাঁটে এবং উটের কুঁজের মত কাঁদ হেলিয়ে দুলিয়ে আহলাদিত ভঙ্গি প্রকাশ করে চলে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।"[১]

একবার এক গোছা পরচুলা হাতে বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে হযরত মু'আবিয়া রা. মদীনাবাসীদের প্রশ্ন করলেন ঃ

اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهٖ وَيَقُوْلُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهٖ نِسَاؤُهُمْ ـ

১. মুসলিম, অধ্যায় ঃ আল্ লিবাস ওয়ায যীনাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আন নিসাউল কাসিয়াত।

www.bjilibrary.com

"তোমাদের আলেমগণ কোথায় ? (তারা এ বিষয়ে সমালোচনা করে না কেন ?) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি এসব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলরা তখনই ধ্বংস হয়েছিল যখন তাদের মহিলারা এসব ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।"[১]

এ বিষয়টি কিছুটা আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় যে, নারীদের একটি কাজের জন্য গোটা জাতিও ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটির অর্থ এ নয় যে, এ কাজটি তাদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ ছিল। বরং একটি নির্দিষ্ট কাজ দেখিয়ে তিনি তাদের সেই মানসিকতা ও মেজাজের প্রতি ইংগিত করতে চেয়েছেন যা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে অতি দ্রুত ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কোনো জাতি যদি সরলতার পরিবর্তে লৌকিকতা ও ঠাটবাটে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কষ্ট সহিষ্ণুতার বদলে আরাম আয়েশের আকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে তাহলে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সে কখনো দৃঢ়পদ থাকতে পারে না।

ইসলামী শরীআত ধ্বংসের এসব কারণ থেকে নারীকে নিরাপদে রাখতে চায় যাতে জীবনের রণক্ষেত্রে তাকে ব্যর্থতার মুখ দেখতে না হয় এবং সফলতার সাথে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমার খালাকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দিলো। (তালাকের পর ইদ্দতের দিনগুলো তার ঘরে বসেই কাটানো উচিত ছিলো) কিন্তু ইদ্দতের মধ্যেই তিনি নিজের বাগানের কয়েক কাদি খেজুর কাটার (এবং তা বিক্রি করার) ইচ্ছা করলে এক ব্যক্তি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলো যে, এ সময় ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলে তিনি তাকে বললেন ঃ

اُخْرُجِىْ فَجُدِّىْ نَخْلَكِ لَعَلَّكِ اَنْ تَصَدَّقِىْ مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِىْ خَيْرًا.

"বাগানে যাও, তোমার খেজুর গাছ কাট (এবং বিক্রি করো) তুমি সম্ভবত সে অর্থ দান খয়রাত করতে অথবা কোনো কল্যাণকর কাজে লাগাতে পারো। (এভাবে এ অর্থ তোমার আখেরাতের পুরস্কারের কারণ হবে)।"[২]

---

১. বুখারী, কিতাবুল লিবাস, অনুচ্ছেদ ঃ আল ওয়াসলু 'ফিশ্ শা'র, মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যীনাহ।

২. আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ ফিল মাবতুতাতি তাখরুজু বিন নাহার, মুসলিম ও ইবনে মাজা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

একথাগুলো বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জাবের রা.-এর খালাকে মানবতার কল্যাণ কামনা ও তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এর অর্থ হলো ঃ ইসলামী শরীআত বা জীবন বিধান নারীকে এতোটা যোগ্য দেখতে চায় যাতে সে নিজের মতো অন্য মানুষের সেবা করতে পারে এবং তার হাতে কল্যাণকর কাজ সম্পাদিত হয়।

ঘরের বাইরে কাজ করার অনুমতি

এ হাদীস থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা গেলো তাহলো, পবিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধন এবং কল্যাণকর কাজের পূর্ণতা সাধনের জন্য নারী ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মহিলারা প্রয়োজনে বাজার এবং ক্ষেত খামারে যাতায়াত করতো। কারণ, আগে থেকেই কোনো সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থাকলে হযরত জাবের রা.-এর খালা তার খেজুর বাগানে যাওয়ার চিন্তাইবা করবেন কেন আর এ বিতর্কইবা দেখা দেবে কেন যে, অমুক বিশেষ অবস্থায় তাঁর ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয কিনা ?

অন্য কয়েকটি বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেছেন ঃ হযরত সাওদা রা.-কে বাইরে যেতে দেখে হযরত উমর রা. তাঁর সমালোচনা করলে (তিনি কোনো কথা না বলে) ঘরে ফিরে আসলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিষয়টি বললেন। এর পরপরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল। এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বললেন ঃ

اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

"প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।"[১]

নারীর বাস্তব কর্মতৎপরতা এ বিষয়ে অকাট্য এবং নিশ্চিত প্রমাণাদি পেশ করেছে যে, ঘরকন্যার কাজ ছাড়াও সে ঘরের ভিতরে ও বাইরে আরো অনেক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাবে। ইসলামী সমাজ তার এসব তৎপরতার পথে কখনো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি।

১. বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরাতুল আহযাব, অনুচ্ছেদ ঃ কাওলুহু লা-তাদখুলু বুয়ুতান নাবীয়ে। মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬।

www.bjilibrary.com

কৃষিকাজ

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর খালার ঘটনা কৃষিকাজের সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকা প্রমাণ করে।

সাহল ইবনে সা'দ অন্য একজন মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন, যার নিজের কৃষিক্ষেত্র ছিলো। সে তার কৃষিক্ষেত্রের সেচ খালের পাড় দিয়ে গাজরের চাষ করতো। সাহল ইবনে সা'দ এবং অন্য সাহাবাগণ জুম'আর দিন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে সে তাঁদের গাজর ও আটার তৈরী এক প্রকার হালুয়া খেতে দিত।[১]

হযরত আবু বকর রা.-এর কন্যা হযরত আসমা রা. তাঁর সাংসারিক জীবনের প্রথম দিকের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, হযরত যুবায়ের রা.-এর সাথে আমার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। তাঁর শুধু একটি পানিবাহি উট ও একটি ঘোড়া ছাড়া আর কোনো অর্থ সম্পদ, কাজের লোক বা অন্য কোনো জিনিস ছিল না। আমি নিজেই তাঁর ঘোড়াকে ঘাস ও পানি দিতাম এবং পানির পাত্র ভর্তি করতাম। (পারিবারিক কাজকর্ম আমাকেই করতে হতো তাই) আমাকেই আটার খামির বানিয়ে রুটি তৈরী করতে হতো। আমি ভালো করে রুটি তৈরী করতে পারতাম না। কিছু সংখ্যক আনসারী মহিলা ছিল আমার প্রতিবেশিনী। তারা ছিলো আমার ঘনিষ্ঠ ও নিস্বার্থ বান্ধবী। তারাই আমাকে রুটি তৈরী করে দিতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যুবায়ের রা.-কে আমার বাড়ী থেকে দুই মাইল দূরে একখণ্ড জমি চাষ করে তার ফসল গ্রহণ করতে দিয়েছিলেন। আমি সে জমি থেকে খেজুরের আঁটি সংগ্রহ করে আনতাম। একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি ভর্তি ঝুড়ি বহন করে আনছিলাম। রাস্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা হয়ে গেলো। তাঁর সাথে যেহেতু কয়েকজন আনসার ছিলেন। তাই পুরুষদের সাথে পথ চলতে আমি লজ্জাবোধ করলাম। সাথে সাথে যুবায়েরের কথাও মনে পড়ে গেলো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ। তিনিও তা পসন্দ করবেন না। সুতরাং আমি ইতস্তত করতে থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বুঝে ফেললেন এবং আমাকে না নিয়েই চলে গেলেন।[২]

ব্যবসায়-বাণিজ্য

নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং তার ফলাফল অধ্যায়ে সবজি বিক্রেতা এক দাসীর কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফায়লা রা. নাম্নী এক মহিলা সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ

---

১. বুখারী, কিতাবুল জুম'আ, অনুচ্ছেদ ঃ কাওলুল্লাহ তা'আলা ফাইযা কুদিয়াতিস সালাতু....।
২. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আল-গাইরাতু

www.bjilibrary.com

اِنِّیْ اِمْرَأَةٌ اَبِیْعُ وَاَشْتَرِیْ.

"আমি একজন মহিলা। আমি নানা প্রকার জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি (অর্থাৎ আমি ব্যবসায়ী)।"[১]

এরপর সে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নবী স.-এর কাছ থেকে জেনে নিল।

হযরত 'উমর রা.-এর খিলাফত যুগের একটি ঘটনা। আসমা বিনতে মাখরামা রা.-কে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবীয়াহ ইয়ামান থেকে আতর পাঠাতো আর তিনি ঐ আতরের কারবার করতেন।[২]

আমরা বিনতে তাবীখ বলেন ঃ একবার দাসীকে সাথে করে বাজারে গিয়ে মাছ খরিদ করে থলিতে রাখলাম। (থলি ছোট থাকায়) মাছের মাথা ও লেজ থলির বাইরে বেরিয়ে রইলো। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত আলী রা. তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কত দাম দিয়ে কিনেছেন ? এ তো বেশ বড় এবং সুন্দর। পরিবারের সবাই তৃপ্তির সাথে খেতে পারবে।[৩]

শিল্প ও কারিগরি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী শিল্প ও কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর নিজের, স্বামীর এবং সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন ঃ

انی امرأة ذات صنعة ابيع منها وليس لی ولا لزوجی ولا لولدی شيئ.

"আমি কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ একজন নারী। আমি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করে বিক্রি করি। (এভাবে আমি উপার্জন করতে পারি, কিন্তু) আমার স্বামী ও সন্তানদের (আয়ের কোনো উৎস) কিছুই নেই।"

তিনি জানতে চাইলেন, তিনি কি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারেন ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, তুমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পার। এজন্য তুমি পুরস্কার লাভ করবে।[৪]

---

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২।

২. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২। আল-ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু রাবী বিনতু মু'আওয়েয।

৩. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড। পৃষ্ঠা-২১২।

৪. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১২, আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায়ও একই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

www.bjilibrary.com

ইবনে সা'দও এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। খাওলা বিনতে সা'লাবার স্বামী একবার তাঁকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে ফেলেন যে, আজ থেকে আমার কাছে তুমি আমার মায়ের মতো। পরে তারা উভয়েই এ বিষয়ে জানার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যান। যেহেতু এ বিষয় সম্পর্কে তখনো পর্যন্ত কোনো হুকুম নাযিল হয়নি। তাই আল্লাহর নবী স্বামীকে নির্দেশ দিলেন যে, অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা থাকবে। একথা শুনে তার স্ত্রী বললো ঃ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَهُ مِنْ شَيْئٍ وَمَا يَنْفِقُ عَلَيْهِ الاَّ اَنَا.

"হে আল্লাহর রাসূল ! তার ব্যয় নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি তার ব্যয় নির্বাহ করে থাকি। (সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিভাবে জীবন যাপন করবে ?")[১]

অধিকার সংরক্ষণ

ইসলামী সমাজ নারীকে যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান করেছে এবং যেখানেই সে তার অধিকার নস্যাত হতে দেখেছে অথবা তার প্রতি কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি বা নির্যাতন হয়েছে সেখানেই সে তার এসব অধিকার সংরক্ষণের জন্য বুদ্ধিমত্তার সাথে চেষ্টা-সাধনা করেছে। এ ব্যাপারে ইসলামী আইন তাকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কামিয়াব করেছে। এক ব্যক্তি একজন সম্পদশালী লোকের সাথে তার মেয়েকে বিয়ে দেয়। কিন্তু মেয়ে তাকে পসন্দ করছিল না। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো ঃ

ان ابى زوجنى ابن اخيه ليرفع بى خسيسة.

"আমার পিতা তার এক সম্পদশালী ভাতিজার সাথে আমার বিয়ে দিয়েছেন যাতে আমার বিনিময়ে স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্য লাভ করতে পারেন।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ যদি এ বিয়ে পসন্দ না করো তাহলে এ ব্যাপারে তুমি স্বাধীন। সে বললো ঃ

قد اجزت ماصنع ابى ولكن اردتُ ان تعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيئ.

"আমি এ বিয়ে মেনে নিলাম। তবে আমি চেয়েছিলাম নারী সমাজ জানুক, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়ার অধিকার তাদের পিতাদের নেই।"

এ যেন বাপের যুলুমের বিরুদ্ধে একজন নারীর সফল প্রতিবাদ।

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৬।

www.bjilibrary.com

বারীরা রা. ছিলেন একজন ক্রীতদাসী। মুগীস নামক এক ক্রীতদাসের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কিছুদিন পর বারীরা রা. দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হলে মুগীসের বিবাহ্ বন্ধনে থাকতে অস্বীকার করলেন। কারণ, ইসলামী শরীআতের নীতি অনুসারে স্বাধীন কোনো নারীর ক্রীতদাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে থাকা জরুরী বা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু মুগীস রা. বারীরা রা.-কে জান-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাঁর ভালোবাসা এতো গভীর ছিল যে, বারীরা রা.-এর সিদ্ধান্তের পরে তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারীরাকে বললেন ঃ

يا بريرة اتقى الله فانه زوجك وابو ولدك.

"হে বারীরা! আল্লাহকে ভয় করো (এবং তার ভালোবাসা ও অস্থিরতার প্রতি লক্ষ করো)। গতকাল সে তোমার স্বামী ছিলো। আর তার ঔরসের সন্তানও তোমার আছে।"

বারীরা রা. জিজ্ঞেস করলেন ঃ

اتا مرنى بذالك ـ

"আপনি কি আমাকে তার স্ত্রী হয়ে থাকার আদেশ দিচ্ছেন ?"

তিনি বললেন ঃ

لا انما انا شافع ـ

"না, আমি কিভাবে এ নির্দেশ দিতে পারি ? আমি সুপারিশ করছি মাত্র।"

একথা শুনে বারীরা রা. বললেন ঃ

فلا حاجة لى فيه

"তাহলে তাকে দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"[১]

চিন্তা করে দেখুন! ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী একজন ক্রীতদাসী একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও সুপারিশের মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্য খুব ভালো করে উপলব্ধি করতে পারছেন, অন্যদিকে এ বিষয়ে তার পূর্ণ ও নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো যে, সে নিজের অধিকারের জন্য সঠিক পন্থায় যে চেষ্টা করবে আইন তাকে ব্যর্থ হতে দেবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে মহিলারা নামাযের জামায়াতে শরীক হতে মসজিদে আসতেন। কিন্তু কিছু কারণে হযরত উমর রা. উপলব্ধি করলেন যে, মেয়েদের ঘরের বাইরে যাতায়াত করা উচিত নয়। এ

১. বুখারী; কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ শাফায়াতুন নবী স. ফী জাওজি বারীরাহ, আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ ফী মামলুকাতি তু'তাকু-----।

www.bjilibrary.com

ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে যেহেতু অনুমতি ছিলো তাই তিনি আইনগত কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চাচ্ছিলেন না। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হযরত 'উমর রা.-এর স্ত্রী আতেকা রা.-ও নামাযের জামায়াতে শরীক হতেন। একদিন হযরত 'উমর রা. তাঁকে বললেন ঃ

والله انك لتعلمين انى ما احب هذا.

"আল্লাহর শপথ! তুমি অবশ্যই জানো যে, তোমার এ কাজ আমি পসন্দ করি না। তা সত্ত্বেও তুমি তা করা থেকে বিরত হচ্ছো না।"

জবাবে তিনি বললেন ঃ

والله لا انتهى حتى تنهانى.

"আল্লাহর শপথ! আপনি আমাকে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য যতোক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্টভাষায় আদেশ না দিচ্ছেন ততোক্ষণ আমি যাওয়া বন্ধ করবো না।"

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, হযরত 'উমর রা.-এর জীবদ্দশায় তিনি তাঁর এ নীতি পরিত্যাগ করেননি। যেদিন মসজিদে হযরত 'উমর রা.-এর ওপর আক্রমণ করা হয় সেদিনও তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[১]

অন্য কথায় হযরত আতেকা রা. যেমন হযরত 'উমর রা.-কে বলেছেন ঃ স্বামী হিসেবে আমাকে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি না দেয়ার অধিকার আপনার আছে। আর তা মেনে চলাও আমার জন্য জরুরী। কিন্তু আপনার ইচ্ছা মেনে নিতে আমি বাধ্য নই। হযরত আতেকা রা.-এর এ কাজ প্রশংসনীয় ছিলো কিনা তা এখানে দেখার বিষয় নয়। বরং এখানে যে সত্যটির প্রতি আকর্ষণ উদ্দেশ্য তা হলো, একজন মহিলা কর্তৃক তাঁর একটি মামুলী অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা এবং সে ক্ষেত্রে কামিয়াবী। আতেকা রা. শরীআতের দেয়া একটি সুবিধা ভোগ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু সেটিকে ভালো মনে না করলেও হযরত উমর রা. জোর করে তাকে তা থেকে বঞ্চিত করা পছন্দ করছেন না। অথচ তিনি আতেকা রা.-এর স্বামী এবং তার চেয়েও বড় কথা, তিনি সে সময়ের খলীফা। তাই স্ত্রীর যে কাজকে তিনি কল্যাণের পরিপন্থী মনে করবেন তা নিষিদ্ধ করার যথাযথ অধিকার তার ছিলো। মামুলী এ ঘটনাটি থেকে অনুমান করা যায়, ইসলামী সমাজে নারীর অধিকারসমূহ কতো মর্যাদা পেয়ে থাকে।

---

১. বুখারী, কিতাবুল জুম'আ, অনুচ্ছেদ ঃ হাল আলা মাল-লাম ইয়াশহাদিল জুমআতা গুসলূন--- মা'আত্মা ফাতহিল বারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬১।

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ একবার তাঁর কাছে উত্তম ও সচ্ছল জীবনের দাবী করলেন। এ ধরনের দাবী যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদাহানিকর ও তাঁর জীবন যাপন প্রণালীর পরিপন্থী। তাই এতে তিনি অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করলেন এবং এক মাস পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা. এ খবর পাওয়া মাত্র অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং নিজ নিজ কন্যাদেরকে (হযরত আয়েশা রা. ও হযরত হাফসা (রা.)-কে কঠোর ও নমনীয় উভয় প্রকারে বুঝিয়ে বললেন যে, তোমাদের এ দাবী ঠিক নয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য স্ত্রীদেরকেও বুঝাতে থাকলেন। এক পর্যায়ে হযরত উম্মে সালামার কাছে গেলে তিনি বললেন :[১]

ما لكما ولما هاهنا رسول اللّه اعلى بامرنا عينا ولو اراد ان ينهانا لنهانا فمن نسأل اذالم نسأل رسول اللّه ﷺ هل يدخل بينكما وبين اهليكما احدٌ فما نكلّفكما هذا.

"আপনাদের এখানে কি কাজ ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের অবস্থা ভালো করেই জানেন। তিনি চাইলে আমাদের নিষেধ করবেন। তখন (আর আমরা দাবী করবো না) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাবী না করলে আর কার কাছে দাবী করবো ? আপনাদের এবং আপনাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কি কেউ নাক গলায়। আপনারা চলে যান। আমরা এ ব্যাপারে আপনাদেরকে কষ্ট দিতে চাই না।"

এখানে লক্ষ করুন! স্বামী-স্ত্রীর একান্ত সম্পর্কের মধ্যে হযরত উম্মে সালামা রা. কোনো বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকের হস্তক্ষেপও মেনে নিতে পারছেন না এবং প্রত্যেক নারীকেই তিনি স্বামীর নিকট থেকে বৈধ আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার আদায় করে দিতে চাচ্ছেন।

সামষ্টিক স্বার্থের জন্য প্রচেষ্টা

এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সমাজ নারীর ওপর যুলুম-অত্যাচার বধিরের কান দিয়ে শোনে না এবং অন্ধ চোখ দিয়ে দেখে না।

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৯। সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তালাক এবং ইবনে সা'দের কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শুধু হযরত 'উমর রা. হযরত উম্মে সালামা রা.-এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তবে যেহেতু উপরোল্লেখিত বর্ণনায় হযরত আবু বকর রা.-এর নামেরও উল্লেখ আছে এবং তার সাথে সুস্পষ্ট ভাষায় হযরত উম্মে সালামা রা.-এর জবাবও বর্ণিত হয়েছে, তাই আমরা এ বর্ণনাটি উল্লেখ করলাম।

www.bjilibrary.com

বরং এ সমাজ হয় তার অধিকারসমূহের সংরক্ষক। ন্যায় ও ইনসাফের প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দেয়া সে তার অবশ্য কর্তব্য মনে করে। এসব ঘটনা থেকে আবার এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাও ঠিক হবে না যে, চৌদ্দশ বছর আগের ইসলামী রাষ্ট্রে যাকে আমরা নমুনা হিসেবে পেশ করে থাকি—নারীকে সদা-সর্বদা এক যালেম প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হতো। সে প্রতিপক্ষের যুলুম-অত্যাচার উৎখাত করতেই নারীকে জীবনভর চেষ্টা-সাধনা করতে হয়েছে। কারণ, এটি হবে এমন এক সিদ্ধান্ত, ইসলামের ইতিহাস যা অস্বীকার করে। ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করা ইসলামী সমাজের মেজাযের পরিপন্থী। ইসলামী সমাজ পরস্পর দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত শ্রেণী ও গোষ্ঠী তৈরীর পরিবর্তে এমন সব ব্যক্তি তৈরী করেছিল যাদের মধ্যে ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এর ব্যতিক্রম কোনো ঘটনা ঘটলে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কারোর ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করা যায় না। বরং তা একান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং অবচেতনা প্রসূত বিচ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজের স্বার্থে নারীরা যে অসংখ্য সেবামূলক কাজ করেছে তা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব সেবার পেছনে ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের পরিবর্তে সমষ্টিগত কল্যাণকামিতাই বেশী প্রেরণা যুগিয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এর প্রমাণ পাবো।

❒

www.bjilibrary.com

ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর অবদান

এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলিম নারীরা ইসলামের জন্য বড় বড় ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেছেন। এজন্য তাঁরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধনের ওপর ছুরি চালিয়েছেন, নিজ বংশ ও গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, বিপদাপদ সহ্য করেছেন এবং ঘরবাড়ী ছেড়েছেন। মোটকথা, যে স্বার্থই ইসলামের স্বার্থের সাথে সংঘাতমুখর হয়েছে তাকেই তাঁরা পদাঘাত ও প্রত্যাখ্যান করতে কোনো রকম দ্বিধা ও সংশয়বোধ করেননি। আল্লাহর সাথে তারা যে চুক্তি ও প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলেন তা পূরণ করার ব্যাপারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করেননি।

মুসলিম নারীর ত্যাগ ও কুরবানী

মক্কার প্রাথমিক যুগে যে সাহসী মানুষগুলো ঈমান এনেছিলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসারের পরিবার তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মা ছিলেন আবু হুযায়ফা ইবনে মুগীরার দাসী। ইসলাম বর্জন করানোর জন্য তাঁর ওপর সব রকমের নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। এমনকি ন্যায় ও সত্যের আহ্বানে সাড়া দেয়ার অপরাধে আবু জাহেল বর্শার আঘাতে তাঁকে শহীদ করেছিল। কিন্তু সে তাঁর দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞায় কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে সাড়া দানের কারণে কোনো ব্যক্তির এটিই ছিলো প্রথম শাহাদাতবরণ।[১] হযরত উমর রা.-এর বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ঈমান গ্রহণ করলে হযরত উমর রা. তাকে এতোটা মারপিট করলেন যে, তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহর সাথে তিনি ঈমানের যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাকে দুর্বল বা শিথিল হতে দিলেন না। হযরত 'উমরের নির্যাতনের জবাবে তিনি বললেন ঃ

يا ابن الخطاب ما كنت صانعا فاصنعه فاني قد اسلمت.

"হে খাত্তাবের পুত্র! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো। (আমি ইসলাম ত্যাগ করতে পারবো না।)"

হযরত উমর রা. কুরআন হাতে নিয়ে দেখতে চাইলে তিনি বললেন ঃ

رعنا عنك يا ابن الخطاب انت لاتغسل من الجنابة وهذا لايمسه الا المطهرون.

---

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৩।

www.bjilibrary.com

"হে খাত্তাবের পুত্র! ওটি রেখে দাও। কারণ, তুমি জানাবাতের গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করোনি। আর এটি এমন গ্রন্থ যা পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারে না।"[১]

আবু সুফিয়ানের ঈমান গ্রহণের পূর্বের একটি ঘটনা। তিনি মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলেন এবং নিজ কন্যা উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা রা.-এর সাথেও সাক্ষাত করতে গেলেন। ঘরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা পাতা ছিল। আবু সুফিয়ান সে বিছানার ওপর বসতে উদ্যত হলে উম্মে হাবীবা তা গুটিয়ে নিলেন। পিতার কাছে কন্যার এ আচরণ ছিলো অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার মর্যাদার উপযুক্ত নয় বলে তুমি তা গুটিয়ে নিলে, নাকি আমাকে এর ওপর বসার উপযুক্ত মনে করোনি ? মেয়ে জবাব দিলেন ঃ 'এ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা। আপনি মুশরিক এবং অপবিত্র। এ পবিত্র বিছানায় আপনাকে বসিয়ে আমি তা অপবিত্র করতে চাই না।'

কুরআন মজীদের নির্দেশ হলো, আল্লাহর দুশমন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাতি বা লোকদের সাথে ঈমানদারদের কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। একবার হযরত আসমা রা.-এর মুশরিক মা ফাতিমা বিনতে আবদুল উয্যা মক্কা থেকে উপহার উপঢৌকন নিয়ে মদীনায় তাঁর বাড়ীতে আসলেন। হযরত আসমা রা. মায়ের এ উপঢৌকন গ্রহণ করা তো দূরের কথা তাঁকে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করার অনুমতি দেয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, আমি কি তাকে আমার বাড়ীতে অবস্থান করার অনুমতি দিতে পারি ? সাথে সাথে তিনি এ কথাও জানতে চাইলেন যে, তার মা তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতি পেতে আগ্রহী। তাকে সহযোগিতা করা এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা কি আমার জন্য জায়েয ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার এ দুটি কাজই জায়েয।[২] রাকীকা বিনতে আবু সাইফী রা. মক্কী যুগের অত্যন্ত নাজুক মুহূর্তে সত্যের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা করলে তিনিই তাঁকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে

১. মুসতাদরাক হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০। ইমাম যাহাবী এ বর্ণনার সনদের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাটি কয়েকটি সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীও কোনো কোনো সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮১।

২. বুখারী, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ ঃ সিলাতুল ওয়ালিদিল মুশরিক। তাবকাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪, ইমাম বুখারী ও ইবনে সা'দ ঘটনাটির এক একটি অংশ মাত্র বর্ণনা করছেন। আমরা উভয়ের বর্ণনাই গ্রহণ করেছি।

www.bjilibrary.com

দিয়ে বললেন ঃ রাতের অন্ধকারে আপনার ওপর আক্রমণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাই এখন আপনি নিজেকে হেফাযতের ব্যবস্থা করুন। সুতরাং নবী স. রাতের মধ্যেই মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন।

এ মহিলা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে মাখরামা তখনও কুফরকে আঁকড়ে ধরেছিলো। আপন পুত্র। তাই বলে ঈমানদার মা পুত্রের এ বে-দীনি জীবনকে হাসিমুখে বরদাশ্ত করে নিলেন না। মাতৃত্ব ঈমানী আবেগকে পরাভূত করতে পারলো না। পুত্র মাখরামার ব্যাপারে তিনি কঠোর নীতি গ্রহণ করলেন এবং সেভাবেই কাজ করলেন।[১]

হযরত আয়েশা রা.-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ব্যাপারে যেসব লোক জড়িত ছিলো তাদের মধ্যে মিসতাহ ইবনে আসাসা অন্যতম। মায়ের ঈমানী দাবী পুত্রের এ ভ্রান্ত আচরণ মেনে নেয়নি কিংবা অন্তত তার পক্ষে কোনো যুক্তি দাঁড় করার অনুমতিও দেয়নি। ইবনে সা'দ লিখেছেন ঃ

كانت من اشد الناس على مسطح حين تكلم مع اهل الافك فى عائشة رضـ.

> "মিসতাহ হযরত আয়েশা রা.-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের সাথে জড়িয়ে পড়লে তার মা অন্যদের তুলনায় তার প্রতি সর্বাধিক কঠোরতা দেখিয়েছেন।"[২]

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি তার এ শরীআত বিরোধী এবং নাজায়েয কাজের জন্য সর্বদা অস্থির থাকতেন এবং দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর সাথে বাইরে থেকে ঘরে ফেরার সময় পায়ে কাপড় জড়িয়ে গেলে মনের সুপ্ত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ সময় তিনি নিজের ছেলের জন্য বদদোয়া করতে থাকেন। তখন পর্যন্ত হযরত আয়েশা রা. অপবাদের ঘটনা এবং মিসতাহের আচরণ ও তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাই তিনি মিসতাহের সপক্ষে কথা বললে তার মা তাঁকে মদীনার অলিতে গলিতে অপবাদের যে তুফান চলছিল তা অবহিত করেন।[৩]

সামরিক ক্ষেত্রে অবদান

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী শরীআত রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও হেফাযতের দায়িত্ব নারীর কাঁধে অর্পণ করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীনকে বুলন্দ ও উন্নতশির করার আকাঙ্ক্ষা তাকে যুদ্ধের ময়দানে এনে শত্রুর

---

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬২।
২. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড পৃষ্ঠা-১৬৬।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ হাদীসুল ইফ্ক্।

www.bjilibrary.com

মুখোমুখী দাঁড় করে দিতো। পুরুষের পাশাপাশি সেও তখন কুফরের ঝাণ্ডাকে পদানত করার কাজে অংশ গ্রহণ করতো।

এক আনসারী মহিলা সাহাবা উম্মে আম্মারা রা. উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরুষের মতো সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। সা'দ ইবনে রাবীর কন্যা উম্মে সা'দ তাঁকে তাঁর এ কৃতিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা সবিস্তারে এভাবে বর্ণনা করেন ঃ আমি মুজাহেদীনের সেবা ও সহযোগিতার জন্য খুব সকালেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছি। প্রথমে মুসলমানরাই বিজয় লাভ করলো। কিন্তু পরে এ অর্জিত বিজয় হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা বিশৃঙ্খল ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। তখন আমি নবী সা.-এর কাছে গিয়ে তাকে রক্ষার জন্য তীর ও তরবারী চালাতে থাকলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমার ওপর শত্রুর আঘাত এসে পড়লো। উম্মে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আমি তাঁর কাঁধের ওপর গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে আপনাকে এমন কঠিন আঘাত করেছিল ? তিনি বললেন ঃ এ আঘাত করেছিল ইবনে কিমআহ। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন ; পরাজিত হয়ে মুসলমানরা নবী সা.-এর আশপাশ থেকে যখন সরে পড়লো তখন সে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসলো ঃ বললো, মুহাম্মদ (সা.) কোথায় ? এ যুদ্ধে সে বেঁচে গেলে আমার রক্ষা নেই। তাঁর জীবিত থাকা আমার জন্য ধ্বংস ও মৃত্যুর শামিল। একথা শুনে আমি নিজে, মুসআব ইবনে উমায়ের রা. এবং আরো কয়েকজন সাহাবা রা. তার মোকাবিলা করলাম। আমরা ক'জনই নবী সা.-এর পাশে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলাম। সম্মুখ মোকাবিলার এ মুহূর্তেই সে আমার ওপর আঘাত করে। সে আঘাতের ক্ষত চিহ্নই তুমি দেখতে পাচ্ছ। তরবারি দিয়ে আমিও তাকে কয়েকটি আঘাত করলাম। কিন্তু আল্লাহর দুশমন দু' দু'টি লৌহবর্ম দ্বারা তার দেহ সুরক্ষিত রেখেছিল।[১]

নবী সা.-এর প্রতিরক্ষায় যে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন নবী সা. নিজে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে ঃ

وما التفت يمينا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دونى.

"ডানে ও বামে যে দিকেই আমি তাকাচ্ছিলাম সেদিকেই দেখছিলাম উম্মে আম্মারা আমাকে রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়াই করছে।"

---

১. সীরাত ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা–২৯-৩০ এবং তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০১।

www.bjilibrary.com

তাঁর ছেলেকে একজন আহত করে ফেললো। সে যখন তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে ডেকে বললেন ঃ উম্মে আম্মারা, এ লোকটিই তোমার ছেলেকে আহত করেছে। সাথে সাথে উম্মে আম্মারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দিয়ে এতো জোরে তাকে আঘাত করলেন যে, সেখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। নবী সা. মুচকি হেসে বললেন ঃ উম্মে আম্মারা! তুমি তোমার ছেলের প্রতিশোধ নিয়েই ফেললে। উম্মে আম্মারা নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ এরপর আমরা তার ওপর অবিরাম তীর বর্ষণ করলাম এবং তাকে ধ্বংস করে ছাড়লাম। এ অবস্থা দেখে নবী সা. বললেন ঃ আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি তোমাকে তার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন, তোমার কলিজা ঠাণ্ডা করেছেন এবং তোমার ছেলের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ তোমাকে দিয়েছেন।

তিনি আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ এক বড় যোদ্ধা এগিয়ে এসে আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলো। আমি ঢাল দিয়ে তা ঠেকিয়ে ব্যর্থ করে দিলাম। যখন সে পেছন ফিরে পালাতে উদ্যত হলো তখন আমি তার ঘোড়ার উপর আক্রমণ করে তার পা কেটে ফেললাম। সে তখন চিৎ হয়ে পড়ে গেলো। নবী সা. সবকিছু দেখছিলেন। তিনি আমার ছেলেকে ডেকে বললেন ঃ উম্মে আম্মারার ছেলে, যাও তোমার মাকে সাহায্য করো। তখন সে দ্রুত এগিয়ে আসলো। তার সাহায্যে আমি তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিলাম।

সেদিন তাঁর সাহসিকতা ও দৃঢ়তা দেখে নবী সা. বলেছেন ঃ

لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان.

"নুসাইবা বিনতে কা'বের (উম্মে আম্মারা) আজকের দৃঢ়তা ও ধৈর্য অমুক ও অমুকের দৃঢ়তা ও ধৈর্য থেকে উত্তম প্রমাণিত হয়েছে।"

তাঁর এ সাহসিকতা ও হিম্মতের কথা ভেবে দেখুন। তাঁর শরীরে একটি দু'টি নয় বরং বর্শা ও তরবারির বারটি আঘাত লেগেছিল এবং ইবনে কিমআর আঘাত থেকে সৃষ্ট ক্ষত এতো গভীর ছিলো যে, তা সেরে উঠতে ও ভরাট হতে দীর্ঘ এক বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও উহুদ যুদ্ধের পরপরই মুশরিকদের মোকাবিলা করার জন্য নবী সা. হামরাউল আসাদ নামক স্থানে যাওয়ার আদেশ দিলে তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রচুর রক্ত ক্ষরণের কারণে তিনি এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, বাধ্য হয়েই যুদ্ধযাত্রা থেকে

বিরত থাকলেন এবং মদীনায় ফিরে গেলেন। হামরাউল আসাদ থেকে ফিরে নবী সা. নিজের বাড়ীতে যাওয়ার আগেই তাঁর খবর নিলেন। তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। উহুদ ছাড়াও তিনি খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধের দিন লড়াই করতে করতে তাঁর হাত শহীদ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও তরবারি ও বর্শার বারটি আঘাতের ক্ষত তাঁর শরীরে দেখা গিয়েছিল।[১]

রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধে ইকরামা বিন আবু জাহেলের স্ত্রী উম্মে হাকীমও শরীক হয়েছিলেন। আজনাদাইনের যুদ্ধে ইকরামা রা. শাহাদাত লাভ করলেন। এর কয়েক দিন পর 'মুরজে সিফার' নামক স্থানে খালেদ ইবনে সাঈদ রা.-এর সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের দ্বিতীয় দিনে খালেদ ইবনে সাঈদ ওলীমার আয়োজন করলেন। লোকজন তখনো খাওয়া দাওয়া শেষ করতে পারেনি। এমন সময় রোমানরা যুদ্ধের জন্য বুহ্য রচনা শুরু করে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলে নব বধুর শাজে সজ্জিতা উম্মে হাকীম তাঁর তাঁবুর একটি মোটা দণ্ড নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একাই শত্রু সেনাদের সাতজনকে হত্যা করেন।[২]

ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা.-এর হাতে নয়জন রোমানকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল।[৩]

উম্মে হারেস নাম্নী এক আনসারী মহিলার দৃঢ়তা ও সাহসিকতা দেখুন। হুনায়েনের যুদ্ধে ইসলামী সেনাবাহিনী পরাভূত হয়ে পড়লে কয়েকজন অসীম সাহসী বীর যোদ্ধার সাথে তিনিও পাহাড়ের মতো অটল হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন।[৪]

হযরত আনাস রা.-এর মা উম্মে সুলাইম রা. খঞ্জর বা ছুরি হাতে উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন।[৫] হুনায়েনের যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর কাছে খঞ্জর ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এভাবে সশস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ[৬]

---

১. এসব বিবরণের জন্য দেখুন তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০১-৩০৪। ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের কথা ইবনে আবদুল বার আল ইসতিআব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
২. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু উম্মে হাকীম।
৩. আল ইসাবা, ফী তামীযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৫।
৪. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু উম্মে হারেস রা.।
৫. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১১।
৬. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ গাযওয়াতুন নিসা মাআর রিজাল।

www.bjilibrary.com

اتخذته عندنا منى احد من المشركين بقرت به بطنه.

"আমি ছুরি সাথে রেখেছি এজন্য যে, কোনো মুশরিক আমার কাছে আসার দুঃসাহস দেখালে এ ছুরি দিয়ে তার পেট চিরে দেব।"

রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে খ্যাতি লাভকারী বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হাবীব ইবনে সালামাকে এক যুদ্ধের সময় তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, বলুন তো, আগামীকাল আপনি কোথায় থাকবেন ? জওয়াবে তিনি বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ ! শত্রুদের ব্যূহের অভ্যন্তরে অথবা জান্নাতে। জওয়াব শুনে স্ত্রীও পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বললো, এ দুটি জায়গার যেখানেই আপনি থাকেন না কেন, আমি আশা করি আমার অবস্থানস্থলও তাই হবে।[১]

খন্দক যুদ্ধের সময় নবী সা. মেয়েদের একটি দূর্গের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদীরা সুযোগের অপেক্ষায় দূর্গের চারদিকে সবসময় আনাগোনা করছিল এবং শেষ পর্যন্ত সুযোগ বুঝে এক ইহুদী দূর্গ প্রাচীরে উঠে পড়েছিল। মহানবী সা.-এর ফুফু হযরত সাফিয়া রা. দূর্গের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এ দেখে তিনি অগ্রসর হলেন এবং দুরভিসন্ধিকারী এ ইহুদীর মাথা কেটে দূর্গের পাদদেশে নিক্ষেপ করলেন, যেখানে ফিতনাবাজ অন্যান্য লোকেরা উপস্থিত ছিলো। এ দৃশ্য দেখে তারা একেবারে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়লো।

তারা বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন অপরিণামদর্শী নন যে, মেয়েদেরকে অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যাবেন। দূর্গের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনো সাহসী বীর পুরুষ আছে যে আমাদের সব ইচ্ছা পণ্ড করে দিতে সক্ষম।[২]

ইসলামের শত্রুদের ব্যর্থ করে দেয়ার কাজে নারী সরাসরি যতোটা অংশগ্রহণ করেছে পরোক্ষভাবে তার চেয়ে বেশী অংশগ্রহণ করেছে বাতিলের শক্তিসমূহের মোকাবিলার কাজে। সে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর না ছুঁড়লেও তীরন্দাজ হাতকে তীর যুগিয়েছে। সে তলোয়ার না চালালেও তলোয়ারধারী যোদ্ধাদের তলোয়ার চালানোর উপযুক্ত বানিয়েছে। আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো সৈনিক আহত হলে সে তার ক্ষত নিরাময়কারী মলমের ভূমিকা পালন করতো, মাটিতে পড়ে গেলে তাকে সাহায্য করতো এবং ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হলে তার জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ছুটতো।

১. আল বায়ান ওয়াত তাবাইয়ুন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭০।
২. মুসতাদরিক হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০ ও ৬০।

www.bjilibrary.com

রা'বী বিনতে মু'আওয়েয বর্ণনা করেছেন ঃ

كنا نغزوا مع النبى ﷺ فنسقى القوم ونخدمهم ومرد القتلى والجرحى الى المدينه.

"আমরা নবী সা.-এর সাথে লড়াইয়ের ময়দানে যেতাম। সেখানে আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং যুদ্ধে নিহত ও আহতদের মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।"[১]

নবী সা.-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরেকজন মহিলা সাহাবী বলেন ঃ

كنا نداوى الكلمى ونقوم على المرضى.

"আমরা আহতদের মলম লাগিয়ে পট্টি ও ব্যাণ্ডেজ করতাম, অসুস্থদের ঔষধ ও পথ্য দিতাম এবং সেবা করতাম।"[২]

উম্মে আতিয়া তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ

غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم فاصنع لهم الطعام واداوى الجرحى وأقوم على المرضى.

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। সেখানে আমি মুজাহিদদের জিনিসপত্র ও সাজ-সরঞ্জামের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতাম, তাদের খাবার তৈরী করতাম, আহতদের ঔষধ ও পথ্য দিতাম এবং অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম।"[৩]

উহুদ যুদ্ধে আহতদের মলম লাগানো, ব্যাণ্ডেজ করা এবং সেবার জন্য বহু সংখ্যক মহিলা সাহাবী যুদ্ধের পর মদীনা থেকে সেখানে গিয়েছিলেন। তাবরানী বর্ণনা করেন ঃ

لما كان يوم احد وانصرف المشركون خرج النساء الى الصحابة يعينونهم فكانت فاطمة فى من خرج.

"উহুদ যুদ্ধের দিন (যুদ্ধের পরে) মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সাহাবাদের সাহায্য করার জন্য মেয়েরা বেরিয়ে পড়লো। হযরত ফাতেমা রা.-ও তাদের মধ্যে ছিলেন।"

---

১. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ রাদ্দুন নিসায়েল জারাহি ওয়াল কাতলা।
২. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সায়র, অনুচ্ছেদ ঃ আন নিসাউল যাসিয়াত ...। মুসনাদে আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৪ বর্ণনার ভাষা মুসলিমের।
৩. ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৬।

www.bjilibrary.com

এ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হলে হযরত ফতেমা রা. চাটাই পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে ক্ষতস্থান ভরাট করেছিলেন।[১]

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত আয়েশা রা. এবং উম্মে সুলাইম রা.-ও মুজাহিদদের সেবা করেছিলেন।

لقد رأيت عائشة بنت ابى بكر وام سليم وانهما المشمرتان ارى خدم سوقهما تنقران القرب على مترنهما ثم تفرغانه فى افواه القوم ثم ترجعان فتملانهم اثم تجيئان فتفرغانه فى اقواه القوم.

"আমি আবু বকরের কন্যা আয়েশা রা. এবং উম্মে সুলাইম রা. উভয়কে প্রস্তুত হয়ে মানুষের সেবা করতে দেখলাম। তাঁরা এতো দ্রুত এ তৎপরতা চালাচ্ছিলেন যে, আমি তাদের পায়ে পরিহিত মল বা খাড়ুসমূহ দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা মশকে পানি ভরে তা কাঁধে বহন করে আনছিলেন এবং মুজাহিদদের পান করাচ্ছিলেন। তারপর ফিরে গিয়ে আবার ভর্তি করে আনছিলেন এবং মুজাহিদদের পিপাসা নিবৃত্ত করছিলেন।"[২]

উম্মে সালিত নামক একজন আনসারী মহিলা সম্পর্কে হযরত উমর রা. বলেন ঃ

انها كانت تزوفولنا القرب يوما احد.

"উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি আমাদের মশক ভর্তি করে পানি এনে দিচ্ছিলেন।"[৩]

হামনা বিনতে জাহাশও সেদিন এ কাজ করেছেন। ইবনে সা'দ লিখেছেন ঃ

وقد كانت حضرت احدا تسقى العطش وتداوى الجرحى.

"তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পিপাসার্তদের পানি পান করাতেন এবং আহতদের চিকিৎসা ও সেবা করতেন।"[৪]

উম্মে আয়মানের জীবন কথা আলোচনা করতে গিয়েও ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন ঃ

---

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, গাযওয়াতু উহুদ, অনুচ্ছেদ ঃ মা আসাবান নাবী স. মিনাল জারাহি ইয়াওমা উহুদ।

২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী গাযওয়াতুল উহুদ, অনুচ্ছেদ ঃ ইয হাম্মাত তায়িফাতানে ....। মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সায়েব।

৩. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ হামলুন নিসায়েল কিরাব।

৪. আত তাবকাতুল কাবীর, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫।

www.bjilibrary.com

وقد حضرت ام ايمن احد وكانت تسقى الماء وتداوى الجرحى وشهدت خيبر مع رسول الله ﷺ.

"উম্মে আয়মান উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি যোদ্ধাদের পানি পান করাতেন এবং আহতদের মলম লাগিয়ে পট্টি ও ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়ার কাজ করছিলেন। তিনি নবী সা.-এর সাথে খায়বারেও গিয়েছিলেন।[১]

উম্মে আম্মারা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

خرجت معهم بشن لها فى اول النهار تريدان تسقى الجرحى (وقال ابنه) ومعها عصائب فى حقويها قد اعدتها للجراح .. فربطت جرحى.

"আহতদের (সাহায্য করতে এবং) পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম বাহিনীর সাথে খুব সকালেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেছিলেন। (তাঁর ছেলে বলেছেন) তিনি আহতদের মলম ও পট্টি বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র ও কাপড়-চোপড় প্রস্তুত করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমার একটি ক্ষতেও পট্টি বেঁধে দিয়েছিলেন।"[২]

খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক লিখেছেন ঃ

وقد شهد خيبر مع رسول الله نساء من نساء المسلمين.

"বহু মুসলিম মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।"[৩]

হাশরাজ ইবনে যিয়াদের দাদী এবং আরো পাঁচজন মহিলাও এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। নিম্নোক্ত ভাষায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার যুদ্ধক্ষেত্রে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছিলেন ঃ

يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر وكعين به فى سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسق السويق.

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা এজন্য এসেছি যে, আমরা পশমী কাপড় বুনবো এবং তা দ্বারা আল্লাহর পথে সাহায্য করবো। আমাদের কাছে আহতদের জন্য ওষুধ আছে। আমরা তীরন্দাজদের তীর যুগিয়ে সাহায্য করবো এবং প্রয়োজনে মুজাহিদদের ছাতু গুলিয়ে খাওয়াবো।"[৪]

খায়বারের যুদ্ধেই আবু রাফে'র স্ত্রী সালমা[১] আশহাল গোত্রের এক

১. আত তাবকাতুল কাবীর, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৩।
২. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০১ ও ৩০২।
৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৫।
৪. আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ফিল-মারআতে ওয়াল আবদে ইয়াখদিমান

www.bjilibrary.com

মহিলা উম্মে 'আমের'[২] এক আনসারী মহিলা উম্মে খালা এবং কু'আইবা[৩]. বিনতে সা'দেরও অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এর চেয়েও বড় কথা হলো, তারা বাইরের কোনো চাপে এসব কাজ করতেন না। বরং দীনের প্রতিরক্ষাকারীদের সাহায্য-সহযোগিতা দান, মর্যাদাপূর্ণ কাজ মনে করে স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেদের সেবা ও খেদমত পেশ করতেন। খায়বারের যুদ্ধকালীন একটি ঘটনা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধ যাত্রার মুহূর্তে গিফার গোত্রের কয়েকজন মহিলা এসে বললো ঃ

انا نريد يا رسول الله ﷺ ان نخرج معك الى وجهك هذا فنداوى الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا.

"হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার সাথে আমরাও এ পবিত্র সফরে যেতে চাই। যাতে আমরা আহতদের চিকিৎসা ও সেবা এবং আমাদের সাধ্যমত মুসলমানদের সাহায্য করতে পারি।"

কোনো কোনো মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও এসব সেবাকার্য চালাতেন। উদাহরণস্বরূপ আসলাম গোত্রের রুফাইদা নাম্নী এক মহিলা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন। ঃ

كانت امرأة تداوى الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمته من كانت به ضيعة من المسلمين۔

"তিনি আহতদের ওষুধ দেয়া ও পট্টি বাঁধার কাজ করতেন এবং যেসব মুসলমানের সেবা যত্ন ও ভালোমত তত্ত্বাবধান না হলে মারা যাওয়ার আশংকা থাকতো এরূপ সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী মুসলমানদের সেবা-যত্ন ও দেখাশোনা করতেন।"

তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি মসজিদে নববীতে একটি তাঁবু খাটিয়েছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রা. আহত হলে নবী সা. তাঁকেও রুফাইদার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সহজেই তিনি তাঁর সেবা-যত্ন করতে পারেন।

দীনের প্রতিরক্ষা ও এ ব্যাপারে উৎসাহ দান

তরবারি ও বর্শার দ্বারা নারীরা যেভাবে দীনের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, তেমনি কথা ও বক্তৃতার মাধ্যমেও তারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

১. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব।
২. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৪।
৩. ঐ

www.bjilibrary.com

সত্যের সাহায্য ও সহযোগিতায় তারা তরবারিও উত্তোলন করেছেন এবং বাকশক্তিও কাজে লাগিয়েছেন। তাদের আবেগময় ও উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতা বিবৃতি আল্লাহর পথে বহু লোকের মরা ও বাঁচা এবং জীবনের সব মূল্যবান সম্পদ বিলিয়ে দেয়া সহজ করে দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব সম্পর্কে ইবনে আবদুল বার লিখেছেন ঃ

وكانت بعد تعضد النبى ﷺ بلسانها وتحضّ ابنها على نصرته والقيام بامره.

"ঈমান আনার পর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন এবং তাকে সাহায্য করা এবং তাঁর লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য নিজের ছেলেকে উৎসাহিত করতেন।"[১]

তাঁর ছেলে তুলাইব রা. মক্কার প্রাথমিক যুগেই ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কয়েকজন সাহাবার সাথে নামায পড়ছিলেন। তুলাইব রা.-ও তাদের মধ্যে ছিলেন।[২] এ সময় আবু জাহেল, আবু লাহাব, উকবা এবং আরো কতিপয় নির্বোধ হঠাৎ আক্রমণ করে বসে এবং গালমন্দ করতে শুরু করে। সাহাবারাও পূর্ণ শক্তিতে তাদের ঈমান প্রকাশ করতে থাকেন এবং প্রতিরোধ করতে থাকেন। তুলাইব রা. অগ্রসর হয়ে আবু জাহেলকে আহত করে ফেলেন। তাই মুশরিকরা তাকে ধরে নিয়ে বেঁধে ফেলে। জনৈক ব্যক্তি আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের কাছে এ খবর পৌঁছে দেয়। সে তাকে বলে যে, তোমার ছেলের নির্বুদ্ধিতা দেখেছো। মুহাম্মদ-এর পাল্লায় পড়ে সে আজ মানুষের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

একথা শুনে আরওয়া জওয়াব দেন ঃ

خير ايام طليب يوم يذب عن ابن خاله وقد جاء بالحق من عند الله تعالى

"তুলাইব যেদিন তার মামাতো ভাইয়ের প্রতিরক্ষার জন্য দাঁড়ায় সেটিই তাঁর জীবনের সর্বোত্তম দিন। কারণ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন। (তাই তাঁর প্রতিরক্ষা সত্যেরই প্রতিরক্ষা)।"[৩]

---

১. আল-ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, রুফাইদা সম্পর্কে আলোচনা ; ইমাম বুখারী। তাঁর আল আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থের ২১৩ ও ২১৪ পৃষ্ঠায় "কায়ফা আসবাহাত" অনুচ্ছেদে বিষয়টির আলোচনা করেছেন। তাবকাতে ইবনে সা'দ গ্রন্থে রুফাইদার স্থলে কুয়াইবার নাম উল্লেখিত হয়েছে। ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৩।

২. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব।

৩. মুসতাদরিক, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫২।

www.bjilibrary.com

উহুদ যুদ্ধক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. আহত হলে তার মা উম্মে 'আম্মারা ক্ষতস্থানে মলম লাগালেন ও পট্টি বেঁধে দিলেন এবং কলিজার টুকরা পুত্রের কষ্ট দেখে তাঁকে আরাম করা বা ক্লান্তি দূর করার পরামর্শ দেয়ার পরিবর্তে নির্দেশ দিলেন ঃ

انهض بنى فضارب القوم.

"বেটা ওঠো, তরবারি নিয়ে এ মুশরিক কওমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।"[১]

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা উহুদ যুদ্ধের শহীদদের বিরুদ্ধে কবিতা পড়লে হিন্দা বিনতে আসাসা তৎক্ষণাৎ কবিতার মাধ্যমেই তাঁর জবাব দিলেন।[২]

হযরত খানসা তাঁর চারটি সন্তানকে সাথে নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। রাতের প্রারম্ভেই তিনি চারটি সন্তানকে একত্র করে বললেন ঃ হে আমার সন্তানেরা ! তোমরা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ঈমান গ্রহণ করেছো এবং কারো জোর-জবরদস্তি ছাড়াই হিজরত করেছো। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মা যেমন এক তেমনি তোমাদের বাপও এক। কারণ, তোমাদের মা তোমাদের বাপের সাথে যেমন খেয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি, তেমনি তোমার নানার পরিবারকেও লাঞ্ছিত করেনি। তোমার মায়ের বংশে যেমন কলংক লেপন করেনি তেমনি তোমার বাপের বংশকেও কলুষিত করেনি। (অর্থাৎ তোমরা এক মর্যাদাবান ও পবিত্র মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করেছো। তাই তোমাদের কাজ কর্মও ভদ্র ও মর্যাদাবান মানুষের মত উন্নত হওয়া উচিত।) তোমরা জানো, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা কি পরিমাণ পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। ভাল করে বুঝে নাও, এ নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর চেয়ে আখেরাত বা চিরস্থায়ী জগত অনেক উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

"হে ঈমানদারগণ ! ধৈর্য অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করো, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে কাজ করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো যাতে সফলকাম হতে পারো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০

যদি আল্লাহর মর্জি হয় এবং ভোর পর্যন্ত তোমরা সুস্থ ও নিরাপদ থাকো তাহলে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে করতে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার সাথে শত্রুর মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়ো। আর যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০২।
২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১-৪২।

www.bjilibrary.com

এবং যুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকবে তখন তোমরা নির্ভয়ে ও নিঃশংকচিত্তে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো। যখন শত্রুসেনারা পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আবেগের সাথে লড়াইয়ে মত্ত হবে তখন তোমাদের লক্ষ হবে তাদের নেতা ও সেনাপতি। এভাবে যেমন তোমরা গণিমতও লাভ করতে সক্ষম হবে তেমনি জান্নাতের সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে ফিরে আসবে।

মায়ের মুখ থেকে এ দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে চার ছেলেই সমর সংগীত গাইতে গাইতে নির্ভিকচিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হলো। এরপর তাদের দেহ রক্ত রঞ্জিত অবস্থায়ই কেবল পাওয়া গিয়েছিল।[১]

হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-কে অবরোধ করে রাখার সময় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর দশ হাজার সংগী তাঁকে ছেড়ে হাজ্জাজের সাথে চলে যায়। এমনকি তাঁর দুই ছেলে হামযা এবং খুবায়েবও আশ্রয়প্রার্থী হয়ে হাজ্জাজের কাছে চলে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. তাঁর মা আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর কাছে গিয়ে নিজের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, অন্যরা তো বটেই আমার নিজের ছেলেরা পর্যন্ত আমার পক্ষ ত্যাগ করে চলে গেছে। এখন আমার সাথে আছে মাত্র হাতেগোণা কয়েকজন লোক যারা বেশী সময় হাজ্জাজের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে সক্ষম হবে না। এখনও যদি আমি হাজ্জাজের হাতে হাত মিলাই তাহলে এ দুনিয়ার যে নিয়ামত চাইবো তাই পেতে পারি। এখন আপনার মতামত আমাকে জানান। জবাবে মা বললেন ঃ

يابنى انت اعلم بنفسك ان كنت تعلم انك على حق وتدعوا الى حق فاصبر عليه فقد قتل عليه اصحابك ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان بنى امية وان كنت تعلم انك انما اردت الدنيا فلبئس العبد انت اهلكت نفسك واهلكت من قتل معك وان كنت على حق فما وهن الدين والى كم خلودك فى الدنيا.

"হে বেটা! তুমি নিজেকে সবার চেয়ে ভালো করে জানো। তুমি নিজেকে যদি সত্যিই হকের অনুসারী বলে মনে করো এবং হকের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে থাকো তাহলে ধৈর্য অলম্বন করো। দেখো, তোমার বহু সংগী সাথী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে। তাই নিজেকে খেলনা বানিয়ে বনী উমাইয়ার ছোকড়াদের হাতে তুলে দিও না, যা নিয়ে তারা খেলতে থাকবে। তবে তুমি যদি মনে করো, এসব কিছুই

১. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু খানসা বিনতু আমর ইবনে শাদীদ।

www.bjilibrary.com

তুমি দুনিয়ার স্বার্থের জন্য করেছো তাহলে তুমি দুনিয়ার নিকৃষ্টতম মানুষ। কারণ, এভাবে তুমি নিজেও ধ্বংস হলে এবং তোমার সাথে থেকে যারা জীবন দিল তাদেরকেও অযথা ধ্বংস করলে। আর যদি তুমি ন্যায় ও সত্যের অনুসারী হয়ে থাকো তাহলে এজন্য জীবন দেয়া উত্তম কাজ। কারণ, এ জীবন যখন একদিন নিঃশেষ হবেই তাহলে তা আল্লাহ্র পথে হবে না কেন ? দীনকে দুর্বল করে তুমি চিরস্থায়ী তো হতে পারবে না।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. মায়ের এ ইচ্ছা ও আবেগ সমর্থন করলেন এবং হাজ্জাজের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে শাহাদাত লাভ করলেন।[১]

সত্যের প্রকাশ

নারীগণ শুধু নিজেদেরকেই ন্যায় ও সত্যের ওপর দৃঢ়পদ রাখার চেষ্টা করেনি; বরং সমাজের যেখানেই তারা কোনো বিপর্যয় ও অবক্ষয় দেখেছেন সেখানেই তার পরিবর্তন ঘটিয়ে সে স্থানে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সাধনা করেছেন। সামরা বিনতে নাহীক রা. সম্পর্কে ইবনে আবদুল বার রা. লিখেছেন ঃ

كانت تمرّ فى الاسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذالك بسوط كان معها.

"তিনি বাজারে ঘোরাফেরা করে ভাল কাজের আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজে বাধা দিতেন। তিনি হাতে একটি কোঁড়া রাখতেন এবং তা দিয়ে মন্দ কাজে লিপ্ত লোকদের প্রহার করতেন।"[২]

এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার নারী সমাজ রাজা ও প্রজা বা শাসক ও শাসিত কারো পরোয়া করেননি। তাদের ঈমানী আবেগ যেভাবে প্রকাশ্য দুশমনের মোকাবিলা করেছে তেমনি ইসলামের অনুসারীদের চিন্তা ও কর্মের বিপর্যয়ও মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ন্যায় ও সত্যের বাণীকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অতি বড় বাতিল শক্তিও যেমন তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। তেমনি অত্যাচারী ও কঠোর শাসকদের অত্যাচার এবং বাড়াবাড়িও তাদের দমাতে পারেনি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-কে শুলিবিদ্ধ করার পর হাজ্জাজ তাঁর মা আসমার কাছে গিয়ে বললো ঃ আপনার ছেলে আল্লাহর ঘরে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার প্রসার ঘটিয়েছিল। পরিণামে আল্লাহ্ তাকে এ কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত আসমা রা. বললেন ঃ

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩০।
২. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতুল সামরা বিনতু নাহীক রা.।

www.bjilibrary.com

كذبت كان برابالوالدين صوّاما قواما والله لقد اخبرنا رسول اللّه ﷺ انه سيخرج من ثقيف كذّابان الاخر منهما شر من الاول وهو مبير.

"তুমি মিথ্যা বলেছো। (সে বে-দ্বীন ছিল না) সে পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করতো, বেশী করে রোযা রাখতো, অধিকমাত্রায় তাহাজ্জুদ পড়তো। (প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজেই তার ওপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি করেছো) আল্লাহর শপথ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছিলেন ঃ সাকীফ গোত্রে দু'জন মিথ্যাবাদী জন্মলাভ করবে। এ দু'জনের পরবর্তীজন পূর্ববর্তীজনের চেয়ে অধিক অত্যাচারী হবে। (সাকীফ গোত্রের প্রথম মিথ্যাবাদী মুসায়লামা কায্যাবকে তো আমি ইতিপূর্বেই দেখেছি। আর দ্বিতীয় মিথ্যাবাদী হচ্ছো তুমি)।"[১]

সুমাইয়া নাম্নী একজন ক্রীতদাসী ছিল। জাহেলী যুগে তার মনিব তাকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাতো। হযরত মুআবিয়ার যালেম ও স্বেচ্ছাচারী প্রাদেশিক গভর্নর যিয়াদ ছিল তারই গর্ভজাত সন্তান। সাধারণভাবে বেশ্যাদের সন্তানের যেমন মাতৃ বা পিতৃ পরিচয় থাকে না ঠিক তেমনি যিয়াদেরও কোনো পিতৃ পরিচয় ছিল না। সে পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান বলেই মশহুর ছিল। হযরত মুআবিয়ার সামনে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য পেশ করলো যে, জাহেলী যুগে সুমাইয়ার সাথে একবার আবু সুফিয়ান এর যৌন মিলন হলেই এ সন্তান জন্মলাভ করেছিল। এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হযরত মুআবিয়া রা. তাকে আবু সুফিয়ানের সন্তান এবং নিজের ভাই বলে গ্রহণ করেন। এতে যিয়াদ অত্যন্ত খুশী হয়। সে চাচ্ছিলো মুসলিম উম্মার বড় বড় মনীষী ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গও এ বিষয়টির স্বীকৃতি দিক। তাই সে হযরত আয়েশা রা.-কে একখানা পত্র লিখেছিল। পত্রের শিরোনাম ছিল ; "আবু সুফিয়ানের পুত্র যিয়াদের পক্ষ থেকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর নামে।" হযরত আয়েশা রা. এ অ-ইসলামী কাজটিকে কিভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারেন ? তিনি না হযরত মুআবিয়ার সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখালেন, না যিয়াদের মতো কঠোর ও অত্যাচারী গভর্নরের পরোয়া করলেন। তিনি পত্রের উত্তর লিখতে গিয়ে প্রথমেই লিখলেন ঃ "উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার পক্ষ থেকে পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান যিয়াদের নামে।"[২]

---

১. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫১।
২. তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা....। তাবকাতে ইবনে সা'দ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১ এবং তারীখে ইবনে আসাকির, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১১ থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা রা. একজন অভাবী লোকের অভাব পূরণ করার জন্য সুপারিশ করে যিয়াদকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি

www.bjilibrary.com

সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপদেশ দান ও তার ফলাফল

সমালোচনা ও সহযোগিতা কেবল তখনই উপকারী ও ফলপ্রসূ হতে পারে যখন তার পেছনে সদুদ্দেশ্য ও কল্যাণকামিতার মানসিকতা কার্যকর থাকে। কারো কাজের সমালোচনা করা হোক বা সমর্থন ও সহযোগিতা করা হোক উভয় অবস্থায় ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের উদ্দেশ্য না থাকা উচিত। তা না হলে সহযোগিতা করাতে যেমন কোনো উপকার হয় না তেমনি প্রত্যাখ্যান বা প্রতিরোধেও কোনো উপকার পাওয়া যায় না। মুসলিম নারী সমাজ যা কিছু বলেছেন ও করেছেন তা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধে উঠে নিছক ইসলামী জীবন বিধান ও রাষ্ট্রের স্বার্থেই বলেছেন এবং করেছেন।

ইসলামী জীবন বিধানের লাভ ও ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য রাখা তার জন্য সব রকমের ত্যাগ ও কুরবানী এবং সর্বাপেক্ষা কঠোর ও প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে দৃঢ়তা মুসলিম নারীর এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা তার সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে সবরকম সন্দেহের ঊর্ধে তুলে ধরে এবং কেউ-ই তাকে ইসলামী বিধান ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দুশমন ও বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করতে পারেনি। সে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করেছে তাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং প্রবৃত্তির খায়েশ বলে অভিহিত করা হয়নি ; বরং তাকে সততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা-সাধনা মনে করে অভিনন্দন ও স্বাগত জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো বটেই রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গও তাঁর সমালোচনা ও উপদেশকে সম্মানের চোখে দেখেছে এবং তা থেকে উপকৃত হয়েছে।

হযরত মুআবিয়া রা. হযরত আয়েশাকে লিখেছিলেন যে, আমাকে অল্প কথায় এমন কিছু উপদেশ দিন (যা আমি সবসময় সামনে রাখতে পারি) তাই হযরত আয়েশা রা. তাঁকে নীচে উদ্ধৃত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত কার্যকর এ বাণীটি লিখে পাঠান যা শাসনদণ্ডের অধিকারীদের পথনির্দেশনা দিতে সক্ষম।

من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس.

যিয়াদকে আবু সুফিয়ানের পুত্র বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে উপরোল্লিখিত বিস্তারিত বর্ণনাটি আমরা আল্লামা ইবনুল আসীরের গ্রন্থ তারীখে কামেল এর ৩য় খণ্ডের ১৯২ পৃষ্ঠা থেকে গ্রহণ করেছি। ইবনুল আসীর এ ঘটনাটির ব্যাপক সমালোচনা ও পর্যালোচনার পর যুক্তি ও ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত অংশটুকুই কেবল পেশ করেছেন। আধুনিক কালের মিশরীয় ঐতিহাসিক শায়খ মুহাম্মদ খিদরীও ইবনুল আসীরের গবেষণাকেই তাঁর গ্রন্থ মুহাদিরাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়া'র ৪৭৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন।

www.bjilibrary.com

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (মানুষ তার কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। কারণ) আল্লাহ্ তাআলা তাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেন। (আর সেক্ষেত্রে মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে সে সরকার পরিচালনা করে)।"[১]

এক সময়ের ঘটনা। হযরত উমর রা. কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে খাওলা বিনতে সা'লাবার সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে তিনি হযরত উমর রা.-কে উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

'উমর! এক সময় ছিল, যখন আমি তোমাকে উকাযের মেলায় দেখেছিলাম। তুমি ডাণ্ডা হাতে ছোট ছোট বাচ্চাদের ধমকাতে ও ভয় দেখিয়ে বেড়াতে। সে সময় তুমি ছিলে খুব ছোট। অল্প বয়সের কারণে লোকে তোমাকে উমায়ের বলে ডাকতো। এরপর (খুব দ্রুত তুমি যৌবনে উপনীত হলে আর) লোকেরা তোমাকে উমর বলে ডাকতে শরু করলো। এ অবস্থায়ও খুব বেশীদিন যায়নি। এখন তোমাকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। (চিন্তা করে দেখো, মহান আল্লাহ তোমাকে কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছিয়েছেন। এখন তাই জনসাধারণের সাথে তোমার স্বভাবগত কঠোর আচরণ করো না। বরং) জনসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর আযাবের ভয় থাকে সে কিয়ামতকে দূরে মনে করতে পারে না। আর যার মনে মৃত্যুর ভয় আছে (সে বেপরোয়া ও লাগামহীন জীবন যাপন করতে পারে না)। সে বরং সবসময় নেকী করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত থাকে।

সে সময় হযরত উমর রা.-এর সাথে ছিলেন জারুদ আবদী। তিনি খাওলাকে বললেন ঃ তুমি তো দেখছি আমিরুল মু'মিনীনকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপদেশ দিতে শুরু করলে। হযরত উমর রা. তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ তাঁকে বলতে দাও। তুমি কি জানো না, তিনি খাওলা বিনতে সা'লাবা।[২]

একবার হযরত উমর রা. বললেন ঃ মোহরানার পরিমাণ কম করে নির্ধারণ করো। এক মহিলা এর প্রতিবাদ করে বললেন ঃ একথা বলার অধিকার তোমার নেই। কারণ, কুরআন বলছে ঃ "তোমরা যদি স্ত্রীদেরকে মোহরানা হিসেবে অঢেল অর্থও দিয়ে থাকো তাহলে তা থেকে সামান্য পরিমাণ অর্থও ফেরত নেবে

১. তিরমিযী আবওয়াবুয যুহদ, অনুচ্ছেদ ঃ শিরোনাম বিহীন।
২. আল-ইসতিআব, ইবনে আবদুল বার, তাযকিরাতু খাওলা বিনতু সা'লাবা রা.।

www.bjilibrary.com

না।" এ থেকে জানা যায় যে, মোহরানার পরিমাণের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। হযরত উমর রা. তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে বললেন ঃ একজন মহিলা উমরের বিরুদ্ধে বিতর্কে জয়লাভ করলো।[১]

কোনো কোনো সময় এ ধরনের সমালোচনা অত্যন্ত ফলদায়ক এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য খুবই কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে।

সিফ্ফীনের যুদ্ধে সাওদা বিনতে আম্মার হযরত মুআবিয়া রা.-এর বিরুদ্ধে হযরত আলী রা.-এর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। হযরত আলী রা.-এর শাহাদাত লাভের পরের ঘটনা। তিনি এক সময় হযরত মুআবিয়ার কাছে গেলেন। প্রথমে অতীতে যা কিছু ঘটে গিয়েছে সে জন্য ক্ষমা চাইলেন। তারপর বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সবার নেতা এবং তাদের সমস্ত ব্যাপারে দায়িত্বশীল ও তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর তাদের যেসব অধিকার ফরয করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি আপনাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন। এমন সব লোক আমাদের কাছে গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসেন যারা আপনার আধিপত্য ও ক্ষমতা সুসংহত ও ব্যাপক করার সাথে সাথে আমাদেরকে ক্ষেতের ফসলের মতো কেটে ফেলে দেয় এবং গরুর মতো পদদলিত করে। তারা আমাদের অধিকারসমূহ ঠিকমত দেয় না। আমাদেরকে তারা নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জিনিসের স্বাদ চাখায়। আর বড় থেকেও বড় এবং উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর বস্তু আমাদের কাছে দাবী করে। দেখুন! ইবনে আরতাহ শাসক হয়ে এসেই আমাদের গোত্রের লোকজনের রক্ত বইয়ে দিতে থাকে এবং আমার অর্থ সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। আপনার আনুগত্য আমাদের জন্য ফরয। তা না হলে আমাদের মধ্যে এতোটা শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অবশ্যই আছে যা দিয়ে আমরা যে কোনো যুলুমের মোকাবিলা করতে পারি। আপনি তাকে পদচ্যুত করলে আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। অন্যথায় আমরা আপনাকেও দেখে নেব। হযরত মুআবিয়া রা. বললেন ঃ তুমি কি আমাকে তোমার কওমের ভয় দেখাচ্ছো ? আল্লাহর শপথ! আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে কন্টকপূর্ণ বাহনে বসিয়ে তার কাছে ফেরত পাঠাবো যাতে তোমার ব্যাপারে সে তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। একথা শুনে সাওদা চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি কবিতার দু'টি ছত্র আবৃত্তি করলেন যার অর্থ হলো ঃ

"আল্লাহ তাআলা সেই পবিত্র আত্মার ওপর রহমত নাযিল করুন যাকে একটি কবর তার কোলে আশ্রয় দিয়েছে আর যার সাথে ন্যায় এবং ইনসাফও সমাহিত হয়েছে। তিনি ন্যায় ও সত্যের সাথে এ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তার

---

১. ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

বিনিময়ে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ অর্জন করবেন না। এভাবে তার মধ্যে সত্য ও ঈমানের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল।”

হযরত মুআবিয়া রা. জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই লোকটি কে ? সাওদা বিনতে আম্মার বললেন ঃ তিনি হচ্ছেন আলী ইবনে আবু তালিব রা.। হযরত মুআবিয়া রা. বললেন ঃ ন্যায় ও ইনসাফের কোনো প্রমাণ তো তোমার মধ্যে দেখছি না। তিনি বললেন ঃ প্রমাণ ছাড়াই আমি একথা বলছি না। আমার কাছে তাঁর ইনসাফের প্রমাণ আছে। একদিন আমি তাঁর এক সাদকা আদায়কারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি সে সময় নামায পড়ছিলেন। নামায শেষে প্রীতিপূর্ণ ভঙ্গিতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে ? আমি যাকাত ও ট্যাক্স আদায়কারীর যুলুমের কথা বললে তিনি কাঁদতে থাকলেন এবং আসমানের দিকে হাত তুলে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি জানো, আমি আমার গভর্নরদের তোমার সৃষ্টির ওপর যুলুম-অত্যাচার করতে এবং তোমার অধিকারসমূহ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেইনি। পরক্ষণেই পকেট থেকে এক টুকরা চামড়া বের করলেন এবং তাতে তার পদচ্যুতির ফরমান লিখলেন। এ ব্যাপারে কোনো বিলম্ব করতে চাইলেন না। তাই আপনার সরকারেরও এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া উচিত যাতে কারো ওপর কোনো রকম যুলুম-অত্যাচার হতে না পারে।

হযরত মুআবিয়া রা. তাঁর প্রতি ন্যায় ও ইনসাফ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ন্যায় ও ইনসাফ কি শুধু আমার জন্য নির্দিষ্ট না আমার কওমও তার অংশীদার হবে ? হযরত মুআবিয়া রা. বললেন ঃ অন্যদের ইনসাফ দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন ? তিনি বললেন ঃ ইনসাফ হলে সবার সাথে হতে হবে। অন্যথায় তা হবে এক জঘন্য ও নিন্দনীয় ব্যাপার। একজনের সাথে ইনসাফ করা হবে আর অন্যদের ওপর যুলুম-অত্যাচার চলতে থাকবে তা হতে পারে না। আপনি যদি আমার পুরো গোত্রের সাথে ইনসাফ করতে না পারেন তাহলে আমার একার ইনসাফের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার গোটা কওম যে দুর্বিসহ অবস্থায় পড়ে আছে আমিও সেভাবেই থাকবো।

হযরত মুআবিয়া রা. বলেন ঃ আবু তালিবের পুত্র তোমাকে অত্যন্ত সাহসী বানিয়ে দিয়েছে। এরপর তিনি অধীনদের বললেন ঃ গভর্নরকে লিখে পাঠাও যেন তার সব দাবী পূরণ করা হয়।

একইভাবে ইকরামা বিনতে আতরাশও মুআবিয়া রা.-এর দরবারে তাঁর গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাজির হলেন এবং নির্ভিকচিত্তে বললেন ঃ ইতিপূর্বে আমাদের ধনী ও সম্পদশালীদের থেকে যাকাত উসূল

www.bjilibrary.com

করা হতো এবং আমাদের দরিদ্রদের মধ্যে তা বণ্টন করা হতো। কিন্তু বর্তমানে না দুর্দশাগ্রস্তের দুর্দশা দূর হয়, না অভাবীদের অভাব মোচন হয়। এসব যদি আপনার ইংগিতে ও পরামর্শে হয়ে থাকে তাহলে আপনার ব্যক্তিত্বের কাছে এটা আশা করাই স্বাভাবিক যে, সতর্ক করে দেয়ার সাথে সাথে আপনি সাবধান হয়ে যাবেন এবং তাওবা করবেন। আর এ ব্যাপারে যদি আপনার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের কোনো ভূমিকা না থাকে ; বরং গভর্নরদের নিজেদের পক্ষ থেকে এসব যুলুম ও বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে (তাহলে তাও আপনার মত দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী যে,) আপনি বিশ্বস্ত লোকদের বাদ দিয়ে খিয়ানতকারী তথা বিশ্বাসভংগকারীদের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন এবং যালেমদের জনসেবার আদেশ দিবেন। হযরত মুআবিয়া রা. অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন যে, কখনো কখনো এমন খারাপ পরিস্থিতি দেখা দেয় যে, আইনানুসারে কাজ করলে ক্ষতির আশংকা থাকে। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! আপনি এ কোন্ ধরনের কথা বলছেন ? মহাজ্ঞানী আল্লাহ আমাদের জন্য এমন জিনিস ফরযই করেননি যার ওপর আমল করলে অন্যদের ক্ষতি হবে।

অবশেষে হযরত মু'আবিয়া সেই গোত্রের যাকাত সেই গোত্রের লোকদের মধ্যেই বণ্টন করার এবং তার প্রতি ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার ফরমান জারী করলেন।[১]

এ নারীর সাহসিকতা ও হিম্মতের প্রতি লক্ষ করুন। কিভাবে পৃথিবীর সর্বাধিক ক্ষমতাধরদের সামনে নির্ভিকচিত্তে সত্যকে প্রকাশ করা হচ্ছে। এর কারণ হলো, যে জীবনবিধানের প্রতি তিনি ঈমান পোষণ করেন, যে জীবন আদর্শকে সঠিক ও নির্ভুল বলে মনে করেন এবং যে আলোর সাহায্যে তিনি কুফর ও বাতিলের গভীর অন্ধকারের মধ্যে পথ চিনে চলেন, বাতিলের অন্ধকার রাতকে তিনি তাঁর ওপর দখল জমাতে ও আধিপত্য চালাতে দেবেন তা একেবারেই অসম্ভব। সত্যিই যদি তিনি এর অনুমতি দেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে নিজের দীন ঈমানের মৃত্যুর ঘোষণাই দান করেন। তার ঈমান যে দৃঢ় সংকল্পের দাবী করে সে দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছাকে তিনি অস্বীকার করেন এবং নিজের প্রভু, নিজের সমাজ ও খোদ নিজের বিবেকের সাথে যে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারে তিনি আবদ্ধ সে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পালন এবং কল্যাণ কামনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তাই সমাজে বাতিলের জীবাণুসমূহ যাতে বেড়ে উঠতে না পারে এবং দীন ও ঈমানের লুটেরা শক্তিসমূহ মযবুত হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ না পায় সে প্রচেষ্টা চালাতে তিনি বাধ্য।

১. আল ইকদুল ফরীদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৬।

www.bjilibrary.com

তাই তিনি কার্যত ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সতর্ক ও সচকিত থেকে তার মোকাবিলা করেছেন। আর জীবনের ছোট বড় সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে কারো ওপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করলে দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে তা করেছেন। চোখ বন্ধ করে যোগ্য ও অযোগ্য যে কোনো ব্যক্তির হাতে নিজেকে সোপর্দ করেছেন এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি ; বরং লুটেরা ও প্রদর্শনকারীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার পরই কেবল তার চলার বা না চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসই এর সাক্ষী।

হজ্জের সময় হযরত আবু বকর রা. আহমাস গোত্রের এক মহিলাকে দেখলেন। সে একেবারেই কথা বলছিল না। তাকে জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারলেন, সে হজ্জের পুরো সময়টা কথা না বলে চুপ থাকার নযর বা মানত করেছেন। হযরত আবু বকর রা. তাকে বললেন ঃ এটা তো কোনো নেকী বা সাওয়াবের কাজ নয়, এটি জাহেলী আচরণ। তাই এ মানত ভঙ্গ করো এবং প্রয়োজনানুযায়ী কথা বলো। মহিলা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে ? হযরত আবু বকর রা. বললেন ঃ কুরাইশদের মধ্যে যারা হিজরত করেছিলেন আমি তাদের একজন। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কুরাইশদের কোন্ গোষ্ঠীর মুহাজির ? হযরত আবু বকর রা. বললেন, তুমি তো প্রশ্ন করায় বেশ পটু দেখছি। আমি আবু বকর। সে বললো ঃ আচ্ছা আপনি আমাদের খলীফা ? তাহলে বলুন ঃ জাহেলী যুগের অবসান হওয়ার পর আমরা সরল সঠিক যে পথ লাভ করেছি, কতোদিন তার ওপর কায়েম থাকতে পারবো ? তিনি বললেন, তোমাদের ইমাম যতোদিন তার ওপর কায়েম থাকবেন। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ ইমাম বলতে কি ধরনের লোক বুঝাতে চাচ্ছেন ? হযরত আবু বকর রা. বললেন ঃ ওহে আল্লাহর বান্দী ! তোমার কওমে কি কোনো সময় এমন নেতা ছিল না যার সব আদেশ নিষেধ তোমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হতো, যে কোনো আদেশ দিলে তৎক্ষণাৎ তোমরা তা মেনে নিতে ও কার্যকরী করতে ? সে বললো হাঁ। হযরত আবু বকর রা. বললেন ঃ এখনও তারাই মানুষের নেতা ও ইমাম।[১]

হযরত আবু বকর রা. মাসয়ালা বা সমস্যার সমাধান বললে তা গ্রহণ করার আগে এ মহিলা অনুসন্ধান করে দেখা জরুরী মনে করলো যে, কে তাঁকে পথের সন্ধান দিচ্ছে ? তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি, দূরদর্শিতা এবং চরিত্র ও কর্ম কি এমন যার ওপর আস্থা স্থাপন করা যায় ? তাঁর হেদায়াত ও নির্দেশনার দ্বারা আমি কি সত্যিই সঠিক পথ পেতে পারি ? যখন সে জানতে পারছে যে, সে সময়ের খলীফা নিজে তার সাথে কথা বলছেন তখন তার জিজ্ঞাস্য বিষয়

১. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ ঃ আইয়ামুল জাহেলিয়া।

www.bjilibrary.com

পাল্টে যাচ্ছে। সাথে সাথে সে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করছে এবং খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করছে, যে সৌভাগ্যের যুগ সে লাভ করেছে তা কি সে চিরদিনের জন্য ভোগ করতে থাকবে না ভবিষ্যতে এমন কোনো সময় আসবে যখন এ মহামূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাবে ?

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, সাধারণ মুসলিম মহিলারা পর্যন্ত ইসলামী জীবনবিধানের স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণের চিন্তায় কতটা উদগ্রীব থাকতো। তারা ইসলাম এবং তার ন্যায় ও সাম্য নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের ব্যাপারে কতটা আগ্রহী ছিল, তাও এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়। এর পরও কি করে এ কল্পনা করা যায় যে, তারা ইসলামী জীবনবিধান এবং তার মূল্যবোধের ধ্বংস ও উন্নতির ব্যাপারে দূরে অবস্থান করবে অথবা তা এড়িয়ে চলবে ?

সমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা

বনু উমাইয়াদের খিলাফতের প্রথম দিকের কথা। হযরত মুআবিয়ার গভর্নররা তাদের খুতবায় হযরত আলী রা. এবং তাঁর সহযোগীদের গালমন্দ করতো। কুফার অধিবাসী এক সাহাবা হাজার ইবনে আদী রা. তার এ আচরণের প্রকাশ্য সমালোচনা করতেন এবং সাথে সাথে হযরত আলী রা. এবং তাঁর সাথী ও সহযোগীদের প্রশংসা করতেন। হযরত মুআবিয়ার গভর্নররা তাঁর মুখবন্ধ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও সফল হতে পারলো না। পক্ষান্তরে হযরত হাজার ইবনে আদী রা.-এর সমমনা এবং সহযোগীদের সংখ্যা বেড়ে চললো। তা দেখে হযরত মুআবিয়া রা. হযরত হাজার রা. এবং তাঁর সহযোগীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ জারী করলেন। তাঁকে গ্রেফতার করে হযরত মুআবিয়ার কাছে আনা হলে তিনি তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিলেন। একথা জানার পর হযরত আয়েশা রা. কাল বিলম্ব না করে আবদুর রহমান ইবনে হারেসকে হযরত মুআবিয়ার কাছে এই বলে পাঠালেন, যেন তিনি এ পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তাঁর পৌছার পূর্বেই হাজার রা. এবং তাঁর সাতজন সাথীকে শহীদ করা হলো। এতে হযরত আয়েশা রা. অত্যন্ত নারাজ হলেন এবং কঠোরভাবে মুআবিয়ার সমালোচনা করলেন। আবদুল মালেক ইবনে নাওফাল বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা রা. একথা পর্যন্ত বলতেন ঃ

لولا انالم نغير شيئا الاّ الت بنا الامور الى اشد مما كنّا فيه لغيرنا قتل حجر.

"আমরা নিজে কোনো বিষয় পরিবর্তন করলে যদি বর্তমান পরিস্থিতির চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকতো তাহলে আমরা হাজার ইবনে আদী রা.-এর হত্যার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দিতাম।"[১]

আরেক বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

لولا يغلبنا سفهاؤنا لكان لى ولمعاوية فى قتل حجر شأن.

"যদি নির্বোধের আধিপত্য লাভের আশংকা না থাকতো তাহলে হাজার ইবনে আদী রা.-এর হত্যার ব্যাপারে আমার ও মুআবিয়ার মধ্যে ভিন্ন রকম কিছু ঘটতো।"[২]

এ থেকে জানা যায় যে, ফিতনা ও বিপর্যয়ের আশংকায় বড় বড় সাহাবাগণ যেমন কোনো কোনো শরীআত বিরোধী কাজকর্ম সংঘটিত হতে দেখেও বরদাশ্‌ত করেছেন তেমনি হযরত আয়েশা রা.-ও সেসব ব্যাপারে দীনের বৃহত্তর কিছু স্বার্থের কারণে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। অন্যথায় তিনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন।

হজ্জের সময় হযরত মুআবিয়া রা. হযরত আয়েশা রা.-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি ধমকের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

يا معاوية قتلت حجر واصحابه وفعلت الذى فعلت اما خشيت ان اخبأ لك رجلا يقتلك-

"হে মু'আবিয়া! তুমি হাজার ও তার সাথীদের হত্যা করেছো এবং আরো যা করতে চেয়েছো করেছো। এ ভয় কি তোমার হলো না যে, তোমাকে গোপনে হত্যা করার জন্য আমিও কোনো লোক নিয়োগ করতে পারি।"[৩]

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, হযরত মুআবিয়া অনেক ওযর পেশ করে বহু কষ্টে তার অসন্তুষ্টি নিবৃত্ত করেছিলেন।

মতামত ও পরামর্শের অধিকার ও তার সুফল লাভ

এসব ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, ইসলামী সমাজের লাভ-ক্ষতি ও ভালমন্দের ব্যাপারে মুসলিম নারী নীরব দর্শকের মতো নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। কারণ, সমাজের ভাঙা-গড়া এবং সংস্কার ও ধ্বংসের সাথে সে গভীরভাবে

১. তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৬।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫।
৩. ঐ

www.bjilibrary.com

সম্পৃক্ত। সমাজের ক্ষতি তার নিজের ক্ষতি এবং সমাজের কল্যাণ তার নিজের কল্যাণ। সে যদি সমাজকে কল্যাণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সাহায্য করে তাহলে সে অবশ্যই সমাজকে অকল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করবে এবং বাধা দিবে। সে কল্যাণকে স্বাগত জানালে অকল্যাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করবে। এটি তার প্রকৃতিগত অধিকার। সামাজিক জীবন তাকে এ অধিকার দিয়েছে। শরীআত এ অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে তা ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত তাকে তার আবেগ ও অনুভূতি, মতামত ও ধ্যান-ধারণা এবং পসন্দ ও অপসন্দের বিষয় প্রকাশের অনুমতি দেয়। মতামত প্রকাশের এ স্বাধীনতা তার আপন সীমার মধ্যে কথা, বক্তৃতা, বিবৃতি ও লেখা যে ভাবেই হোক না কেন শরীআত তার ওপর কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না।

যেসব বিষয় তার একান্তই ব্যক্তিগত, যেমন বিয়ে, খোলা, তালাক ইত্যাদি সেসব বিষয়ে শরীআত পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, ঐসব ক্ষেত্রে কেউই তার ওপর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবে না। এসব বিষয়ে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করা হবে তা তার সম্মতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تنكح الايّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

"বিবাহিত নারীদের বিয়ে (বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর) তার পরামর্শ না নেয়া পর্যন্ত দেয়া যাবে না। আর অনুমতি না নিয়ে কুমারী মেয়েদের বিয়ে দেয়া যাবে না।"[১]

অপর একটি হাদীসে আছে ঃ

لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن.

"ইয়াতীম মেয়েদের সাথে পরামর্শ না করে এবং তাদের মতামত না নিয়ে তাদের বিয়ে দিও না।"[২]

এখানে 'ইয়াতামা' শব্দটি ভালোভাবে লক্ষ করার মতো, খুব সম্ভব স্নেহশীল, দয়াদ্র হৃদয় ও কল্যাণকামী পিতার অবর্তমানে কোনো যালেম অভিভাবক অসহায় ও আশ্রয়হীনা কোনো মেয়েকে যুলুম-অত্যাচারের শিকার বানাতে পারে এবং শরীআত তাকে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে অধিকার দিয়েছে তা থেকে বঞ্চিত করতে পারে। তাই তার মতামত ও পরামর্শ

১. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ লা-ইউনকিহুল আবু ওয়া গায়রুহুল বিকরা ওয়াসসাইয়েবা ইল্লাহ বিরিদাহা।

২. দারকুতনী, কিতাবুন নিকাহ, পৃষ্ঠা-৩৮৫।

www.bjilibrary.com

গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নারী যাতে সর্বাবস্থায় তার নিজের ইচ্ছায় চলতে পারে। তাই যখনই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পাল্টে দিয়েছেন।

এসব বিষয়ের সম্পর্ক তো নারীর ব্যক্তিসত্তার সাথে। তার ব্যাপারে আরো অগ্রসর হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

امروا النساء فی بناتهن.

"নারীদের সাথে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ করো।"[১]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, জীবনের যেসব দিক ও বিভাগ সম্পর্কে নারীর অভিজ্ঞতা আছে এবং যার লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে সে বেশী অভিজ্ঞ সেসব বিষয়ে তার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা বিশেষ মনোযোগ ও গুরুত্ব লাভ করে থাকে। তাই এসব বিষয়কে এড়িয়ে চলা বা গুরুত্ব না দেয়া আমাদের জন্য কোনো অবস্থায়ই সঠিক হতে পারে না। বরং সেসব বিষয়ে তার মতামত ও পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

হযরত হাসান বাসরী র. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ বর্ণনা করেছেন ঃ

كان النبی ﷺ يستشير حتی المرأة فتشير عليه بالتی فيأخذ به.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। কোনো কোনো সময় মেয়েরা এমন মতামত পেশ করতো যা তিনি গ্রহণ করতেন।"[২]

এ আদর্শ জীবনের কোনো একটি বা গুটিকয়েক দিকের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং তার সম্পর্ক সব বিষয় ও দিকের সাথে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন স্থানে আমরা তার প্রমাণ পাই।

যেসব শর্তের ভিত্তিতে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল প্রথম প্রথম অধিকাংশ মুসলমান তাতে অসন্তুষ্ট ছিল। এসব শর্তের মধ্যে একটি ছিল মুসলমানরা এ বছর উমরা না করেই ফিরে যাবে। এ শর্তের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়াতেই মুসলমানদেরকে ইহরাম খুলে কুরবানী করার আদেশ দিলেন। কিন্তু সে সময় সাহাবাদের আবেগ এতটা পরিবর্তিত হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

১. আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, বাবে ফিল ইসতিমারী
২. উয়ূনুল আখবার, লি ইবনে কুতাইবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭।

www.bjilibrary.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মেনে নিতে দেখা গেল না। তিনি হযরত উম্মে সালামা রা.-এর কাছে আফসোস করে ঘটনাটি উল্লেখ করলে হযরত উম্মে সালামা রা. সাহাবাদের সে সময়ের আবেগ ও মানসিকতা বিবেচনা করে অত্যন্ত বুদ্ধিমতীর মতো পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারো সাথে কথাবার্তা বলবেন না ; বরং যেসব আনুষ্ঠানিকতা পালন করা দরকার তা অন্যদের আগে নিজে করুন। তারপর দেখবেন সবাই তা না করে থাকতে পারবে না। সুতরাং তাঁকে এসব করতে দেখে তৎক্ষণাত সবাই তাকে অনুসরণ করতে শুরু করলো।[১] এভাবে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর সঠিক ও যথাযথ পরামর্শ মুহূর্তের মধ্যে এ নাজুক পরিস্থিতির অবসান ঘটালো।

বর্তমান যে পদ্ধতিতে জানাযা পড়া হয় ইসলামের প্রথম দিকে তা মুসলমানদের মধ্যে চালু ছিল না। হযরত আসমা বিনতে উমাইস হাবশায় খৃস্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখেছিলেন। তিনি এর পরামর্শ দিলে তা গৃহিত হয়।[২]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতিও তাঁর আদর্শের অনুসরণ করছে। ইবনে সিরীন হযরত উমর রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ

ان كان عمر ليستشير فى الامر حتى ان كان ليستشير المرأة فربما ابصرنى قولها او الشيئ يستحسنه فياخذ به.

"উপস্থিত সমস্যা সম্পর্কে উমর (জ্ঞানী লোকদের সাথে) পরামর্শ করতেন। এমনকি (সেসব বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারিণী) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। তাদের মতামতে কল্যাণকর কোনো দিক থাকলে বা কোনো উত্তম বিষয় দেখলে তা গ্রহণ করতেন।"[৩]

আল্লামা ইবনে আবদুল বার শিফা বিনতে আবদুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন ঃ

اسلمت الشفاء قبل الهجره فهى من المهاجرات وبايعت النبىّ ﷺ وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان عمر يقدّمها فى الرأى ويرضاها ويفضلها.

১. বুখারী, কিতাবুশ শুরুত, অনুচ্ছেদ ঃ আশ শুরুতু ফিল জিহাদ ওয়াল মাসালিহাতু মা'আ আহলিল হারব...।
২. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৬।
৩. আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৩।

www.bjilibrary.com

"শিফা রা. হিজরতের পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। তাই তিনি হিজরতকারী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াতও করেছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন এবং মর্যাদাবান নারী। পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের ব্যাপারে হযরত উমর রা. তাঁকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। তাঁকে তিনি সন্তুষ্ট রাখতেন এবং (অন্যদের তুলনায়) বেশী মর্যাদা দিতেন।"[১]

হযরত আলী রা. তাঁর খিলাফত যুগে বিরোধীদের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মদীনার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের কামীল নাখয়ীকে তাঁর পক্ষে কাজ করার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, আমি মদীনারই একজন অধিবাসী। মদীনাবাসীগণ যদি আপনার এ সিদ্ধান্তের পক্ষে কাজ করেন তাহলে আপনার সহযোগিতা করতে আমার কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না। অন্যথায় আমি অক্ষম। এরপর তিনি ওমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হলেন। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আলী রা.-এর কন্যা উম্মে কুলসূম রা.-কে তিনি বললেন ঃ আমি যুদ্ধে শরীক হতে পারছি না। তবে অন্য সব ব্যাপারে হযরত আলী রা.-এর আনুগত্য করে যাব। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, তিনি সিরিয়া রওয়ানা হয়ে গেছেন। এ খবর শুনে হযরত আলী সিরিয়া পৌঁছার আগেই তাকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে যে মুহূর্তে তিনি যোদ্ধাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন খবর পেয়ে ঠিক সে মুহূর্তে তাঁর কন্যা উম্মে কুলসূম রা. এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহর ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। আপনাকে তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বাস্তব অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি তার জামিন হচ্ছি। তিনি আপনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। হযরত আলী রা. উম্মে কুলসূমের দেয়া এ খবর এবং আবদুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর মতামতের ওপর আস্থা স্থাপন করে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং যোদ্ধাদের অভিযান বাতিল করলেন।[২]

যে সময় আয়েশা রা. হযরত উসমানের হন্তাদের থেকে কিসাস নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন সে সময়ের একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ

كان الناس يتجنون على عثمان رض ويزرون على عماله ... فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم فننظر في ذالك فنجده بريًا تقيًا وفيا ونجدهم فجرة غدرة يحاولون غير ما يظهرون.

১. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব তাযকিরাতু শিফা বিনতে আবদুল্লাহ।
২. তারিখে কামেল ৩য় খণ্ড, তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫

www.bjilibrary.com

"লোকজন উসমান-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে ও তাঁর গভর্নরদের দোষ বর্ণনা করে। তারা মদীনায় এসে আমাদের কাছে গভর্নরদের বিরুদ্ধে যা বলে আমরা তা নিয়ে পরামর্শ ও চিন্তা-ভাবনা করি। আমরা দেখতে পাই হযরত 'উসমান রা. প্রতিটি অভিযোগের ব্যাপারে নির্দোষ, আল্লাহভীরু এবং নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে সচেতন আর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা পাপী, অপরাধী, প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী। তারা যা প্রকাশ করছে তার সম্পূর্ণ উল্টোটা করার জন্য চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে।"[১]

একদিকে এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা রা. সরকার এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাজকর্মের মধ্যে কোনগুলো ন্যায় ও ইনসাফের সীমারেখার মধ্যে আঞ্জাম পাচ্ছে এবং কোথায় এ সীমা লংঘিত হচ্ছে তা অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যালোচনা করতেন। অপরদিকে এ বক্তব্য থেকে প্রকাশ পায় যে, সাধারণ মানুষের সমস্যা ও বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তাঁর গভীর ও নিকট সম্পর্ক ছিল এবং জনগণ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্যও তাঁর কাছে আসতো। তিনি এসব ব্যাপারে তাঁদের বুঝানোর চেষ্টা করতেন।

হযরত উসমানের পর কাকে খলীফা বানানো হবে এ মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বসরার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং নিজ গোত্রের নেতা আহনাফ হযরত তালহা রা. ও যুবায়ের ছাড়াও হযরত 'আয়েশার কাছেও যান। তিনজনই হযরত আলী রা.-এর হাতে বাইয়াত হন।[২]

বাস্তব সহযোগিতা

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিষয়ে নারীর মতামত ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ইসলামী সমাজ যেভাবে উপকৃত হয়েছে তেমনি ইসলামী সমাজ গঠন ও তার রূপায়ণের ক্ষেত্রেও নারীরা স্বেচ্ছায় যে সামরিক খেদমতে আঞ্জাম দিয়েছে ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, প্রয়োজনে কোনো কোনো সময় সরকারও তাদের নিকট থেকে এ খেদমত গ্রহণ করেছে।

খারেজীরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলো ; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি মেয়েদের জিহাদের জন্য নিয়ে যেতেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ

১. তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৪।
২. ঐ পৃষ্ঠা-১৯৭।

www.bjilibrary.com

وقد كان يغزوبهن فيداوين الجرحى.

"হ্যাঁ, তিনি তাঁদের সাথে নিয়ে যেতেন। তারা আহত ও অসুস্থদের চিকিৎসা এবং ঔষধপত্র দেয়ার কাজ করতেন।"[১]

হযরত আনাস রা. বলেন ঃ

كان رسول اللّه ﷺ يغزو بام سليم ونسوة من الانصار فيسقين الماء ويداوين الجرحى.

"রাসূলুল্লাহ স. উম্মে সুলাইম ও কোনো কোনো আনসারী মহিলাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন যাতে তারা পিপাসার্তদের পানি পান করাতে এবং আহতদের মলম লাগাতে এবং পট্টি-ব্যাণ্ডেজ করতে পারে।"[২]

তাছাড়া কোনো কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় কাজও তাদের থেকে নেয়া হতো। যেমন উম্মে ওয়ারাকা বিনতে আবদুল্লাহ বলেন ঃ

كان رسول اللّه ﷺ يزورها فى بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها.

"তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাড়ীতে যেতেন। তিনি তাঁর জন্য একজন মুয়াযযিনও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যাতে সে আযান দেয়। আর তিনি তাকে নিজ পরিবারের লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দান করেছিলেন।"[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাঁর এক ক্রীতদাসীকে রমযানের রাতের (তারাবীহ) নামাযে তাঁর বাড়ীর মেয়েদের ইমামতি করার নির্দেশ দিতেন।[৪]

শিফা বিনতে আবদুল্লাহ সম্পর্কে বলা হয় ঃ

ربما ولاها (اى عمر) شيئا من امر السوق.

"মাঝে মধ্যে হযরত উমর রা. তার ওপর বাজারের কোনো না কোনো দায়িত্ব অর্পণ করতেন।"[৫]

---

১. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ আন নিসায়ুল গাযিয়াত ইউরযাকু লাহুন্না, তিরমিযী, আবওয়াবুস সায়র, অনুচ্ছেদ ঃ মাই ই উ'তিল ফাই।

২. আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ফিননিসায়ি-ইয়াগযুনা, মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, তিরমিযী, আবওয়াবুস সায়র।

৩. আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামাতুন নিসা।

৪. আল মুহাল্লাহ লি ইবনে হাযম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৮।

৫. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব।

www.bjilibrary.com

ইসলামী সমাজ মুসলমান নারীর ওপরে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। আর মুসলমান নারীও নিজের পারিবারিক দায়িত্বসমূহ পালন করার সাথে সাথে এসব দায়িত্ব পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এসব ঘটনাবলী অকাট্যভাবে তা প্রমাণ করে।

❐

www.bjilibrary.com

নারী এবং সামাজিক পদমর্যাদা

নারীর চিন্তাশক্তি

ইসলামী সমাজে নারীর নিকট থেকে যেসব খেদমত নেয়া হয়েছে তা দেখে প্রশ্ন জাগে, নারীর ওপর কি এ নির্দিষ্ট কয়টি দায়িত্বই শুধু অর্পণ করা যেতে পারে নাকি এছাড়া অন্যান্য সামাজিক দায়িত্বও তার ওপর অর্পণ করা যেতে পারে ? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের দেখা উচিত নারীর চিন্তা ও কর্ম ক্ষমতা সম্পর্কে ইসলাম কি মতামত পোষণ করে এবং তার ওপর কতটা নির্ভর করে ? এ প্রশ্নের জবাব লাভের পরেই কেবল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে যে, সে কি ধরনের কাজের যোগ্য এবং ইসলামী সমাজে তার ওপর কি কি দায়িত্বের বোঝা অর্পণ করা যাবে আর কোন কোন দায়িত্বের বোঝা অর্পণ করা যাবে না।

পৃথিবীর সব কাজ একরকম নয়। ছোট বড় গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন নানা রকমের কাজ আছে এ পৃথিবীতে। আর যে কাজ যে প্রকৃতির সেই কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য সেই প্রকৃতির যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এটা একটা বাস্তব সত্য যে, যে কোনো লোকের মধ্যে যে কোনো কাজের যোগ্যতা থাকে না। কেউ কোনো একটি কাজের জন্য যোগ্য হলেও আরেকটি কাজের জন্য হয়তো মোটেই যোগ্য নয়। কারো মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণার যোগ্যতা থাকলে আরেক জনের মধ্যে আছে সামরিক শৃঙ্খলার যোগ্যতা। কারো মধ্যে আর্টিষ্ট বা কলাবিদ হওয়ার যোগ্যতা থাকলে কারো মধ্যে থাকে লেখা ও বলার শক্তি। কারো দৈহিক গঠন ও ক্ষমতা, পরিশ্রম ও কষ্ট বরদাশত করার যোগ্য এবং কারো হয়তো আদৌ সে যোগ্যতা থাকবে না। যে কোনো দুজন মানুষের মধ্যে যোগ্যতার এ তারতম্য দেখা যাবে। কিন্তু নারী ও পুরুষকে পরস্পর তুলনা করলে এ তারতম্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

নারী দুর্বল

শরীআতের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে এ পার্থক্য চিন্তা ও কর্মশক্তি উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। তাই নারীদের সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ناقصات عقل ودين.

www.bjilibrary.com

এখানে (আক্‌ল) শব্দটি দ্বারা তার চিন্তা শক্তির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এবং (দীন) শব্দ দ্বারা তার দৈহিক শক্তি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ উভয় ক্ষেত্রে সে পুরুষের তুলনায় দুর্বল ও অপূর্ণাঙ্গ।[১]

ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ

الرجل خير من المرأة.

"(যোগ্যতার দিক দিয়ে) পুরুষ নারী অপেক্ষা উত্তম।"[২]

নারীর দুর্বলতার প্রতি সুবিচার

ইসলামী শরীআত নারীর এসব দুর্বলতা শুধু স্বীকারই করেনি, বরং জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করেছে।

১. মাসিক বা ঋতুকালীন সময়ে একদিকে তার বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকে না। অন্যদিকে তার দৈহিক ব্যবস্থাপনায় এতোটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যে, অধিক মনযোগ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় এমন কাজ করার সে আদৌ যোগ্য থাকে না। তাই এ সময়টাতে ইসলামী শরীআত তার জন্য নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরযও রহিত করে দিয়েছে। ওপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বাণী উল্লেখ করা হয়েছে তাতে তিনি তার দীনের অপূর্ণতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, প্রকৃতিগত এ দুর্বলতার কারণে সে সময় তার ওপর নামায ও রোযা পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

২. সন্তান প্রসবের সময় তাকে এর চেয়েও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, সে জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করে। এ নাজুক অবস্থা কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত শরীআত তাকে নামায পড়তে নিষেধ করেছে। হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন ঃ

كانت المرأة من نساء النبى ﷺ تقعد فى النفاس اربعين ليلة لايأمرها النبى ﷺ بقضاء صلوة النفاس.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (পরিবারের) মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ চল্লিশ দিন পর্যন্ত নেফাস অবস্থায় থাকতেন। তিনি তাদের সেই সময়ের নামায কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।"[৩]

---

১. বুখারী, কিতাবুল হায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ তারকুল হায়েযিস সাওমা।
২. ফাতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৬।
৩. আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফী ওয়াকতিন নুফাসা।

www.bjilibrary.com

৩. যদি হায়েজ ও নিফাসের সময় রোযা ফরয হয় তা হলে এ সময় রোযা পালন না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শারীরিক দিক দিয়ে যোগ্য হলে এ রোযা অন্য সময় কাযা হিসেবে আদায় করতে বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা রা. বলেন ঃ আমাদেরকে হায়েজের সময়ের রোযার কাযা আদায় করার আদেশ দেয়া হতো। কিন্তু নামাযের কাযা আদায়ের আদেশ দেয়া হতো না।[১]

৪. গর্ভধারণ ও দুগ্ধদান কালেও সে কমবেশী একই অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ সময়ে রোযার মতো কষ্টকর ইবাদাত করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই এ ফরয অন্য সময় আদায় করার জন্য শরীআত তাকে অনুমতি দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة وعن المسافر والحامل والموضع الصوم.

"আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের অর্ধেক নামায মাফ করে দিয়েছেন (মুসাফিরকে চার রাক'আতের স্থলে দুই রাক'আত নামায পড়তে হবে)। আর গর্ভবর্তী ও দুগ্ধদান কারিণী মেয়েদের রোযা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা আবশ্যক করে দেননি (তারা অন্য মাসেও রোযা আদায় করতে পারে)।"[২]

৫. ইসলামী শরীআত দুর্বল ও শক্তিহীনদের জিহাদের কঠিন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। এদের মধ্যে আরো আছে বৃদ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং নারী।

عن ابى هريرة رضـ عن رسول الله ﷺ جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة.

"আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বৃদ্ধ, শিশু, দুর্বল, এবং নারীদের জন্য হজ্জ এবং উমরাই জিহাদ।"[৩]

৬. সে হজ্জ পালনের জন্য গেলে প্রতিপদে তার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যুলহাজ্জ মাসের নয় তারিখে মুযদালিফায় রাত কাটিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা কর্তব্য। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী ও শিশুদের খুব ভোরেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছেন যাতে সবার সাথে চলতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে

---

১. মুসলিম, কিতাবুল হায়েজ ; অনুচ্ছেদ ঃ ওজুবু কাদায়িস সাওমে আলাল হায়েজ।
২. ইবনে মাজা, আবওয়াব, মা জায়া ফিস সিয়াম ; বাবু মা জায়া ফিল ইফতারি লিল হামেলি ওয়াল মুরদিয়ি। তিরমিযি, আবু দাউদ ও নাসায়ী একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৩. নাসায়ী, কিতাবু মানসিকিল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ফাদলুল হাজ্জ।

www.bjilibrary.com

তাদের কষ্ট না হয়। তাছাড়া তাদেরকে এ অধিকারও দিয়েছেন যে, লোকজন মিনায় পৌছার আগেই যেন তারা কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সেরে নেয়।[১]

নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা

নারীর চিন্তাগত যোগ্যতা সম্পর্কে পূর্বেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে ঃ নারীর যোগ্যতা পুরুষের তুলনায় কম।

হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিদায়ার' ব্যাখ্যাকার ইমাম আকমালুদ্দীন আলবাবর্তী নবী স.-এর এ বাণীর আলোকে নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

মানুষের আভ্যন্তরীন সহজাত শক্তিসমূহকে চারটি স্তর বা পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম স্তর হলো, শুধু চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতা। এ যোগ্যতা প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষের মধ্যেই থাকে। দ্বিতীয় স্তর হলো, খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বিষয়ে ইন্দ্রিয় শক্তি লব্ধ জ্ঞান। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তি ব্যবহার করে যে জ্ঞান অর্জন করা যায়। (যেমন ঃ দেখে রং চেনা এবং চেখে স্বাদ নির্ণয় করা ইত্যাদি।) এবং এতটা বুদ্ধিমত্তা থাকা যে, চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে এসব বিষয়ে সত্য ও বাস্তবতা অর্জন করা। পরিভাষায় এ জ্ঞানকে বলে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। এ ধরনের জ্ঞান থাকলেই কেবল মানুষের ওপর শরীআতের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়। তৃতীয় স্তর হলো, স্পষ্ট বাস্তব থেকে যেসব ফলাফল বা বিষয় প্রমাণিত হয় তা উপলব্ধি করতে কোনো কষ্ট বা পরিশ্রম না হওয়া, এর নাম বাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধি। চতুর্থ স্তর হলো, এসব প্রমাণিত ফলাফল বা সিদ্ধান্তসমূহ মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে সদা বিদ্যমান থাকা যেন তা চোখের সামনেই আছে। একে বলা হয় সমৃদ্ধ জ্ঞান।" এরপর তিনি লিখেছেন ঃ

وليس فيما هو مناط التكليف وهو العقل بالملكته فيهن نقصان بمشاهدة حالهن فى تحصيل البديهيات باستعمال الحواس فى الجزئيات وبالتنبيه ان نسيت فانه لو كان فى ذالك نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرجال فى الاركان وليس كذالك وقوله صلى اللّه عليه وسلم هن ناقصات عقل المرادبه العقل بالفعل.

১. বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ মান কাদ্দামা দা'ফাতাহু আহলিহি।

www.bjilibrary.com

"শরীআতের বিধি-নিষেধ পালন নির্ভর করে জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ওপর। মেয়েদের মধ্যে এ জ্ঞানের ঘাটতি বা অভাব নেই। কারণ, আমরা দেখতে পাই, মেয়েরা খুঁটিনাটি বিষয়েও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানার্জন করে থাকে এবং কোনো বিষয় ভুলে গেলেও তা স্মরণ করিয়ে দিলে স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে পারে। তার এ যোগ্যতায় যদি কোনো প্রকার অপূর্ণতা থাকতো তাহলে ইসলামী শরীআতের যেসব মৌলিক বিষয় পালনের নির্দেশ নারীকে দেয়া হয়েছে তা না দিয়ে বরং ভিন্ন ধরনের নির্দেশ দেয়া হতো। কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি বরং নারী ও পুরুষ উভয়কেই একই ধরণের বিধি-বিধান পালন করতে বলা হয়েছে। তাই বুঝা গেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ক্ষেত্রে যে 'বিজ্ঞানে খাটো' কথাটি বলেছেন তার অর্থ তৃতীয় স্তরের জ্ঞান।"[১]

নারীর সাক্ষ্য

ইসলামী শরীআত সর্বাবস্থায় পুরুষকে জ্ঞান-বুদ্ধির দিক থেকে নারীর চেয়ে উন্নত ও উত্তম মনে করেছে। এ কারণে শরীআত নারীর চেয়ে পুরুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর অধিক নির্ভরও করেছে। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমরা মেয়েদের সাক্ষ্যদানের বিষয়টি পেশ করছি। কারণ, নবী স. এ বিষয়টিকে নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি কমতি থাকার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل.

"নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক।"[২]

কুরআন মজীদের পাঁচটি স্থানে সাক্ষ্য দানের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কেবল একটি স্থানেই নারীর সাক্ষ্যের মর্যাদা ও অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই লেনদেনের ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া ও নেয়ার বিধান বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ط

"এবং দু'জন পুরুষ সাক্ষী সংগ্রহ করো। আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে তোমাদের পসন্দ মতো একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে সাক্ষী হিসেবে যোগাড় করো। (একজন পুরুষের বদলে দু'জন নারী এজন্য যে, একজন বিস্মৃত হলে অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দেবে)।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২

১. আল ইনায়াতু মাতবু' আলা হাশিয়াতি ফাতহিল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮।
২. বুখারী, কিতাবুল হায়েজ, অনুচ্ছেদ ঃ তারকুল হায়েযিস সাওমা।

www.bjilibrary.com

নারীর সাক্ষ্যদান প্রসংগে কুরআন মজীদ যে শব্দাবলী ব্যবহার করেছে তা থেকে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। সেগুলো হলো, শুধু নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কিনা ? যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সব বিষয়ে না কোনো কোনো বিষয়ে ? আর সব ক্ষেত্রে সাক্ষীর নিসাব কি ? অর্থাৎ সাক্ষীর সংখ্যা কয়জন হওয়া জরুরী ? আর যদি একথা ধরে নেয়া হয় যে, নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার সাথে পুরুষ সাক্ষী থাকা আবশ্যক তাহলেও প্রশ্ন দেখা দেবে, নারী–পুরুষের এ সম্মিলিত সাক্ষ্য কি সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত রায়ের ভিত্তি হতে পারে নাকি এর মাধ্যমে কোনো কোনো বিষয়ের ফায়সালা হতে পারে মাত্র ? এসব প্রশ্ন নিয়ে মুসলিম ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের মতামত ও চিন্তাধারা আমরা কিছুটা সবিস্তারে পেশ করছি। যাতে এসব ধ্যান-ধারণার আলোকে নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি করা সহজতর হয়।[১]

শুধু মহিলাদের সাক্ষ্যদান

মুসলিম উম্মার প্রায় সমস্ত ফিকাহ শাস্ত্রবিদই একমত যে, মেয়েদের যেসব ব্যাপারে পুরুষদের জানার সুযোগ নেই শুধু সেসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নারীর সাক্ষ্য যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ী র. বলেন ঃ

الولاد وعيوب النساء ممالم اعلم مخالفًا لقيته ان شهادة النساء فيه جائزة لارجل معهن –

"সন্তান প্রসব এবং মেয়েদের (গোপনীয় অংগসমূহের) দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে শুধু নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আমি যেসব (জ্ঞানী ও বিদ্বান) লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি তাদের কাউকেই এ মতামতের বিরোধী পাইনি।"[২]

ইমাম যুহরী বলেন ঃ

مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لايطلع عليه غيرهن.

"যেসব ব্যাপারে নারী ছাড়া আর কেউ অবহিত হতে পারে না সেসব ব্যাপারে শুধু নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট ও বিধিসম্মত। এটা একটা স্বীকৃত রীতি-প্রথা হিসেবে চলে আসছে।"

১. নীচে সাক্ষ্যদান সম্পর্কে যেসব ধ্যান ধারণা পেশ করা হচ্ছে তা ইবনে হাযমের আল মাহাল্লী গ্রন্থের ৯ম খণ্ডের ৩৯৫ থেকে ৪০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং ইবনে কাইয়েমের গ্রন্থ "আত তারীকুল হুকমিয়া ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়া।

২. কিতাবুল উম্ম, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৯।

www.bjilibrary.com

বিশেষ বিশেষ মেয়েলী বিষয় ছাড়া জীবনের অন্য সব বিষয়ে শুধু মেয়েদের সাক্ষ্য হানাফী ফকীহগণ, ইমাম মালেক র., ইমাম শাফেয়ী র. এবং তাঁদের মতের সমর্থক আরো কিছু সংখ্যক ফকীহ গ্রহণ করেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., উমর ইবনে আবদুল আযীয রা. এবং আতা ইবনে আবু রাবাহও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন ঃ

لايجوز شهادة النساء وحدهن الاعلى مالا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن.

"নারীদের সাক্ষ্য কেবল সেসব ক্ষেত্রেই জায়েয যেসব বিষয়ে তারা ছাড়া আর কেউ অবহিত হতে পারে না। অর্থাৎ নারীদের গোপনীয় অংগসমূহ, গর্ভ এবং হায়েজ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য অনুসারে ফায়সালা করা হবে। এজন্য পুরুষের অংশ গ্রহণ জরুরী নয়।"

হযরত আলী রা.-এর একটি বক্তব্য এ মতের সমর্থন করে বলে মনে হয়। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এর বিপরীত বক্তব্য দেখা যায়। একবার চারজন মহিলা হযরত আলী রা.-এর সামনে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক মহিলা অমুক শিশুকে পায়ের নীচে পিষে হত্যা করেছে। হযরত আলী রা. তাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

হিন্দ বিনতে তালাক আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ এক স্থানে আমরা কয়েকজন মহিলা সমবেত হয়েছিলাম। সেখানে চলার পথে এক মহিলা কাপড় আবৃত একটি শিশুকে পদদলিত করলে শিশুটির মা দাবী করলো, সে আমার সন্তানকে হত্যা করেছে। এ বিষয়ে দশজন মহিলা হযরত আলী রা.-এর সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। হযরত আলী রা. হন্তা মহিলার ওপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

হযরত উমর রা. সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি বিয়ে, তালাক, শরীআত নির্ধারিত শাস্তি এবং হত্যার ব্যাপারে নারীর সাক্ষ্য সঠিক বলে মনে করতেন না। কিন্তু অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এক সময় চারজন মহিলা এসে হযরত উমর রা.-এর সামনে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হযরত উমর রা.-স্বামী ও স্ত্রীকে আলাদা করে দিলেন।

মেয়েলী ব্যাপারসমূহে কেবল মেয়েদের সাক্ষ্য যে কারণে গৃহীত হয় অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রের জ্ঞান কেবল মেয়েদেরই থাকা সম্ভব, সেসব ক্ষেত্রে

www.bjilibrary.com

কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে কেবল মেয়েদের সাক্ষ্যই গ্রহণ করা উচিত বলে কিছু সংখ্যক ফিকাহ শাস্ত্রবিদ মত প্রকাশ করেন। হযরত আলী রা. ও হযরত উমর রা. থেকে পরস্পর বিরোধী যে মত পাওয়া যায় ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের এ মতটি দ্বারা তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। শুধু নারীদের সাক্ষ্য তারা এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যখন ঘটনা সম্পর্কে অবগতি লাভের সুযোগ নারীর তুলনায় পুরুষের বেশী থাকে। আর মেয়েদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শুধু এমন ফায়সালা করেছেন যখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করলে অধিকার নষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন ঃ

تقبل شهادة النساء في الحدود اذا اجتمعن في العرس والحمام ونص عليه احمد في رواية بكربن محمد عن ابيه ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي باشياء لاقاربه ويعتق لايحضره الا نساء هل تجوز شهادتهن في الحقوق والصحيح قبول شهادة النساء في الرجعة فان حضورهن عنده اليسر من حضورهن عند كتابة الوثائق.

"মেয়েরা যদি বিয়ের মজলিসে বা হাম্মামখানায় সমবেত হয় এবং সেখানে হদের উপযুক্ত কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহলে সে পরিস্থিতিতে হদের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। বকর ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতার বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ র. থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।[১] ইবনে সাদাকা একটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের অছিয়ত করে এবং ক্রীতদাসকে আযাদ করে আর নারী ছাড়া কোনো পুরুষ সে সময় উপস্থিত না থাকে তাহলে এ ধরনের অধিকারের ক্ষেত্রে কি নারীর সাক্ষ্য জায়েয হবে ? (ইমাম আহমদ বললেন ঃ হ্যাঁ, অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য জায়েয)[২] একইভাবে তালাকের রুজু করার ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কারণ, নথিপত্র লেখার সময় তার উপস্থিত থাকা যতো সহজ তালাকের রুজু করার ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা তার চেয়ে বেশী সহজ। অর্থাৎ পূর্ব বর্ণিত অবস্থায় যদি তার সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী অবস্থায়ও গৃহীত হওয়া উচিত।"

১. আল এখতিয়ারাতুল ইলমিয়া আল মাতবু' মা'আল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা-২১২।
২. বন্ধনীর মধ্যেকার অংশটুকু আমরা 'আত তারীকুল হুকমিয়া ফিস সিয়াসাতিশ শার'ইয়া' গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠা থেকে সংযোজিত করেছি। এ কথাটুকু ছাড়া মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয় না।

www.bjilibrary.com

"আতা ইবনে আবু রাবাহ্ বলেন ঃ যদি আটজন মহিলা কারো ব্যভিচারী হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে আমি তাকে পাথর মেরে শাস্তি দেবো।"

আল্লামা ইবনে হাযম তো দুজন মহিলাকে একজন পুরুষের সমকক্ষ স্বীকার করে নিয়ে সর্বাবস্থায় এবং সবরকমের অধিকারের ক্ষেত্রে ও বিষয়ে তাদের নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

কাজী শুরাইহ র.-এর মতও অনেকটা এরূপ। এক পরিবারের আসবাপত্র সম্পর্কে তার কাছে একটি মামলা আসে। বাদী ও বিবাদী উভয়ে ছিলেন স্বামী ও স্ত্রী। স্বামী দাবী করছিল যে, সম্পদ ও আসবাবপত্র তার। কিন্তু চারজন মহিলা সাক্ষ্য দিল যে, এসব আসবাবপত্র স্ত্রীর। স্বামী স্ত্রীকে তার মোহরানার টাকার বিনিময়ে এসব আসবাবপত্র দিয়েছে। মহিলাদের সবার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজী শুরাইহ্ স্বামীর বিরুদ্ধে মামলার রায় দিলেন।

এ ধরনের আরো একটি বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি মোহরানা সংক্রান্ত একটি মামলায় চারজন মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া রা. তালাক সম্পর্কিত বিষয়ে দুজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

হযরত মু'আবিয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র উম্মে সালামার সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি একটি বাড়ী সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা করেছিলেন।

নারী ও পুরুষের সম্মিলিত সাক্ষ্য

যেসব ফকীহ্ সর্বক্ষেত্রে এককভাবে নারীদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণ না করার জন্য তাদের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়, তারা তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। যেসব ফকীহ্ মেয়েদের একান্ত নিজস্ব সমস্যার সীমিত গণ্ডির মধ্যেই কেবল এককভাবে নারীদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য মনে করেন প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় তাদের ব্যাপারে মেয়েদের সীমিত গণ্ডির বাইরে সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত নারীর সাথে পুরুষ শরীক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সে সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতে প্রস্তুত নন। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে না ফকীহদের এ গোষ্ঠীর মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।

বিখ্যাত তাবেয়ী মাকহুল র. বলেন ঃ শুধু ঋণ দেয়া নেয়ার ব্যাপারে এককভাবে নারীদের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করা যায়। রাবীয়া র.-এর মতে

www.bjilibrary.com

বিয়ে, তালাক, শরীআত নির্ধারিত শাস্তি এবং দাস মুক্তির ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যেসব লেনদেন এবং অধিকার নির্ধারিত হয় সেসব ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম মালেক র. এবং ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যৌথ বক্তব্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করা যেতে পারে। যদিও আর্থিক ক্ষেত্র কি তা নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে অল্প মতভেদ আছে। সমস্ত হানাফী ফকীহ এবং উসমান বাত্তী র. শরীআত নির্ধারিত শাস্তি এবং কিসাস ছাড়া আর সব ব্যাপারে নারী ও পুরুষের যৌথ ও সম্মিলিত বক্তব্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে মেনে নেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী র.-ও এ মত পোষণ করতেন বলে একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়। আরেকটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, তার কাছে কিসাসের ক্ষেত্রেও যৌথ সাক্ষ্য জায়েয। শুধু 'হুদুদ' বা শরীআত নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে তিনি নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট মনে করেন না। তাউস বলেন, শুধু ব্যভিচার ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না এ কারণে যে, এ দৃশ্য দেখা নারীদের জায়েয নয়। আতা ইবনে আবু রাবাহর মতে, ব্যভিচার এবং অন্য আর সব ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। ব্যভিচারের ব্যাপারেও যদি তিনজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা গ্রহণ করা হবে।

সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্যতা

ফকীহগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়েদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে থাকুন বা সবক্ষেত্রে গ্রহণ করে থাকুন তাতে কিছু আসে যায় না। তারা মেয়েদের সাক্ষ্যের ওপর যতটা বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছেন প্রকৃতপক্ষে তাদের ততটুকু যোগ্যতার স্বীকৃতিও তারা দিয়েছেন। কারণ, সাক্ষ্যদান সাদা-মাটা ধরনের কোনো খবর বা অবহিতকরণের নাম নয়। বরং সাক্ষ্য দান হলো কোনো ঘটনাকে তার বাস্তব অবস্থা সামনে রেখে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করা এবং অবিকৃত রেখে ব্যাখ্যা করার নাম। এটা কোনো সহজ কাজ নয়। বরং ব্যক্তির নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া একটা বিরাট দায়িত্ব। এটা এত বড় একটা দায়িত্ব যে, বিচারক তার ওপর নির্ভর করে বড় বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য। দুর্‌রে মুখতার গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وحكمها وجوب الحكم على القاضى بموجبها بعد التزكية فلو امتنع بعد وجود شرائطها اثم لتركه الفرض واستحق العزل لفسقه وعزر لارتكابه مالا يجوز شرعا وكفران لم يرالوجوب.

www.bjilibrary.com

"সাক্ষ্যদানের হুকুম হলো, সাক্ষ্য যাচাই বাছাইয়ের পর সে মোতাবেক রায় দেয়া বিচারকের জন্য অবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। রায়দানের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি বিচারক রায়দান করা থেকে বিরত থাকেন তা হলে তিনি গোনাহগার হবেন। কেননা এভাবে তিনি একটি ফরয পরিত্যাগকারী হিসেবে গণ্য হচ্ছেন। নিজের এই গোনাহর কারণে তিনি পদচ্যুতির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন এবং তাকে 'তাযীর' করা হবে। কারণ, তিনি এমন আচরণ করছেন শরীআতের দৃষ্টিতে যা বৈধ নয়।[১] আর যদি এ ধরনের সাক্ষ্য অনুসারে রায় দানকে তিনি ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় মনে না করেন তাহলে তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে।"

এ কারণে আমাদের ফিকাহবিদগণ লিখেছেন ঃ

اهلية القضاء تدور مع اهلية الشهادة.

"সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা থাকলে বিচারক হওয়ারও যোগ্যতা থাকে।"[২]

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারলে তার অর্থ হবে, সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বিচারক হওয়ার যোগ্যতাও রাখে। তাই এ বিষয়টি অকাট্যভাবে জানা প্রয়োজন যে, নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি? তাহলে তার ভিত্তিতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা কোন্ সীমা পর্যন্ত এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কার্যকরী ও কল্যাণকর সে সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবো।

নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে ফিকাহবিদদের ধ্যান-ধারণার পর্যালোচনা

নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে ফিকাহবিদদের যে মতামত ও ধ্যান-ধারণা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে একদিকে তা প্রত্যাখ্যান করা যেমন অসম্ভব অন্যদিকে তেমনি তা হুবহু গ্রহণ করাও কঠিন। কেননা, কোনো একটি ক্ষেত্রে কোনো ফিকাহবিদের বক্তব্য ও মতামত বুদ্ধি-বিবেক ও শরীআতের সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে হলেও আর সবক্ষেত্রে অন্য ফিকাহবিদদের মতামত ও সিদ্ধান্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এসব ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার আলোকে ইসলামী জীবনবিধানের মৌলিক বিষয় এবং মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও উপলব্ধির সর্বাধিক নিকটবর্তী রায় কোনটি তা জানার প্রচেষ্টা চালান হবে।

---

১. দুররুল মুখতার আল-মাতবু' আলা হাশিয়াতি দুররুল মুখতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৩।
২. বাদাইউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩।

www.bjilibrary.com

ইমাম মালেক র. শাফেয়ী, র.-সহ ফিকাহবিদদের যে দলটি শুধু অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য জায়েয মনে করেন তাদের মতামত এ ধ্যান-ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, নারীর স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি-বিবেক মূলত এমন নয় যাতে কোনো ব্যাপারে তার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। তবে যেহেতু কোনো কোনো পরিস্থিতিতে তার জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না তাই বাধ্য হয়েই তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা ও মীমাংসা করতে হয়। তাই মালেকী ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুদাওয়ামায় উল্লেখিত হয়েছে ঃ

شهادة النساء انما جازت على وجه الضرورة.

"প্রয়োজনের কারণেই নারীর সাক্ষ্য দান জায়েয হয়েছে।"[১]

এ ধ্যান-ধারণার ভিত্তি দু'টি একদিকে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় ব্যভিচার, তালাক এবং তালাক থেকে রুজু করার বিষয়, অছীয়ত এবং ঋণ সংক্রান্ত লেনদেনের কথা বলতে গিয়ে সাক্ষ্য দানের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শুধু ঋণ সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যদানের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দিকে কুরআনে নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কিত বিধান যে ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তাও এর ভিত্তি।

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى.

"তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে। এমন লোকদের মধ্য থেকে এসব সাক্ষী হবে যাদের তোমরা সাক্ষী হিসেবে পসন্দ করো। (একজন পুরুষের স্থানে দু'জন নারী এজন্য যে) তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয়জন তা স্মরণ করিয়ে দেবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২

এ দু'টি কথা দ্বারা এসব মনীষী বুঝেছেন যে, ঋণ অথবা এ ধরনের অন্য সবক্ষেত্র ছাড়া আর সবক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বৈধ নয় এবং ঋণ বা এ ধরনের মাসয়ালার ক্ষেত্রেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার কারণ হলো, প্রতি পদে পদে এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এছাড়াও সবসময় কেবল পুরুষকেই সাক্ষী হিসেবে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

তাছাড়া আয়াতটির শাব্দিক অর্থের ওপর নির্ভর করে তারা এ সূত্রটিও রচনা করেছেন যে, নারীর সাক্ষ্য কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তার

১. আল-মুদাওয়ামাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৩।

www.bjilibrary.com

সাথে পুরুষও সাক্ষী হিসেবে থাকবে। কারণ, নারীর সাক্ষ্য প্রয়োজনের তাকিদে জায়েয করা হয়েছে। তাই যেভাবে এবং যতটা অনুমতি দেয়া হয়েছে তা লংঘন করা ঠিক হবে না। ইমাম শাফেয়ী র. বলেন ঃ

فلا يجوز من شهادتهن شيئ وان كثرن الاومعهن رجل.

"মেয়েদের কোনো রকম সাক্ষ্যই জায়েয নয় এমনকি তাদের সংখ্যা অধিক হলেও। তবে তাদের সাথে পুরুষ থাকলে জায়েয হবে।"[১]

আমাদের দৃষ্টিতে এ তিনটি মতের কোনোটিই ঠিক নয়। প্রথম মতটি এজন্য ঠিক নয় যে, শরীআতের বিধান নারী ও পুরুষ সবার জন্য সাধারণ-ভাবে প্রযোজ্য। কোনো বিধানের শেষে নারীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করার অর্থ কখনো এ নয় যে, তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে নারীর ওপর শরীআতের অধিকাংশ বিধানই প্রযোজ্য হবে না।

নারীর সাক্ষ্য প্রয়োজনের তাগিদেই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআন মজীদের বক্তব্য থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ একেবারেই ভ্রান্ত। এ মতের ধারক ও বাহকগণ নিজেরাই স্বীকার করেন যে, দু'জন পুরুষ সাক্ষ্যদাতা থাকা সত্ত্বেও একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই বক্তব্যের একটি বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলো, ঋণ আদান-প্রদান হোক বা অনুরূপ অন্য কোনো ব্যাপার হোক সরাসরি তার মুখোমুখি হতে হয় পুরুষকে। এ কারণে শরীআত মূলতঃ তাদের সাক্ষ্যের বিধান এখানে বর্ণনা করেছে। পারিবারিক ও ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নারীর এসব ব্যাপারে অংশ গ্রহণের খুব অল্পই সুযোগ হয়। অতএব, তার সাক্ষ্য দানের বিষয়টা এখানে প্রাসঙ্গিক ব্যাপার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

একইভাবে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কোনো না কোনো পুরুষকে সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে তার সাথে শরীক থাকতে হবে, তাদের এ যুক্তি-প্রমাণও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এ ধরনের যুক্তি প্রমাণকে সঠিক বলে মেনে নিলে একথাও মেনে নিতে হবে যে, এ আয়াতে সাক্ষ্যদানের যে দু'টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে কোনো দাবী প্রমাণ করার জন্য কেবল ঐ দু'টি পথই আছে। অথচ ইমাম মালেক র. ও ইমাম শাফেয়ী র. স্বীকার করেন যে, আয়াতটিতে যেসব উপায় ও পদ্ধতির উল্লেখ আছে তা থেকে সরে গিয়ে কেউ যদি তার দাবী প্রমাণ করার জন্য কেবল একজন সাক্ষী পেশ করে এবং নিজে শপথ করে তাহলে তার দাবী প্রমাণিত হবে।

---

১. কিতাবুল উম্ম, ৭ম খণ্ড ,পৃষ্ঠা-৪৩।

www.bjilibrary.com

হানাফীগণ এসব আপত্তি অভিযোগ থেকে নিজেদের দূরে রেখে অত্যন্ত সতর্ক ও যুক্তিসংগত ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। হানাফী ফিকাহর চিন্তাধারা ও দর্শন সম্পর্কে একই চিন্তা-গোষ্ঠীভুক্ত সুপণ্ডিত আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস র. বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নীচে আমরা তাঁর আলোচনা আমাদের ভাষায় হুবহু উদ্ধৃত করলাম।

"কোনো অবস্থায়ই আয়াতটির অর্থ এ নয় যে, নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের বিকল্প। কারণ, সে অবস্থায় তার অর্থ হবে, সাক্ষ্যদানের পদ্ধতি মূলত একটিই। কিন্তু তা ঠিক নয়। কেননা, সমস্ত মুসলমান ন্যূনতম এতটুকু ঐকমত্য পোষণ করেন যে, দু'জন পুরুষের অবর্তমানে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী হতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, কুরআন মজীদ সাক্ষ্যদানের দু'টি ভিন্ন ব্যবস্থা পেশ করেছে।"

নারীর এ মর্যাদা যখন স্বীকৃত যে, সে সাক্ষী হতে পারে, তখন যেখানেই সাক্ষ্যের প্রয়োজন দেখা দেবে সেখানেই আমরা তাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করতে পারি। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لانكاح الا بولى وشاهدين.

"একজন অভিভাবক ও দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়।"

আয়াতে বর্ণিত সাক্ষ্যদান নীতি অনুসারে বিয়েতে দু'জন পুরুষ সাক্ষী কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন মেয়ে সাক্ষী নির্ধারণ করা আমাদের জন্য জায়েয। শরীআতের একটি নীতি হলো ঃ

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.

(দাবীদারের দায়িত্ব হলো প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদী বা আসামীর দায়িত্ব হলো শপথ করা) এ নীতি অনুসারে কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রমাণ হিসেবে নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য পেশ করে তাহলে তার দাবী প্রমাণিত বলে ধরে নেয়া উচিত।

আয়াতের ভাষা—একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যখন তোমরা ঋণ আদান-প্রদান করো—প্রমাণ করে যে, নারীর সাক্ষ্য কেবল মাত্র অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, এ বক্তব্যের মাধ্যমে শুধু ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআন তার সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেনি। বরং ঋণ পরিশোধের জন্য যে মেয়াদ নির্দিষ্ট হবে সে ব্যাপারেও তার বক্তব্যের ওপর নির্ভর করতে নির্দেশ দান করেছে। একথা কেউ বলতে পারে না যে, মেয়াদ বা সময় নির্ধারণ শুধু মাত্র আর্থিক ব্যাপারেই প্রয়োজন হয়। কেননা, জীবনের নিরাপত্তা দান এবং স্বাধীন মানুষের সাথে আর্থিক নয় এ রকম বিষয়েরও মুনাফা ও মেয়াদ নির্দিষ্ট হতে

www.bjilibrary.com

পারে। অনুরূপভাবে হত্যার দাবী অথবা হত্যার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করার জন্য আদালতের বিচারক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতে পারেন। সাময়িকভাবে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টি শুধু আর্থিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত তবুও বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কারণ, একজন পুরুষের জন্য একজন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার মোহরানা প্রদানের ভিত্তিতে অর্জিত হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি নির্ভেজাল আর্থিক ব্যাপার।

অনুরূপভাবে বক্তব্যের বাহ্যিক দাবী যা বুঝা যায় তাহলো, ঋণের অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহে পুরুষ ও নারীর যৌথ সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এখন আমাদের দেখতে হবে, ঋণ বলতে কি বুঝায়? ঋণ তো এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, একটি জিনিস এ মুহূর্তে দেয়া হবে কিন্তু তার বিনিময় পরে পরিশোধ করা হবে। অনেক ক্ষেত্রেই এ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, এক ব্যক্তি বিয়ের মাধ্যমে কোনো নারীকে সম্ভোগ করার অধিকার অর্জন করলো কিন্তু তার বিনিময় অর্থাৎ মোহরানা পরে পরিশোধ করবে বলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল অথবা হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে মীমাংসা হলো উক্ত অর্থ হত্যার বিনিময় হিসেবে গণ্য হবে। ভাড়ার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অর্থাৎ ভাড়ায় কোনো জিনিস যে সময় দেয়া হচ্ছে তার বিনিময় আমরা পরে পাচ্ছি। কর্জ বা ঋণ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। অতএব, লেনদেন ও আদান-প্রদানের যেসব ক্ষেত্র ও অবস্থায় এ অর্থ পাওয়া যাবে সেখানেই কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত।

বাস্তবেও এমন বহু নজীর আছে যা থেকে আমাদের এ ধ্যান-ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত হুযায়ফা রা. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধাত্রীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। একথা সবারই জানা যে, সন্তান প্রসবের বিষয়টির অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারের সাথে আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। এ ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ভিন্ন মত থাকলে তা আছে সাক্ষীর সংখ্যা সম্পর্কে, সাক্ষ্যের ব্যাপারে নয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর সাক্ষ্যদান শুধুমাত্র আর্থিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়।

'আতা ইবনে আবী রাবাহ র. বলেন ঃ হযরত উমর রা. বিয়ের ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্যকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রা.-ও অনুরূপ মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আবু লাবীদ বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর রা. তালাক সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন। আতা (তাবেয়ী)

www.bjilibrary.com

এবং শা'বী র.-ও তালাক সম্পর্কিত বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া র. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য জায়েয। কাজী শুরাইহ র. দাসত্ব বিষয়ে নারী পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য সঠিক বলে স্বীকার করেছেন।

এসব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা বলতে চাই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। তবে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে যদি শরীআত নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে তাহলে তা ভিন্ন কথা, যেমন করেছে হুদুদ (শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) ও কিসাসের ব্যাপারে।

ইমাম যুহরী র. বর্ণনা করেন ঃ

مضت السنة من رسول الله ﷺ وللخليفتين من بعده ان لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى القصاص.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরের দুই খলিফা হযরত আবু বকর রা. ও হযরত 'উমর রা.-এর সুন্নাত বা নীতি-পন্থা ছিল, তাঁরা 'হুদুদ' ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য বৈধ মনে করতেন না।"[১]

হানাফী ফিকাহর আরো একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত আল্লামা ইবনে ইলহাম র. নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার মধ্যে ওপরে আলোচিত যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করছি। যাতে বিষয়টি তার প্রকৃত রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য সহ স্পষ্ট হয়ে সামনে আসে।

সাক্ষ্যদান চার প্রকারের

এক ঃ যেনা বা ব্যভিচারের সাক্ষ্যদান। চারজন পুরুষের সম্মিলিত বর্ণনা দ্বারা এ সাক্ষ্য পূর্ণতা লাভ করে। তাই কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছে ঃ

فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ـ النساء : ١٥

"ব্যভিচারিণীদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্য থেকে চারজনকে সাক্ষী বানাও।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৫

এখানে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের সম্বোধন করে "তাদের মধ্যে থেকে চার" কথাটি ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে যদি তিনজন পুরুষ এবং দু'জন

১. আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ৫৯৬ থেকে ৫৯৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

www.bjilibrary.com

নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তাহলে কুরআনে বর্ণিত সংখ্যা দ্বারা যাদের গণনা করা হয়েছে তার উভয়টিরই পরিপন্থী হয়। বড়জোর বলা যেতে পারে যে, যৌথ সাক্ষ্যের সাধারণ মূলনীতি এবং এ আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। অর্থাৎ এ মূলনীতির দাবী হলো প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়াটাই যথাযথ। কিন্তু এ আয়াত ব্যভিচারের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এর জবাব হলো, দ্বিতীয় এ আয়াতটিকে এ সাধারণ মূলনীতির ওপর অধিকার প্রদান করা হবে। কারণ, বৈধ হওয়া ও হারাম হওয়ার মধ্যে যেখানেই সংঘাত হবে নিয়ম বা সূত্র অনুসারে সেখানেই হারাম হওয়ার বিধানটিই মেনে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, শরীআতের নির্দেশ হলো যতদূর সম্ভব তোমরা 'হুদুদ' বা শরীআত নির্ধারিত শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করো। ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য যদি চারজন সাক্ষীই পুরুষ হওয়া জরুরী হয় এবং তাতে কোনো নারীকে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এ শর্তের কারণে ব্যভিচার প্রমাণ করা ততো সহজ হবে না যতো সহজ হবে এ শর্ত না থাকলে। এভাবে শরীআতের উদ্দেশ্য পূরণও সহজ হবে।

তৃতীয় কথা হলো, কুরআন যে ভাষায় নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছে অর্থাৎ যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে সাক্ষী বানাও। একথার অর্থ এ নয় যে, যৌথ সাক্ষ্যের স্বতন্ত্র কোনো মর্যাদা নেই। তা বরং দু' পুরুষের সাক্ষ্যের বিকল্পতা সত্ত্বেও কুরআনের এ বক্তব্য থেকে এ সাক্ষ্যের বিকল্প হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং একজন আলেম বিকল্প হওয়ার এ সন্দেহ পোষণও করেছেন। আর সন্দেহ সৃষ্টি হলে হুদুদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জায়েয নয়।

দুই ঃ ব্যভিচার ছাড়া অন্যান্য হুদুদের সাক্ষ্য। এ দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে উপরোল্লেখিত কারণে নারীর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়। তবে তা প্রমাণের জন্য চারজনের পরিবর্তে দু'জন পুরুষ সাক্ষীই যথেষ্ট। কিসাসের বেলায়ও একই বিধান প্রযোজ্য।

তিন ঃ তৃতীয় প্রকারের সাক্ষ্যের মধ্যে কিসাসের হুদুদ বা নির্ধারিত শাস্তি এবং নারীর বিশেষ সমস্যাসমূহ ছাড়াও অন্য সব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। আর্থিক অধিকারসমূহের সাথে তার সম্পর্ক থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। যেমন বিবাহ, তালাক থেকে রুজু করা, ইদ্দত পালন, গর্ভধারণ নিবৃত্তি, সন্তান, বংশ ও বংশ মর্যাদা, ওয়াকফ, সন্ধি, দান, স্বীকৃতি, অছিয়ত, উকালত এবং দাস

www.bjilibrary.com

মুক্ত করা ইত্যাদি। এর সবগুলো ব্যাপারে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য যেমন গ্রহণযোগ্য তেমনি একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।

চার ঃ এরপর শুধুমাত্র সেসব বিষয় অবশিষ্ট থাকে যেসব বিষয়ে কেবল মেয়েদেরই জানা থাকতে পারে। যেমন ঃ জন্ম, কুমারিত্ব, গোপনীয় স্থানসমূহের দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি। সুতরাং এসব বিষয়ে একজন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর যদি পুরুষ সাক্ষী পাওয়া যায় তবে তা আরো ভালো।

এ আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান দিক হলো, হানাফী ফিকাহবিদগণ অন্য কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদদের তুলনায় এ বিষয়টি ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং শরীআতের বক্তব্য ও দলিলের পেছনে যেসব কার্যকারণ ও যুক্তি কাজ করেছে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। ফলে তারা নারীর বুদ্ধি-বিবেক এবং বোধ ও উপলব্ধিকে পুরোপুরি অনির্ভরযোগ্য অথবা নির্ভরযোগ্য মনে করলেও জীবনের একটি বা কয়েকটি দিকের মধ্যেই বিবেচ্য বলে মনে করেননি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সত্য যে, হানাফী ফিকাহ এ বিষয়টির কোনো সমাধান দিতে পারেনি যে, জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতটুকু পরিমাণে নারীর বুদ্ধি বৃত্তিক শক্তিসমূহের ওপর নির্ভর করা সঠিক। এ কারণে আমরা মনে করি, তাদের চিন্তাধারার মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান।

হানাফী ফিকাহবিদগণ জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে যেভাবে ভাগ করেছেন তাতে ব্যভিচার ও নির্দিষ্ট মেয়েলী সমস্যাসমূহ ছাড়া আর সব সমস্যা ফায়সালার জন্য কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক বলে মনে করেছেন। সর্বাবস্থায়ই দু'জন সাক্ষী আবশ্যক না কি একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেও ফায়সালা করা যায় এখানে আমরা এ শর্তটি সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনায় অবতীর্ণ হচ্ছি না। বরং আপাতত এ শর্তটি মেনে নিয়ে প্রশ্ন করতে চাই যে, মেয়েলী সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার মধ্যে এমন কি মৌলিক পার্থক্য যার কারণে প্রথম প্রকারের সমস্যার ক্ষেত্রে শুধু একজন সাক্ষী যথেষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় প্রকারের সমস্যার জন্য তা হয় না ? সমকালীন হানাফী ফিকাহর ইমাম আল্লামা বদরুদ্দীন কাশানী র. (মৃত্যু ৫৮৭ হিজরী)-এর যে জবাব দিয়েছেন প্রথমে তা লক্ষ করুন। তিনি বলেন ঃ

নবী-রাসূল ছাড়া আর কারো সাক্ষ্য দ্বারা অকাট্য ও নিশ্চিত কোনো জ্ঞান লাভ করা যায় না। কারণ, তাতে সর্বাবস্থায় কোনো না কোনো দিক থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। শুধু নবী-রাসূলগণই এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকেন যে, তাঁদের বক্তব্য সবরকম সন্দেহের ঊর্ধে। কোনো সত্যবাদী

www.bjilibrary.com

ও বিশ্বস্ত মানুষের সাক্ষ্য বড়জোর একটা দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। আর দৃঢ় ধারণা লাভের জন্য (নারী হোক বা পুরুষ হোক) একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মানুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কুরআন মজীদ সাক্ষ্যদানের জন্য যে নীতিমালা নির্ধারণ করেছে তা নিছক ইবাদাত। এর অন্তর্নিহিত যুক্তি ও কৌশল বুদ্ধি-বিবেকের গণ্ডি বহির্ভূত। তাই এসব নীতিমালার যে রূপরেখা ও নিয়ম-কানুন শরীআত নির্দিষ্ট, অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা উপরোক্ত নীতি মেনে চলবো। সুতরাং নারী যখন পুরুষের সাথে একত্রিত হয়ে সাক্ষ্যদান করছে তখন ইসলাম তার সাক্ষ্যদানের একটা বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে কেবল নারীই সাক্ষী সেসব ক্ষেত্র সম্পর্কে কুরআন কোনো বক্তব্য পেশ করেনি। সেসব ক্ষেত্রে আমরা সে সাধারণ সূত্র অনুসারে কাজ করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন আদর্শ থেকেও আমরা এর সমর্থন পাই। তিনি জন্মের ব্যাপারে একজন মাত্র ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।[১]

এ প্রমাণটি সম্পর্কে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। প্রথম আপত্তি হলো, এ প্রমাণটিকে যদি সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়, তা হলে নারীদের নির্দিষ্ট সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্যই পূর্ণাঙ্গ এবং একজন পুরুষের সাক্ষ্য অপূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ, শরীআত সাক্ষ্যের যে নিয়ম-কানুন ও রূপরেখা পেশ করেছে তাতে হয় দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের উল্লেখ আছে নয়তো একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্যের উল্লেখ আছে। শুধু একজন পুরুষের সাক্ষ্যের উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু হানাফী ফিকাহবিদদের কাছে এর জবাব এ ছাড়া আর কিছুই নেই যে, যেসব ব্যাপারে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে সেসব ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্য আরো অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। এ নীতির দ্বিতীয় দাবী হলো, দৃঢ় ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে পুরুষ এবং নারী যখন সমান তখন উভয়ের সমান মর্যাদা পাওয়া উচিত। কিন্তু হানাফীগণ কোনো ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের বুদ্ধি-বিবেক ও বোধকে সমান মনে করেননি।

এর তৃতীয় দাবী হলো, দুনিয়ার প্রতিটি ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শুধু একজন সাক্ষ্যই যথেষ্ট হওয়া উচিত। অথচ বিভিন্ন ব্যাপারে কুরআন সাক্ষীর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করেছে। এর জবাবে একথা বলা ঠিক নয় যে, সাক্ষীর নেসাব বা সংখ্যা একটি ইবাদাতের হুকুম মাত্র। কারণ, নির্দেশের মধ্যে স্পষ্ট যুক্তি ও কৌশল আছে। আল্লামা কাশানী নিজেও যা স্বীকার করেছেন ঃ

ولانه اذا كان فردا يخاف عليه السهو والنسيان لان الانسان مطبوع على السهو والغفلة فشرط العدد فى الشهادة ليذكر البعض البعض عند

১. বাদায়েউস সানায়ে'। ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৮।

www.bjilibrary.com

اعتراض السهو والغفلة كما قال الله تعالى فى اقامة امرأتين مقام رجل فى الشهادة وان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى.

"শুধু এক ব্যক্তির ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। কেননা মানুষের প্রকৃতিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অসতর্কতা বিদ্যমান। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সংখ্যার শর্তারোপ করা হয়েছে এজন্য যে, যদি ভুল হয়ে যায় কিংবা অসতর্কতা এসে পড়ে তাহলে সাক্ষীরা পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারীর এ কারণটিই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ ভুলে গেলে অন্যজন যাতে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"[১]

প্রকৃতপক্ষে এটাই যদি যুক্তি ও কৌশল হয়ে থাকে ; আর যুক্তি এবং কৌশলও এমন যে, তা উপেক্ষা করে একজন মাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতিই আমরা দেই তাহলে এর স্বাভাবিক দাবী হবে, মেয়েলী সমস্যাসমূহের ফায়সালার জন্য কমপক্ষে দু'জন নারীর সাক্ষ্যকে আবশ্যক করে দিতে হবে। এটাই ইমাম মালেক র.-এর মত। তাছাড়া নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাকে দুর্বল বলে ধরে নিলে তো চারজন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া কোনো ফায়সালা করা সঠিক বলে মনে হয় না। এটাই ইমাম শাফেয়ী র.-এর মত। হানাফী ফিকাহবিদগণ তাদের মতের সমর্থনে যে হাদীসের বরাত দিয়েছেন সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো। এ ক্ষেত্রে হানাফী ফিকাহবিদগণ একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, তাহলো হুদুদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কারণ, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ায় তার সাক্ষ্যে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু হুদুদ ও কিসাস প্রমাণের জন্য শরীআত অকাট্য ও অত্যন্ত নিশ্চিত দলিল-প্রমাণ দাবী করে। অবশিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে শরীআত ততটা অকাট্যতা আবশ্যক বলে মনে করে না। তাই দলিল-প্রমাণের মধ্যে কিছুটা সন্দেহ-সংশয় থাকা সত্ত্বেও তার ভিত্তিতে ফায়সালা করা যেতে পারে।

এ মূলনীতি অনুসারে হুদুদ ও কিসাস ছাড়া অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের ফায়সালা শুধু নারীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সঠিক হওয়া উচিত। কিন্তু হানাফী ফকীহগণ নারীদের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ ক্ষেত্রগুলো ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তুত নন যতোক্ষণ না কোনো পুরুষ সাক্ষী হিসেবে তাদের সাথে শামিল হবে। এ আপত্তির জবাব তারা এভাবে দিয়েছেন ঃ

১. আল বাদায়েউস সানায়ে, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.-২৭৭।

www.bjilibrary.com

انَّ القياس يقتضى قبول ذالك لكنه ترك ذالك كى لايكثر خروجهن.

"কিয়াসের দাবী হলো, শুধু নারীদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তা কার্যকরী না করার কারণ হলো, এভাবে ঘরের বাইরে নারীদের গমনাগমন অধিক মাত্রায় হতে থাকবে।"[১]

চিন্তা করে দেখুন, এটা কত দুর্বল দলিল ! এক ব্যক্তি যদি চারজন মজবুত চরিত্রের নির্ভরযোগ্য মহিলার সামনে কোনো দুঃস্থ ও অভাবী মানুষের জন্য অছিয়ত করে যায় তাহলে ইসলামী শরীআতের দাবী কি এই হবে যে, এসব মহিলাকে যাতে ঘরের বাইরে বের হতে না হয় সেজন্য এ অছিয়ত কার্যকর হওয়ার নির্দেশ দেয়া যাবে না। নাকি ইসলামী শরীআতের দাবী এই হবে যে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এসব মহিলাকে ঘরের বাহিরে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে ?

নারীদেরকে পুরুষের বিকল্প হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করা সত্ত্বেও তাদের বক্তব্য ও বিবৃতিতে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থেকে যায়। হানাফীদের এ দাবী সম্পর্কেই মূল প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ, মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে এ দাবীর সমর্থন পাওয়া যায় না। মনে করুন, মেয়েদের কোনো সমাবেশে ঝগড়া হলো এবং পরিণামে একজন মহিলা নিহত হলো। হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং বাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারিণী আটজন মহিলা সম্মিলিতভাবে বক্তব্য পেশ করলো। বিবেক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা কি বলে যে, তাদের এ সাক্ষ্যের এতটুকু গুরুত্বও নেই যতটুকু গুরুত্ব আছে চারজন সাধারণ পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের। এর চেয়ে অধিক বিস্মিত হতে হয় একথা চিন্তা করে যে, কোনো আর্থিক লেনদেনের চুক্তির ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য হানাফীদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য কিন্তু চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ আরোপ ইত্যাদি বিষয়ের মামলার ক্ষেত্রে একটি দু'টি নয়, বহুসংখ্যক মহিলার সাক্ষ্যও নির্ভরযোগ্য নয়। নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে এটা চরম কুধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। হানাফী ফিকাহয় এ ধ্যান-ধারণা কিভাবে স্থান পেল তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। অথচ হানাফী ফিকাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হলো, এর শিক্ষাসমূহ মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে আবেদন করে।

আল্লামা ইবনে হাযম র. বাস্তবের কত নিকটবর্তী কথাই না বলেছেন ঃ

وبضرورة العقل يدرى كل احد انه لافرق بين امرأة وبين رجل وبين رجلين وبين امرأتين وبين اربعة رجال وبين اربعة نسوة فى جواز تعمد الكذب

---

১. আল-ইনায়াতুল মাতবু', আলা হাশিয়াতি ফাতহিল কাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮।

www.bjilibrary.com

والتواطى عليه وكذالك الغفلة ولوحينا الى هذا لكان النفس اطيب على شهادة ثمانى نسوة منها على شهادة اربعة رجال.

"একথা স্পষ্টত প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা বা মিথ্যার ওপরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একজন নারী ও একজন পুরুষ, দু'জন নারী ও দু'জন পুরুষ এবং চারজন পুরুষ ও চারজন নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অসতর্ক হওয়ার ব্যাপারেও নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। যদি তা সামান্য সময়ের জন্যও হয়। (নারী ও পুরুষের উভয়েই এর শিকার হতে পারে)। এ দিক দিয়ে বিচার করলে চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের তুলনায় আটজন নারীর সাক্ষ্যে মন বেশী তৃপ্তি লাভ করে।"[১]

আল্লামা ইবনে কাইয়েম র. লিখেছেন ঃ

انّا لانسلم ضعف شهادة المرأتين اذا اجتمعتا ولهذا انحكم بشهادتهما مع الرجل وان امكنه ان يأتى برجلين فالرجل والمرأتان اصل لابدل والمرأة العدل كالرجل فى الصدق والامانة والديانته الاّ انّها لمّا خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها وذالك قد يجعلها اقوى من الرجل الواحد اومثله ولا ريب انّ الظّنّ المستفاد من رجل واحد دونهما ودون امثالها.

"দু'জন স্ত্রী লোক একমত হয়ে সাক্ষ্য দিলেও তা দুর্বল সাক্ষ্য হবে আমরা একথা স্বীকার করি না। এ কারণে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও আমরা পুরুষের সাথে দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করে থাকি। অতএব, এ ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক মূল বিষয়, কোনো বিকল্প নয়। সততা, বিশ্বস্ততা ও দীনদারীর ক্ষেত্রে একজন মহিলা একজন পুরুষের মতোই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার ভুল-ত্রুটির আশংকা থাকার কারণে তার মতো আরেকজন স্ত্রীলোকের সাহায্যে তাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। অন্য একজন নারীর সমর্থন তাকে একজন পুরুষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কিংবা অন্তত পক্ষে তার সমকক্ষ করে দেয়। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য থেকে যে ধারণা লাভ করা যায় তা দু'জন স্ত্রীলোকের কিংবা তার মতো আরো একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য থেকে অর্জিত ধারণা থেকে নীচু মানের হয়ে থাকে।"

---

১. আল মহাল্লা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৩।

www.bjilibrary.com

হুদুদের (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ না করার ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণ আরো যে কয়টি দলিল পেশ করেছেন তাও দুর্বল। যেমন ব্যভিচারের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে কুরআন পুরুষদের সম্বোধন করে বলেছে ঃ তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী হবে। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ সম্বোধনের মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত। এখন প্রশ্ন হলো, স্ত্রীলোকদের এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করলে সংখ্যা চারের অধিক হয়ে যায়। কারণ, একজন পুরুষের স্থলে একজন স্ত্রীলোককে নেয়া যাবে না বরং দু'জন স্ত্রীলোককে নিতে হবে। আমাদের মতে এ বিষয়টির শরীআতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে কোনো মিল নেই। কারণ, এখানে বিশেষ কোনো সংখ্যার আদৌ কোনো গুরুত্ব নেই। বরং গুরুত্বের বিষয় হলো উক্ত সংখ্যা দ্বারা অর্জিত বিশ্বাস ও নির্ভরতার। যদি দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা একজন পুরুষের সাক্ষ্যের মতো বিশ্বাস ও নির্ভরতা লাভ করা যায় তাহলে তা গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা-সংকোচ থাকা উচিত নয়।

হানাফী এবং অন্য যেসব ফকীহ কিসাসের হুদুদের ব্যাপারে নারীর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য মনে করেননি। আমরা আল্লামা জাসসাসের যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি তার শেষাংশ তাদের সর্বাপেক্ষা বড় দলিল। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের সুন্নাত হলো কিসাসের হুদুদের ব্যাপারে কোনো নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। জাসসাস র. নিজেও এ হাদীসের কোনো সনদ বর্ণনা করেননি। তবে ইবনে আবী শায়বা র.-এর বরাত দিয়ে ইবনুল হুমাম হাদীসটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী শায়বা হাদীসটি হাফস ইবনে গিয়াস থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ তাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও মুদাললিস বা প্রতারক বলে মনে করতেন।[১] তার এ দুর্বলতা উপেক্ষা করা হলেও হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে হয় না। কারণ, হাফস হাদীসটি পেয়েছেন আরতার মাধ্যমে। আর 'আরতা' ইমাম যুহরী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। হাজ্জাজ ইবনে আরতার বিরুদ্ধেও সর্বসম্মতভাবে প্রতারণার অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। সেজন্য অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে তার বর্ণনার ওপর আমল করা যায় না। ইমাম আহমদ র. বলেন, হাজ্জাজ ইমাম যুহরীকে দেখেছে ইয়াহইয়া একথাটিই অস্বীকার করেছেন। হাজ্জাজ সম্পর্কে তিনি এতো খারাপ মত পোষণ করতেন যে, আমরা অধিক আলোচনা করার সাহস পেতাম না। ইয়াহইয়া বলেন ঃ হাজ্জাজ ইবনে আরতা আমাকে বলেছিলেন ঃ ইমাম যুহরী র.-এর চেহারা ও আকার-আকৃতি কিছুটা বর্ণনা করুন। কারণ আমি তাকে দেখিনি।[২]

---

১. তাহযীবুত তাহযীব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৫ থেকে ৪১৮।
২. হাজ্জাজ ইবনে আরতাত সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, মীযানুল ই'তিদাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৩ এবং তাহযীবুত তাহযীব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৬ থেকে ১৯৮ পর্যন্ত।

www.bjilibrary.com

এ কারণে আল্লামা ইবনে হাযম র. এ রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।[১]

এদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বৈধ মনে করে। তবে পুরুষের কর্মজীবনের সাথে যেসব বিষয় সরাসরি সম্পর্কিত এবং নারীর কর্মক্ষেত্র বহির্ভূত সেসব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যে পুরুষের সাক্ষ্যের তুলনায় অধিক ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

তার কারণ, কোনো সত্য পর্যন্ত পৌছতে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধি যতটা সাহায্য করে তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক গঠন এবং বাস্তব কর্মতৎপরতাও ততোটা সাহায্য করে। একটি ঘটনা কারো মনযোগ তাৎক্ষণিকভাবে আকর্ষণ করে। সে তার গভীরে পৌছার জন্য এবং তার সবকিছু অবগত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু আরেক জনের জন্য তাতে আদৌ কোনো আকর্ষণ থাকে না এবং সে হাল্কাভাবে তা গ্রহণ করে। একজন ব্যাবসায়ীর মন-মস্তিষ্ক জ্ঞানচর্চামূলক কাজে ততোটা তৎপর হয় না যতটা হয় একজন ছাত্রের মন-মস্তিষ্ক। বরং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার অবস্থা এই যে, এক শাখার বিশেষজ্ঞের পক্ষে অন্য শাখার জ্ঞানার্জন করাও কঠিন হয়ে যায়। নারীর অবস্থাও ঠিক তাই। তার মন-মগজ ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন এবং তার কর্মজগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই সে তার কর্মক্ষেত্রের বাইরে সংঘটিত ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ ততো সুন্দরভাবে করতে পারে না যতো সুন্দরভাবে পুরুষ করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী শরীআত এসব ঘটনার ব্যাপারেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে। যেসব বিষয় নারীর জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতি ও কর্মতৎপরতার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেসব ব্যাপারে তার বুদ্ধি-বৃত্তিক যোগ্যতার ওপর শরীআতের আস্থা স্থাপনই তার প্রমাণ।

আর যেসব ব্যাপারে তারা রাতদিন ব্যস্ত থাকে এবং যা তাদের রুচি ও আগ্রহের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত তার সাক্ষ্যকে পুরুষের সাক্ষ্যের মতোই মর্যাদা প্রদান করে। বরং ...বী র. তো এতোদূর পর্যন্ত বলেন ঃ

من الشهادات مالا يجوزفيه الاّ شهادة النساء.

"সাক্ষ্যের এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে কেবল নারীদের সাক্ষ্যই বৈধ।"

কোনো ঘটনা প্রমাণিত হওয়া শুধু এক বা দু' ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্যের ওপরই নির্ভর করে না, বরং তার ভেতরের ও বাইরের বহু আলামত ও নিদর্শন মূল সত্যের প্রতি ইংগিত করে। কিন্তু এসব আলামত ও নিদর্শনের বেশীর

১. আল মহল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০৩।

www.bjilibrary.com

ভাগ স্পষ্ট ও অকাট্য না হয়ে ইংগিত সূচক হয়ে থাকে। এ কারণেই শরীআত চূড়ান্ত ফায়সালার ভিত্তি স্থাপন করে মানুষের অখণ্ডনীয় ও স্পষ্ট সাক্ষ্যের ওপর। তবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সব ব্যাপারেই এসব আলামত ও নিদর্শনকে শরীআত অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। যদি এসব আলামত কোথাও স্পষ্টরূপে বর্তমান থাকে কিংবা সতর্কতা ও সাবধানতা কোনো বিশেষ ধরনের ফায়সালার দাবী করে তাহলে শরীআত সেখানে শুধু একজন সাক্ষীকেও যথেষ্ট মনে করে। নারীর বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রেও শরীআত এ একই পন্থার অনুসরণ করে।

ইমাম যুহরী বলেন : তিনটি ভিন্ন পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার পর এক মহিলা হযরত উসমান রা.-এর কাছে এসে বললো, এরা সবাই আমার দুধ সন্তান। আমি তাদের সবাইকে আমার বুকের দুধ পান করিয়েছি। তার এ সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করেই হযরত উসমান রা. তাদের সবার বিয়ে বাতিল করে দিলেন।

ইমাম যুহরী রা. বলেন, দুধ পানের বেলায় সবাই হযরত উসমানের এ সিদ্ধান্তের ওপরই আমল করে থাকে।[১]

❐

১. আততুরুকুল হিকামিয়া ফিস সিয়াসাতিশ শারীয়া, পৃষ্ঠা-৩৮।

www.bjilibrary.com

হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে নারীর ওপর আস্থা

একইভাবে মুসলিম উম্মা জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে নারীর বর্ণিত হাদীসের ওপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করেছে এবং পুরুষ ও নারীর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করেনি বরং উভয় প্রকার হাদীসকেই সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। কতোটা গুরুত্ব প্রদান করেছে একটা ঘটনা থেকেই তা অনুমান করা যেতে পারে। বিখ্যাত সাহাবা হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রা.-এর বোন ফারিয়ার স্বামীর কতকগুলো উট হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি উটগুলোর অনুসন্ধানে বের হলেন এবং পেয়েও গেলেন। কিন্তু উটগুলো অকস্মাত তার ওপর হামলা করে বসলো। ফলে তিনি নিহত হলেন। ফারিয়া নবী স.-এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বললেন, আমার স্বামী ইনতিকাল করেছেন। কিন্তু তিনি আমার জীবন যাপনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো অর্থকড়ি রেখে যাননি এবং তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য কোনো বাসস্থানও রেখে যাননি। তাই আমি আমার ভাইদের কাছে থাকতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? নবী স. বললেন ঃ সেই ঘরেই তোমাকে ইদ্দতের দিনগুলো কাটাতে হবে যে ঘরে অবস্থান কালে তুমি তোমার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছ।

হযরত উসমান রা.-এর শাসন কালে তাঁর কাছে একই ধরনের একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। লোকজন তাঁকে জানালো যে, ফারিয়াও একই সমস্যায় পড়েছিল। অতএব নবী স. তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা জেনে নেয়া দরকার। ফারিয়া বর্ণনা করেন ঃ হযরত উসমান রা. আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম তিনি কিছু সংখ্যক লোকের সাথে বসে আছেন। আমি আমার ব্যাপারে নবী স.-এর ফায়সালা তাকে শুনালে তিনি আমার এ নজীর অনুসারে কাজ করলেন এবং যে মহিলার ব্যাপারে এ সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাকে আদেশ দিলেন যে, যে ঘরে তার স্বামীর ইনতিকাল হয়েছে সেই ঘরেই সে ইদ্দত পালন করবে।[১] এভাবে হযরত উসমান রা. ফারিয়া রা.-এর বর্ণনাকে আইনগত মর্যাদা দান করলেন।

কোনো কোনো হাদীস এমন সব সনদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যার মধ্যে কয়েকজন বর্ণনাকারীই মহিলা। যেমন ইমাম মুসলিম রা. ফিতান সম্পর্কিত একটি হাদীস আবু বকর ইবনে আবী শায়বা, সা'ঈদ ইবনে আমর, যুবায়ের ইবনে হারব এবং ইবনে আবী 'উমর থেকে গ্রহণ করেছেন। এ চারজনই পরম্পরাগতভাবে সুফিয়ান ইবনে 'উয়াইনা, ইমাম

---

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৭।

www.bjilibrary.com

যুহরী, 'উরওয়া, যয়নাব বিনতে আবী সালামা, হাবীবা, তিনি তাঁর মা উম্মে হাবীবা এবং যয়নাব বিনতে জাহাশ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১]

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিই সা'ঈদ ইবনে আবদুর রহমান ও অন্য লোকের মাধ্যমে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।[২]

হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও জানে যে, ইবনে আবী শায়বা, সা'ঈদ ইবনে আবদুর রহমান, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইমাম যুহরী এবং উরওয়া ইবনুয যুবাইর কোন্ পর্যায়ের মুহাদ্দিস। আর ইমাম মুসলিম ও তিরমিযীর নামই তাদের মর্যাদা ও মহত্বের প্রমাণ। এভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রত্যেক যুগের বড় বড় মুহাদ্দিস এ রেওয়ায়েতটিকে কতখানি গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

শুধু তাই নয়, হাদীস শাস্ত্রবিদগণ হাদীসের ব্যাপারে নারীদের জারহ ও তা'দীল' বা পর্যালোচনা, সমালোচনা ও সংশোধনী মেনে নিয়েছেন এবং তাদের মতামতের আলোকে কোনো রাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ বা বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[৩]

সম্ভবত এ ক্ষেত্রে মনে একটি প্রশ্ন জাগবে। তাহলো, যখন আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, অভ্যাস ও রীতিনীতি, লেনদেন, নৈতিকতা ও আইন-কানুন মোটকথা জীবনের সবদিক ও বিভাগ সম্পর্কে নারীদের বর্ণিত হাদীসসমূহকে পুরুষদের বর্ণিত হাদীসসমূহের মতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তখন জীবনের সমস্ত ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্যকে পুরুষের সাক্ষ্যের মতো মর্যাদা দেয়া হয়নি কেন ? আমাদের মতে এর কারণ নিছক মনস্তাত্ত্বিক ছাড়া আর কিছুই নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর সাথে চরম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আবেগ-অনুভূতি জড়িত থাকে। তাই অন্যান্য সাধারণ ঘটনাবলীর তুলনায় তার মধ্যে অবহেলা ও অমনোযোগিতার সম্ভাবনাও সর্বাপেক্ষা কম থাকে। একজন মু'মিন ব্যক্তি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নবী স.-এর শিক্ষা ও আদর্শের অধ্যয়ন করে, বাজারে সংঘটিত ঘটনাবলীর অধ্যয়ন সে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করে না। তাই স্বয়ং শরীআতই সাক্ষ্য ও বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করেছে।

---

১. মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সা'আতি-ফাসলুম মিন আশরাতিস সা'আতি খুরুজু ইয়াজুজ ওয়া মা'জুজ।

২. তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাবু মা জায়া ফী খুরুজি ইয়াজুজা ওয়া মা'জুজ। এ হাদীসের অন্য দু' একটি সনদে হাবীবা র.-এর উল্লেখ নেই। তবে অন্য তিনজন মহিলা রাবীর নাম উল্লেখ আছে। ইমাম বুখারী র. আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিন নুবুওয়া এবং অন্যান্য স্থানে এই দ্বিতীয় সনদটিই উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিমও এই দ্বিতীয় সনদটি গ্রহণ করেছেন।

৩. আল্লামা ইবনে জুযীর গ্রন্থ আল কিফায়াতু ফী ইলমির রেওয়ায়াহ, পৃষ্ঠা-৯৭ ও ৯৮ দেখুন।

www.bjilibrary.com

নারীর যোগ্যতা

পূর্বের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শরীআতের দৃষ্টিতে জীবনের সমস্যাসমূহ দু' ধরনের। কিছু সংখ্যক সমস্যা ও বিষয় এমন যেখানে নারীর জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায়। আবার কিছু সংখ্যক সমস্যা ও বিষয় এমন যে ক্ষেত্রে তার জ্ঞান-বুদ্ধির বিচ্যুতি ও পদস্খলন ঘটার সম্ভাবনা অধিক। শরীআত কর্মক্ষেত্রেও এ বিভক্তি বহাল রেখেছে। তাই একদিকে শরীআত তাকে নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের উপযুক্ত মনে করে না। কারণ, নেতৃত্বের জন্য যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট বাণী হলো ঃ

والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم.

"নারী তার স্বামীর পরিবারের লোকজন ও সন্তান-সন্তুতির তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের হক-সম্পর্কে কতটুকু খেয়াল রেখেছে সে বিষয়ে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।"[১]

হাফেজ ইবনে হাজার র.-এর ভাষায় শুধু বাড়ীর সীমার মধ্যেই নারীকে দায়িত্বশীল করার কারণ হলো ঃ

انّما قيد بالبيت لانها لاتصل الى ماسواه غالبًا الاّ باذن خاص.

"নবী স. তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঘরের মধ্যেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার কারণ ঘর বা বাড়ী ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় সাধারণত তার গমনাগমন বিশেষ অনুমতি ছাড়া হয় না।"[২]

অর্থাৎ ঘরই তার কর্মক্ষেত্র। সুতরাং ঘরের বাইরের কোনো কাজের জন্য তাকে দায়িত্বশীল করার প্রশ্নই ওঠে না। এখন দেখতে হবে, বাড়ীর গণ্ডির মধ্যে তাকে তত্ত্বাবধায়ক বানানোর তাৎপর্য কি?

এর তাৎপর্য হলো, যারা তার তত্ত্বাবধানে আছে তাদের অধিকার ও স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাদেরকে সঠিক পথে চালানো, ভ্রান্ত আচরণ থেকে বিরত রাখা এবং তাদের লাভ-লোকসান ও ক্ষতি-বৃদ্ধির প্রতি এমনভাবে লক্ষ

---

১. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অনুচ্ছেদ ঃ কাওলুল্লাহি তা'আলা আতীয়ুল্লাহা ......। আবু দাঊদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারা, অনুচ্ছেদ ঃ মা ইয়ালযিমুল ইমাম মিন হাককির রা-ঈয়া।

২. ফাতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩২।

www.bjilibrary.com

রাখা একজন রাখাল যেমনভাবে তার মেষপালের প্রতি লক্ষ রাখে। নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এখানেই শেষ হয়ে যায় না। বরং স্বামী যেসব সহায়-সম্পদ এবং সাজ-সরঞ্জাম তার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করেছে তাকে তারও তত্ত্বাবধায়ক এবং আমানতদার বানানো হয়েছে। নবী স. নেককার স্ত্রীর একটি গুণ বর্ণনা করেছেন এই বলে ঃ

وان غاب عنها نصحته فى نفسها وماله.

"স্বামী তার দৃষ্টির আগোচর হলে সে নিজের সতীত্ব ও সম্ভ্রম এবং স্বামীর অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনা করে।"[১]

এছাড়াও ঘরের আভ্যন্তরীন সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. হযরত আলী রা. ও ফাতেমার মধ্যে ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্ম এমনভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন যে, হযরত ফাতেমা রা. বাড়ীর আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম এবং হযরত আলী রা. বাইরের কাজকর্ম সম্পাদন করবেন।[২]

নারীর প্রতি অর্পিত এ দায়িত্ব চিন্তা ও কর্মের যতোটা স্বাধীনতা দাবী করে, তাকে তার বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে কাজ করার জন্য ইসলামী শরীআত ততোটা স্বাধীনতাও প্রদান করেছে। একবার হিন্দ বিনতে উতবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার স্বামী আবু সুফিয়ান সম্পর্কে অভিযোগ করে বললেন, সে টাকা-পয়সা খরচ করার ব্যাপারে কৃপণতা করে। সে আমার এবং আমার সন্তানদের সবটা ব্যয়ভার বহন করে না। তার অলক্ষ্যে তার সম্পদ থেকে নিয়ে ব্যয় করা ছাড়া আমার প্রয়োজন পূরণের আর কোনো উপায় নেই। নবী স. বললেন, তুমি তোমার নিজের ও সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বজন স্বীকৃত পরিমাণ অর্থ তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে পার।[৩]

একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে সাদকা ও দান করার অধিকারও নারীর আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرما انفقت ولزوجها اجرما اكتسب.

১. ইবনে মাজা, আবওয়াবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আফদালুন-নিসা।
২. জাদুল মা'আদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫।
৩. বুখারী, কিতাবুন নাফকাত, অনুচ্ছেদ ঃ ইযা লাম ইউনফিকির রাজুলু ফা লিল মারআতি আন তা'খুযা বিগায়রি ইলমিহি বেকাদরি মা ইয়াকফিহা ওয়ালাদিহা বিল মা'রূফ। মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়া, অনুচ্ছেদ ঃ কাদিয়াতু হিন্দ।

www.bjilibrary.com

"স্ত্রী যখন স্বামীর সম্পদ থেকে খরচ করে, তবে অন্যায় পন্থায় নয়, (বরং বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে) তখন সে এ খরচের পুরস্কার লাভ করে। আর স্বামীও উপার্জনের সওয়াব লাভ করে থাকে।"[১]

পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যোগ্যতার ওপর শরীআতের আস্থা স্থাপনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো সন্তানরা বুদ্ধি-সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত তাদের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানের জন্য শরীআত পুরুষের চেয়ে নারীকে অধিক উপযুক্ত বলে মনে করে।

এক সাহাবা তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন। উক্ত স্ত্রীর গর্ভজাত একটি শিশু সন্তান ছিল। তিনি শিশুটিকে নিজের কাছে রাখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু শিশুটির মা এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে নবী স.-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ

انت احق به مالم تنكحى.

"দ্বিতীয় বিয়ে না করা পর্যন্ত তুমিই শিশুটিকে কাছে রাখার বেশী হকদার।"[২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী র. লিখেছেন ঃ

فيه دليل على ان الام اولى بالولد من الاب مالم يحصل مانع من ذالك كالنكاح وهو مجمع على ذالك.

"মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে করা অথবা যে বিষয়ে সবাই একমত এমন কোনো বাস্তব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হলে পিতার চেয়ে মা শিশু-সন্তানকে কাছে রাখার বেশী হকদার।"[৩]

আল্লামা বদরুদ্দীন কাশানী রা. লিখছেন ঃ

الاصل فيها النساء لانهن اشفق وارفق واهدى الى تربية الصغار.

শিশু-সন্তানের প্রতিপালন ও অভিভাবকত্বের অধিকার মূলত নারীদের। কারণ, তারা (পুরুষের তুলনায়) অধিক স্নেহশীলা, দয়ালু এবং শিশুদের প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের জ্ঞান ও যোগ্যতা তাদের মধ্যেই বেশী থাকে।[৪]

১. বুখারী, কিতাবুয যাকাত ; মুসলিম, কিতাবুয যাকাত ; আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত অনুচ্ছেদ ঃ আল মারআতু তুসাদ্দিকু মিন বাইতি যাওজিহা।
২. আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ মান আহাক্কু বিল ওয়ালাদ, মুসতাদরিক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৭।
৩. নাইলুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৯।
৪. বাদাইউস সানায়ে' ফী তারতীবিশ শারায়ে, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১।

www.bjilibrary.com

স্বতন্ত্র নারী সংগঠন

নারীকে পুরুষের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ যখন এই যে, শিশু সন্তানের প্রশিক্ষণ ও লালন সে উত্তমরূপে করতে পারে তখন জীবনের যে ক্ষেত্রে নারীর সেবা সমাজের জন্য কল্যাণকর ও কার্যকর প্রমাণিত হবে সে ক্ষেত্রেই তাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের মতে এ উদ্দেশ্যে তাকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সাথে সাথে যৌথ প্রচেষ্টা চালানোর অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শরীআত তার ওপর কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীদের কোনো সংগঠন ছিল কিনা এখানে সে প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে না। কেননা, যেসব কারণ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে সংগঠন অস্তিত্ব লাভ করে তখন সেসব কারণ এবং অবস্থাই বিদ্যমান ছিল না। এ কারণে শুধু নারীদের সংগঠন নয়, কোনো সংগঠনের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে তা সত্ত্বেও এ ঐতিহাসিক সত্যকেও অস্বীকার করা অসম্ভব যে, নানাবিধ আদর্শিক ও জাতীয় প্রয়োজনে নারীরা সমবেত হতো এবং কোনো কোনো সময় তাদের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলী সংঘবদ্ধভাবে নবী স.-এর কাছে পেশ করতো। আর তিনি ওগুলোর সমাধান বাতলে দিতেন।

একবার এক মহিলা সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে মহিলাদের একটি বড় অসুবিধার কথা উল্লেখ করে তা দূর করার আবেদন জানালেন। এ বিষয়ে অপর একটি বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

অর্থাৎ বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা এ আবেদন জানিয়েছিলেন। সম্ভবত এ আবেদন সবার পক্ষ থেকে জানানো হয়ে থাকবে। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তা পেশ করার জন্য তারা কোনো একজনকে নিজেদের প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। আবেদনকারী মহিলার বক্তব্য থেকেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوم ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فاتاهنّ رسول الله ﷺ فعلّمهن مما علّمه الله.

"আপনার সাথে সরাসরি কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পুরুষরা উপকৃত হয় (আর আমরা সে সুযোগই পাই না) তাই আপনি সময় বের করে আমাদের জন্য কোনো একটা দিন নির্দিষ্ট করুন। সে দিনটিতে আমরা আপনার খেদমতে হাজির হবো আর আপনি আমাদের জানিয়ে

www.bjilibrary.com

দিবেন যা আল্লাহ্ আপনাকে শিখিয়েছেন, তিনি বললেন ঃ আচ্ছা তাহলে অমুক দিনে অমুক জায়গায় সমবেত হও। মহিলারা সেখানে সমবেত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে গেলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা যে দীন তাঁকে শিখিয়েছেন তিনি তাদের তা শিক্ষা দিলেন।"[১]

অনুরূপভাবে আরেকবার মুসলিম নারীগণ তাদের একটি মানসিক দ্বন্দ ও অস্থিরতা দূরীকরণের জন্য আসমা বিনতে যায়েদ রা. নাম্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও সুচতুর এক মহিলাকে তাদের মুখপাত্র হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালেন। তিনি নবী স.-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন ঃ

الى رسول مّن ورّائى من جماعة النساء المسلمين كلّهنّ يقلن بقولى وعلى مثل رائى انّ اللّه تعالى بعثك الى الرّجال والنساء فامنّابك واتّبعناك ونحن معشر النساء مقصورات قواعد بيوت ومواضع شهوات الرّجال وحاملات اولادهم وانّ الرّجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد واذا خرجوا للجهاد حفظنالهم وربينا اولادهم افنشاركهم فى الاجر يا رسول اللّه ؟ فالتقت رسول اللّه ﷺ بوجهه الى اصحابه فقال هل سمعتم مقالة امرأة احسن سؤالاً عن دينها من هذه فقالوا بلى واللّهِ يارسول اللّه فقال رسول اللّه ﷺ انصرنى يا اسماء واعلى من وراء ك من النساء انَّ حسن تبعّل احدا كنّ لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ماذكرت.

"আমি একদল মুসলিম নারীর পক্ষ থেকে দূত বা প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছে এসেছি। আমার বক্তব্য ও মতামত যা তাদের সবার বক্তব্য এবং মতামতও তাই। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা সবাই আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার আনুগত্য করেছি। আমরা নারী। আমাদের অবস্থা হলো, আমরা অনুগত, পর্দানশীল, গৃহবাসিণী, পুরুষের যৌনতৃপ্তির কেন্দ্রবিন্দু এবং তাদের সন্তানের গর্ভধারিণী। জুমআ, জানাযা এবং জিহাদে অংশ গ্রহণের সুযোগ দানের মাধ্যমে পুরুষদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তারা

১. বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ ; অনুচ্ছেদ ঃ তা'লীমুন নবী স. উম্মাতাম-মিনার রিজালি ওয়ান নিসায়ী মিম্মা আল্লামাহুল্লাহ....।

www.bjilibrary.com

জিহাদে গেলে আমরা তাদের অর্থ-সম্পদ হিফাজত করি, তাদের শিশু সন্তানদের লালন-পালন করি। হে আল্লাহর রাসূল! এভাবে আমরাও কি পুরস্কার ও সওয়াবের বেলায় তাদের সাথে শরীক হবো ? নবী স. সাহাবাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি আর কোনো মহিলাকে দীনের ব্যাপারে এ মহিলার চেয়ে উত্তমরূপে প্রশ্ন করতে শুনেছো ? সাহাবারা বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, আমরা কখনো শুনিনি। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আসমা! তুমি যেসব মেয়েদের পক্ষ থেকে এসেছো, ফিরে গিয়ে তাদের বলো, স্বামীর সাথে তোমাদের উত্তম আচরণ করা, তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা এবং সহমর্মিতার জন্য তাদের আনুগত্য করা পুরুষের সেসব কাজের তুল্য যা এই মাত্র তুমি উল্লেখ করেছো।"[১]

অনুরূপভাবে বিভিন্ন সময়ে নারীদের প্রতিনিধি নারীগণ আরো অনেক সাধারণ সমস্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেছেন। যেমন, আবু দাউদের একটি রেওয়ায়েত হলো ঃ

لما بايع رسول الله ﷺ النساء قامت امرأة جليلة كانها من نساء مضر فقالت يانبيَّ الله انا كل على ابائنا وابنائنا وازواجنا فما يحل لنا من اموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه.

"যে সময় রাসূলুল্লাহ স. মেয়েদের বাইয়াত নিলেন তখন গুরুত্বপূর্ণ একজন মহিলা উঠে দাঁড়ালো। তাকে মুদার গোত্রের মহিলা বলে মনে হচ্ছিলো। সে বললো ঃ হে আল্লাহর নবী! আমরা তো এমনিতেই আমাদের পিতা, ছেলে ও স্বামীদের ওপর বোঝা হয়ে আছি। তা সত্ত্বেও তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে কিছু খরচ করার অধিকার কি আমাদের আছে ? নবী স. জওয়াব দিলেন ঃ হ্যাঁ, খেজুর (ধরনের খাদ্যদ্রব্য) এগুলো তোমরা খেতে পার এবং উপহারও দিতে পার।"[২]

এ হাদীসে একথা স্পষ্ট নয় যে, অন্য সব প্রশ্নকারিণী এ মহিলাকে তাদের মুখপাত্র বানিয়েছিল। তথাপি বহু সংখ্যক মহিলার উপস্থিতি এ প্রশ্নের ধরন থেকে পরিষ্কার প্রকাশ পায় যে, এটা তার ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছিল না।

১. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু আসমা বিনতু যায়েদ ইবনু সাকান। হাফেজ মুনযিরী বায্যার ও তাবারানী থেকে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করেছেন। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

২. আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ আল মারআতু তুসাদ্দিকু মিন বায়তি যাওজিহা।

www.bjilibrary.com

এ ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে আমরা যখন দীনের মৌলিক শিক্ষাসমূহের প্রতি রুজু করি তখন জানতে পারি তা নারীদের আলাদা দল গঠনের মোটেই বিরোধী নয়। বরং দীনের মৌলিক শিক্ষাসমূহ থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, নারীরা নামাযের জন্য পুরুষদের থেকে আলাদা জামায়াত করতে পারে। ইতিপূর্বে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে ওয়ারাকা বিনতে আবদুল্লাহকে তার পরিবারের লোকদের নামাযের জামায়াতে ইমামতি করার আদেশ দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর সমস্ত মহিলা সাহাবী এ নীতির ওপর আমল করেছেন। তাঁরা ফরয এবং নফল উভয় প্রকার নামাযই জামায়াতের সাথে পড়েছেন এবং মহিলারাই এসব নামাযে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

عن ريطة الحنفية قالت امتنا عائشة فقامت بينهن فى الصلوة المكتوبة.

"রায়তা আল হানাফিয়া বর্ণনা করেছেন যে, ফরয নামাযে হযরত আয়েশা রা. কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের ইমামতি করেছেন। (অর্থাৎ ইমামতির জন্য পুরুষদের মতো কাতারের সামনে দাঁড়াননি।")[১]

عن تميمة بنت سلمة عن عائشة ام المؤمنين انها امت انساء فى الفريضة فى المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقرأة.

"তামীম বিনতে সালামা হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা রা. মাগরিবের ফরয নামাযে ইমামতি করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন এবং উচ্চস্বরে কিরায়াত করেছেন।"[২]

عن حجيرة بنت حصين قالت امتناام سلمة فى صلوة العصر فقامت بيننا.

"হাজিরা বিনতে হুসাইন বর্ণনা করেন, আসরের নামাযে উম্মে সালামা আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করেছেন।"[৩]

عن عطاء عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن.

"আতা হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হযরত আয়েশা) নামাযের জন্য আযান ও ইকামাত দিতেন এবং নামাযে মেয়েদের কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াতেন।"[৪]

---

১. দারু কুতনী পৃষ্ঠা-১৫৫, অধ্যায় মহিলাদের জামায়াতে নামায এবং ইমামের দাঁড়ানোর স্থান, বায়হাকী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩১ ; আল মুহাল্লা ইবনে হাজম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬।
২. আল মুহাল্লা, ইবনে হাযম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬।
৩. দারু কুতনী, পৃষ্ঠা-১৫৫, আল মুহাল্লা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৭।
৪, মুসতাদরিক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৪।

www.bjilibrary.com

عن سعدة بنت قمامة انها كانت تؤم النساء وتقوم فى وسطهن.

"সা'দা বিনতে কিমামা থেকে বর্ণিত যে, তিনি নামাযে মেয়েদের ইমামতি করতেন। এ সময় তিনি কাতারে সবার মাঝে দাঁড়াতেন।"[১]

عن عائشة انّها كانت تؤم النساء فى رمضان تطوعا وتقوم فى وسط الصف.

"হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'রমযান' মাসে তারাবীর নামাযে মেয়েদের ইমামতি করতেন এবং কাতারের মাঝখানে দাঁড়াতেন।"[২]

عن خيرة انّ امّ سلمة ام للمؤمنين كانت تؤمهن فى رمضان وتقوم معهن فى الصف.

"খায়রা বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রমযান মাসে নামাযে তাদের ইমামতি করতেন। তিনি কাতারে তাদের সাথেই দাঁড়াতেন।"[৩]

عن ابن عباس رضـ قال تؤمر المرأة النساء تقوم وسطهن وفى رواية ابن حزم تؤم المرأة النساء فى التطوع وتقوم وسطهن.

"ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মেয়েরা নামাযে মেয়েদের ইমামতি করতে পারে এ ক্ষেত্রে ইমাম কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াবে। ইবনে হাযমের বর্ণনায় একথাটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, মেয়েরা নফল নামাযে মেয়েদের ইমামতি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইমাম কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াবে।"[৪]

নামায প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাকে সংগঠিত করার একটি ক্ষুদ্র নমুনা। এ কারণে নামাযের 'ইমামত' বা নেতৃত্বকে ক্ষুদ্রতর 'ইমামত' বা নেতৃত্ব বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রশ্ন দেখা দিলে মুহাজিরগণ হযরত আবু বকর রা.-এর নাম প্রস্তাব করলো। তারা এ পদমর্যাদার জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ পেশ করলো এই বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশাতেই নামাযের ইমামতির জন্য তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ দলীলের ভিত্তিতে বলা যায় শরীআত নারীদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যার সমাধানের জন্য নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে বাধা দেয় না। এ ধরনের সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন

১. আল ইসতি'আব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু সা'দা বিনতে কিমামাহ।
২. কিতাবুল আসার, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা-৪১, হাদীস নং ২১২।
৩. আল মুহাল্লা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৭।
৪. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৮

www.bjilibrary.com

প্রকার সামাজিক কাজকর্ম করার স্বাধীনতা দেয়া যায়। এসব সংগঠন নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আরো অনেক কাজও করতে পারে। এমনকী নারীদের নিজস্ব বিচারালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিচারকার্য ও আইন জারী করার অধিকার দানের ব্যাপারেও কোনো দোষ নেই।

নারী এবং নেতৃত্বের পদমর্যাদা

তবে এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলাম নারীকে জাতির নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের যোগ্য বলে মনে করে না। কারণ, নেতৃত্বের জন্য যেসব গুণের প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। যেসব অঙ্গণে নারীর শক্তি ও যোগ্যতা কাজ করতে পারে না সেসব ক্ষেত্রে তার ওপর আস্থা স্থাপন করা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। যদি তা করা হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে গোটা জাতির ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া এ আর কোনো পরিণাম হতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

هلكت الرِّجالُ حين اطاعت النساء.

"পুরুষরা যখনই নারীর আনুগত্য করেছে তখনই ধ্বংস হয়েছে।"[১]

আরো একটি বাণীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়েও জোরালো ভাষায় বলেছেন ঃ

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأةً.

"যে জাতি নারীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে সে জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না।"[২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী র. বলেন ঃ

فيه دليل على انَّ المرأة ليست من اهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها لان تجنب الامر الموجب العدم الفلاح واجب.

"এতে প্রমাণিত হয় যে, নারী নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের যোগ্য নয়। কোনো জাতির জন্য নারীকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করাও জায়েয নয়। কারণ, অসাফল্য ও ক্ষতি নিশ্চিত করে এমন কাজ বর্জন করা আবশ্যক।"[৩]

---

১. মুসতাদরিক হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯১।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাজী, অনুচ্ছেদ ঃ কিতাবুন নবী স. ইলা কিসরা ওয়া কায়সার, তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ ঃ (শিরোনাম ছাড়া) নাসায়ী, কিতাবু আদাবিল কুদাহ।
৩. নায়লুল আওতার. ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৮।

www.bjilibrary.com

এটা এমন কোনো বিষয় নয় যাতে দ্বিমতের অবকাশ আছে এবং তার যে কোনো একটি মত গ্রহণের স্বাধীনতাও আমাদের আছে। বরং গোটা মুসলিম উম্মার সমস্ত উল্লেখযোগ্য দল উপদল এ বিষয়ে 'ইজমা' বা ঐকমত্য পোষণ করেছে। আল্লামা ইবনে হাযম লিখেছেন ঃ

وجميع فرق اهل القبلة ليس منهم احد يجيزامامة امرأة.

"কিবলার অনুসারীদের (মুসলমান) যত ফির্কা বা ছোট ছোট দল উপদল আছে তার কোনোটিই নারীর নেতৃত্বকে বৈধ মনে করে না।"[১]

এ ক্ষেত্রে গোটা উম্মতের এ ঐকমত্য নারীর প্রতি কোনো প্রকার শত্রুতা, অবজ্ঞা বা ঘৃণার কারণে নয়, বরং নারীর জন্ম ও প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে তাঁরা তাকে এ গুরুদায়িত্ব বহনের উপযুক্ত মনে করেননি। উদাহরণ স্বরূপ আলেমগণ লিখেছেন যে, ইমামত বা নেতৃত্বের পদমর্যাদার উপযুক্ত সে ব্যক্তি হতে পারেন যিনি দীনের মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ে মুজতাহিদ সুলভ দূরদৃষ্টির অধিকারী। কারণ, তবেই তিনি সবরকম চিন্তাধারার লোককে নিশ্চিত করতে পারবেন। তাঁকে লেনদেন ও আচার-আচরণের ব্যাপারে গভীর দৃষ্টি-সম্পন্ন এবং যুদ্ধ ও সন্ধির বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হতে হবে। অন্যথায় তিনি দীন ও মিল্লাতের সামনে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হবেন না। তাকে অত্যন্ত সাহসী, অটুট সংকল্প ও দৃঢ়তার অধিকারী হতে হবে যাতে তার কর্তব্য সাধনের পথে কোনো শক্তিই বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। সবারই জানা কথা যে, মহান আল্লাহ্ এসব গুণাবলী কেবল পুরুষের মধ্যেই সৃষ্টি করে থাকেন এবং তাও আবার সবার মধ্যে নয় বরং মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির মধ্যে। নারী ইমামত বা নেতৃত্বের পদমর্যাদার যোগ্য নয় কেন আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী র. তাঁর 'শারহু মাকাসিদ' নামক গ্রন্থে সে বিষয়ে লিখেছেন ঃ

والنساء ناقصات عقل ودين ممنوعات عن الخروج الى مشاهد الحكم ومعارك الحرب.

"কারণ, নারীদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এবং দীন (দৈহিক শক্তি) অসম্পূর্ণ আর তাদের ফায়সালার স্থানসমূহে (বিচারালয়ে) এবং যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি নেই।"[২]

কেউ কেউ এ ধরনের চিন্তাধারা পোষণ করেছেন যে, নারীর মধ্যে এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য না থাকলেও তাকে খলীফা বানানোতে কোনো দোষ নেই।

১. আল ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১০।
২. এ বিষয়ে আরো জানার জন্য দেখুন "শারহু মাকাসিদ", ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৩, "শারহু মাওয়াকিফ", ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৯।

www.bjilibrary.com

কেননা সে অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতে সক্ষম। কিন্তু এটা একটা অর্থহীন ব্যাখ্যা। কেননা, কোনো ব্যক্তি কোনো দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত তখনই হয় যখন তার মধ্যে সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা থাকে। এটা কোনো বংশগত জায়গীরদারী নয় যে, তা আপনা থেকেই হস্তগত হবে। তাই আলেমগণ এ মতামতকে মোটেই গুরুত্ব দেননি।

আল্লামা ইবনে আবেদীন র. বলেন ঃ

واما تقريرها فى نحووظيفة الامام فلاشك فى عدم صحة لعدم اهليتها خلافا لما زعمه بعض الجهلة انه يصح وتستنيب لان صحة التقرير يعتمد وجود الاهلية وجواز الاستنابة فرع صحة التقرير.

"নারীকে ইমাম বা নেতার পদমর্যাদার অনুরূপ পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা যে ঠিক নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, সে এর উপযুক্ত নয়। পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক মনে করে যে, তাকে ইমাম বা নেতা মনোনীত করা ঠিক। কেননা সে তার সহকারী বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে নিতে পারবে। কারো মধ্যে যোগ্যতা থাকলেই কেবল তাকে কোনো পদে নিযুক্ত করা সঠিক হতে পারে। সহকারী নিযুক্তির প্রশ্ন আসে কোনো পথে কারো নিযুক্তি বৈধ হওয়ার পর।"[১]

এ ধ্যান-ধারণা পোষণকারী ব্যক্তিবর্গ কিরূপ মর্যাদার অধিকারী এসব গ্রন্থ থেকে তা জানা যায় না। হাফেজ ইবনে হাজার র. শুধু আল্লামা তাবারী র. সম্পর্কে এতটুকু লিখেছেন যে, তিনি নারীর নেতৃত্ব ও বিচার কার্যকে জায়েয মনে করতেন।[২]

নারী কোন প্রকার সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য?

নারী যদি জাতির নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের উপযুক্ত নাও হয়ে থাকে তবু তার অর্থ এ নয় যে, সে কোনো সামাজিক কাজেরও যোগ্যতা রাখে না। নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের বাইরেও অনেক সামাজিক দায়-দায়িত্ব তাকে দেয়া যেতে পারে। এ বিষয় ফিকাবিদগণ পরিষ্কার ভাষায় মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা ইবনে ইলহাম হানাফী র. লিখেছেন ঃ

وليس فى الشرع سوى نقصان عقلها ومعلوم انه لم يصل الى حد سلب ولايتها بالكلية الاترى انها تصلح شاهدة وناظرة فى الاوقاف ووصية على اليتامى.

১. রাদ্দুল মুখতার আলাদ দররুল মুখতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৪।
২. ফাতহুল বারী, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৭।

www.bjilibrary.com

"শরীআত নারীদের সম্পর্কে যা বলেছে তা শুধু এই যে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি অপূর্ণাংগ। কিন্তু সবাই জানে যে, তার জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতা এতটা নয় যে, সে কোনো পদমর্যাদার উপযুক্ত নয়। এটা কি ঠিক নয় যে, সে ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ও মুতাওয়াল্লী হতে পারে এবং তাকে ইয়াতীমদের দেখাশোনার জন্য অছিয়ত করা যেতে পারে ?"[১]

ফিকাহশাস্ত্রের এ স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, নারী সামাজিক কাজকর্মের যোগ্যতা রাখে। ফিকাহ্‌র এ বক্তব্য কোনো আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রাখে না। এর ওপর ভিত্তি করে আরো অনেক সামাজিক দায়-দায়িত্বের বোঝা নারীর ওপর অর্পণ করা যায়। কিন্তু আমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ফিকাহবিদগণ যা কিছু বলেছেন তা তাদের যোগ্যতার কথা বিবেচনায় রেখেই বলেছেন। সুতরাং তার ওপরে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করার পূর্বে সর্বাবস্থাই দেখতে হবে, সে উক্ত দায়-দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম কিনা ? সাথে সাথে তার মেজায ও প্রকৃতিগত আকর্ষণের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী। অন্যথায় তার যোগ্যতা বিফলে যাওয়ার আশংকা সমধিক। বরং এমনও হতে পারে যে, তার মেজায প্রকৃতি বিরোধী কর্মকাণ্ড সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। তা ছাড়াও কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো কাজ করতে বলা যা করার শক্তি সামর্থও তার মধ্যে নেই এবং তার রুচি ও আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়, এটি অবিবেচনা প্রসূত কাজও বটে। এক ব্যক্তির জন্য যা ঠিক নয় মানুষের একটি শ্রেণীর জন্য তা কি করে সঠিক হতে পারে ?

কয়েকটি মূলনীতির অনুসরণ

নারী সমাজের যে খেদমতই করুক না কেন তাকে কয়েকটি মূলনীতি মেনে চলতে হবে। ওসব মূলনীতি বাদ দিয়ে সে কোনো প্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, শরীআতের দৃষ্টিতে তার ব্যক্তিত্বের নিরাপত্তা ও উন্নতি এবং সমাজের সফলতা ও সমৃদ্ধি উভয়ই এ নীতিমালার সাথে জড়িত।

১. বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থাকা

এর মধ্যে প্রথম নীতি হলো, তাকে সর্বাবস্থায় নিজের বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে যে, মূলতঃ সে পারিবারিক জীবনের নির্মাতা এবং তার ভালমন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের জন্য দায়ী। তাই না রাষ্ট্র তাকে দিয়ে এমন

১. ফাতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৬।

www.bjilibrary.com

কোনো কাজ করিয়ে নিতে পারে যার ফলে তার আসল মর্যাদা বা পজিশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, না তার নিজের এমন কোনো অধিকার আছে যে, সে গৃহের জগতকে ধ্বংস ও বিরাণ করে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহের পরিপাটি ও শ্রীবৃদ্ধিতে নিয়োজিত হবে। সে যদি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের কারণে তাহযীব-তামাদ্দুন ও রাজনীতির গিট খুলতে না পারে তা হলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু নিজের প্রকৃত দায়-দায়িত্ব শিকেয় তুলে রেখে জীবনের অন্যান্য অঙ্গনে বিচরণ করা ও তৎপরতা দেখানো তার জন্য গোনাহর কাজ। তার হাত ও বাহুর শক্তি যদি যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে ব্যয়িত না হয়, তার পদযুগল যদি দেশ ও জাতির সেবায় ধূলা-মলিন না হয় তাহলে সেটা তার ব্যর্থতার প্রমাণ হবে না যদি সে তার সমস্ত শক্তিকে এমন হাত ও বাহু এমন মন ও মগজ তৈরীতে ব্যয় করে যার মধ্যে বিভিন্ন জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের সংকল্প ও সাহস বিদ্যমান এবং যা সঠিক অর্থে জাতির নির্মাতা ও কল্যাণকামী।

২. স্বামীর আনুগত্য

ইসলামী সমাজব্যবস্থার একটি বিস্তারিত রূপরেখা আছে। এ রূপরেখায় পুরুষকে ব্যবস্থাপক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সে নারীর ওপর হুকুম চালানোর ও কর্তৃত্ব করার অধিকার রাখে। কুরআন মজীদের ঘোষণা হলো :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ.

"পুরুষরা নারীদের জন্য ব্যবস্থাপক।"

অতএব, দাম্পত্য জীবনের সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য পুরুষ তার স্ত্রীকে যে সীমা ও আইনের অধীন করতে চাবে তা করতে পারবে এবং তার এ আইন ও বিধি-নিষেধ যতক্ষণ পর্যন্ত শরীআত তথা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংঘর্ষিক না হবে ততক্ষণ তার আনুগত্য করা নারীর জন্য জরুরী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ ভীতির পরে একজন ঈমানদারের জন্য নেককার স্ত্রী পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় কল্যাণ এবং নিয়ামত। তিনি নেককার স্ত্রীর একটি গুণ বর্ণনা করেছেন এই বলে :

ان امرها اطاعته

"সে নির্দেশ দিলে তা পালন করে।"[১]

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নেককার স্ত্রীলোকের গুণাবলী কি কি ? তিনি জবাব দিলেন :

---

১. ইবনে মাজা, আবওয়াবুন নিকাহ, বাবু ফাদলুন নিসা।

১২—

www.bjilibrary.com

التى تسره اذا انظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره.

"স্বামী তাকে দেখলে খুশী হয়, আদেশ দিলে পালন করে এবং নিজের ও সম্পদের ব্যাপারে এমন আচরণ দ্বারা তার বিরোধিতা করে না যা সে অপসন্দ করে।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

اثنان لاتجوز صلاتهما رؤوسهما عبدُ ابقُ من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى يرجع.

"দুই প্রকার মানুষের নামায তাদের মাথার ওপরে ওঠে না (অর্থাৎ তা মহান আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না।) প্রভুর নিকট থেকে পালানো দাস ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী তার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত।"[২]

রাসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জের সময় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁর সে ভাষণের একথাটি থেকে স্বামী-স্ত্রীর আইনগত মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

استوصوا بالنساء خيراً فانّ هنّ عوان عندكم.

"নারীদের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার ও সদাচরণ করো। কারণ, তারা তোমাদের কাছে বন্দী।"[৩]

অর্থাৎ নারী যেন পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন ও নির্দেশের অনুগত। আরেকটি জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ অবস্থান ও মর্যাদাকে আরো অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন ঃ

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تأذن فى بيت زوجها وهو كارهُ ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه احداً ولا تخشن بصدره ولا تضربه.

"যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে তার জন্য স্বামীর ঘরে এমন কোনো লোককে প্রবেশের অনুমতি দেয়া জায়েয নয় যাকে সে (স্বামী) পসন্দ করে না। আর এমন অবস্থায় বাড়ীর বাইরে যাওয়া জায়েয নয় যা সে অপসন্দ করে। (তার উচিত) স্বামীর ব্যাপারে অন্য কারো কথামতো না চলা, তার আগমনে কর্কশ হয়ে না ওঠা এবং তাকে মারপিট না করা।"[৪]

১. নাসাঈ, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ নারী উত্তম, মুসতাদরাক হাকেম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬১।
২. আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪২, তাবরানী ও হাকেমের বর্ণনায়।
৩. তিরমিযি ঃ আবওয়াবুর রেদা, অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার প্রসঙ্গে। ইবনে মাজা ঃ নিকাহ অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ হক্কুল মারয়াত আলায জাওজে।
৪. মুসতাদরাক হাকেম, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯০।

www.bjilibrary.com

নারীর মসজিদে গিয়ে নামায পড়া জায়েয। কিন্তু সে কেবল তখনই মসজিদে যেতে পারবে যখন তার স্বামী তাকে অনুমতি দেবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সুপারিশ বর্ণনা করেছেন ঃ

اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها.

"তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তাকে অনুমতি দেয়া উচিত এবং (বিনা কারণে) বাধা না দেয়া উচিত।"[১]

হাফেজ ইবনে হাজার র. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় এক জায়গায় ইমাম নববী র.-এর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ

استدل به على ان المرأة لاتخرج من بيت زوجها الاباذنه لتوجه الامر الى الازواج بالاذن.

"এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেয়া হয়েছে যে, নারী তার স্বামীর বাড়ী থেকে তার অনুমতি নিয়েই কেবল বের হতে পারে। কারণ স্বামীদেরকেই অনুমতি দেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।"[২]

এ থেকে জানা গেল শুধু মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রেই যে সে স্বামীর অনুমতি নেবে তা নয়, বরং কোনো অবস্থায়ই সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে না। এ বিষয়টির প্রতি ইংগিত করে ইমাম বুখারী র. উপরোক্ত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন ঃ

استيذان المرأة زوجها فى الخروج الى المسجد وغيره.

"মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর স্বামীর অনুমতি নেয়া প্রয়োজন।"[৩]

হজ্জ আদায়ের জন্য নারীর সফর সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

عن عبد الله ابن عمر رضـ عن رسول الله ﷺ فى أمرأة لها زوج ولها مالُ ولا يأذن لها فى الحجّ ليس لها ان تنطلق الا باذن زوجها.

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. রাসূলুল্লাহ স. থেকে একজন মহিলা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী আছে এবং সে (এতোটা) সম্পদের

১. মুসলিম ঃ কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের মসজিদে যাওয়া প্রসঙ্গে।
২. ফাতহুল বারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৬
৩. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ।

www.bjilibrary.com

মালিক যে তার ওপর হজ্জও ফরয। কিন্তু তার স্বামী তাকে হজ্জ করার অনুমতি না দিলে সে তার অনুমতি ছাড়া হজ্জ করতে পারবে না।"[১]

এসব দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে এটি একটি প্রায় মীমাংসিত মাসয়ালা মনে করা হয় যে, গৃহের বাইরে যাওয়ার জন্য স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে বাধ্য। তাই হাফেজ ইবনে হাজার র. লিখেছেন ঃ

انّ منع الرجال نساء هم أمر مقرر.

"স্ত্রীদেরকে গৃহের বাইরে যেতে নিষেধ করার এখতিয়ার পুরুষদের আছে। পুরুষের এ অধিকার একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার।"[২]

নারীর যোগ্যতা

স্বীকৃত এ মূলনীতি লংঘিত হওয়ার ক্ষেত্রে হানাফী ফিকায় স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে।[৩] কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র আছে যেখানে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিতে বাধ্য নয়। নিম্ন বর্ণিত অবস্থাসমূহকে হানাফী ফকীগণ এ ধরনের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেছেন ঃ

قالوا ليس للمرأة ان تخرج بغير اذن الزوج الا باسباب معدودة منها اذا كانت فى منزل يخاف السقوط عليها ومنها الخروج الى مجلس العلم اذا وقعت لها نازلة ولم يكن الزوج فقيها ومنها الخروج الى الحج الفرض اذا وجدت محرما ويجوز للزوج ان يأذن لها بالخروج ولا يصير عاصيا بالاذن ومنها الخروج الى زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم.

---

১. দারুকুতনী, পৃষ্ঠা ৪৮৭, আল মুজাম্মু সাগীর তাবারানী, ভারতে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ১২০ এই হাদীসের একজন রাবী আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ। মুহাদ্দিস ইবনে কাতান তাকে অজ্ঞাত পরিচয় অর্থাৎ সে নির্ভর যোগ্য না অনির্ভরযোগ্য তা অজানা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটিকে আস সুনানুল কুবরা গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় অন্য একটি সনদে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ স্থলে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল আবরাকীব নাম উল্লেখ আছে। এভাবে তাবরানী ৫ দারকুতনী বর্ণিত হাদীসের সর্মথন পাওয়া যায়। ইবনে তুর্কমানী আল জাওয়াবিশ শাফীগ্রন্থে এ হাদীসের দু'জন রাবীর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সব মুহাদ্দিস একমত না। উক্ত দু'জন রাবীর মধ্যে একজন হচ্ছেন হামসান ইবনে ইবরাহিম। ইমাম নাসায়ী তার সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী বা নির্ভরযোগ্য নন।
পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ র.-এর মতে হাদীস বিশারদ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (দেখুন মিযানুল ই'তিদাল ১ম খণ্ড ১১২ পৃষ্ঠা এবং তাহযীবুত তাহযীব ২য় খণ্ড,-২৪৫ পৃষ্ঠা থেকে ২৪৬ পৃষ্ঠা) দ্বিতীয় রাবী হচ্ছেন ইবরাহীম আস সায়েগ। ইবনে জুযীর র. তাকে যঈফ বা দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু এটা ইবনে জুযীর র. স্বভাব সুলভ কঠোরতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।

২. ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৬।

৩. ফতওয়ায়ে কাযীখান, ফতওয়ায়ে আলমগীর টীকায় মুদ্রিত, ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

"ফিকাহবিদগণ বলেছেন, নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ ছাড়া আর কোনো কারণেই নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া গৃহের বাইরে যেতে পারবে না। এসব কারণের মধ্যে একটি হলো, নারী যদি এমন কোনো গৃহে অবস্থান করে যা ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। তার যদি কোনো মাসয়ালা জানার প্রয়োজন হয় এবং তার স্বামী যদি ফকীহ না হয় তাহলে তা জানার জন্য সে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই ইলমের মজলিসে যেতে পারবে। তার ওপর যদি হজ্জ ফরয হয়ে থাকে এবং সাথে যাওয়ার জন্য কোনো 'মুহরেম' পুরুষ থাকে। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে অনুমতি দিতে পারবে। এতে তার কোনো গোনাহ হবে না। অনুরূপ পিতামাতাকে দেখতে যেতে, তাদের জন্য শোক প্রকাশ করতে, রোগ শয্যায় তাদের খোঁজ খবর নিতে ও দেখা করতে এবং 'মুহরেম' আত্মীয়দের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে যেতে স্বামীর অনুমতি লাগবে না।"[১]

ফিকাহ শাস্ত্রের এ আলোচনার সারকথা হলো একজন মুসলিম মহিলা দাম্পত্য অধিকার এবং একজন ঈমানদার ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার যে অগণিত অধিকার তার ওপর বর্তায় তার মধ্যেকার পার্থক্য উপলব্ধি করবে। এসব অধিকারের মধ্যে যেখানেই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখা দেবে সেখানেই সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহকে কম গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের ওপর অগ্রাধিকার দেবে। তবে এটা নিছক একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ প্রশ্ন তখনই দেখা দেয় যখন তার কাছে দু'টি ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী নির্দেশ পালনের দাবী সরাসরি করা হয়। এ দিক থেকে আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়-দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। কারণ, সমষ্টিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাজের ওপর সরাসরি অর্পণ করা হয় আর ব্যক্তির ওপর অর্পণ করা হয় পরোক্ষভাবে। তবে কোনো সময় কোনো সামাজিক খেদমত যদি তার জন্য ফরযে আইন হয়ে যায় তাহলে সে তখন উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৃহের সীমা ছেড়ে বাইরে বের হতে পারে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় সে স্বামীর নির্দেশের অনুগত থাকবে এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো সমষ্টিগত বা সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য তাকে গৃহের বাইরে টেনে আনতে পারবে না। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের এই মৌলিক পার্থক্য উপেক্ষা করে কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, সমষ্টিগত বা সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের খাতিরে স্বামীর অবাধ্য হওয়ার অধিকার নারীর আছে। অথচ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তা কোনো অবস্থায়ই ঠিক নয়। আল্লামা ইবনে নাজীম হানাফী র. এ মতের সমালোচনা করে লিখেছেন ঃ

---

১. ফতওয়ায়ে কাযী খান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৩।

www.bjilibrary.com

وينبغى ان للزوج ان يمنع القابلة والغاسلة من الخروج لان فى الخروج اضرارايه وهى محبوسة لحقه وحقه مقدم على فرض الكفاية بخلاف الحج الفرض لان حقه لايقدم على فرض العين.

"স্ত্রী যদি ধাত্রী হয় অথবা মৃতদের গোসলদাত্রী হয় তাহলে এসব কাজের জন্য স্ত্রীর বাইরে যাওয়া বন্ধ করার অধিকার স্বামীর আছে। কারণ, স্ত্রী গৃহের বাইরে যাওয়াতে তার ক্ষতি হয়। আর স্ত্রী স্বামীর অধিকারসমূহ আদায় করতে বাধ্য। তাই স্বামীর অধিকার 'ফরযে কিফায়া'র চেয়ে অগ্রগণ্য। তবে ফরয হজ্জের ব্যাপার স্বতন্ত্র। ফরয হজ্জ আদায় করার জন্য স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াও যেতে পারে। কারণ, স্বামীর অধিকার ফরযে আইনের ওপর অগ্রাধিকার পেতে পারে না।"[১]

এখানে গৃহের বাইরে নারীর তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গৃহের অভ্যন্তরেও স্বামী তার কাজকর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে নাজীম র. বলেন ঃ

له ان يمنعها من الاعمال كلها المقتضية للكسب لانها مستغنية عنه بوجوب كفايتها عليه وكذا من العمل تبرعا.

"যে কাজ দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা হয়, স্বামীর স্ত্রীকে সে কাজ থেকে বিরত রাখার অধিকার আছে। কারণ, তার খোরপোষ দেয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব। তাই তার উপার্জনের প্রয়োজন নেই। অনুরূপ সে নফল ও সাওয়াবের কাজ হিসেবে কোনো কাজ করতে চাইলে স্বামী তাতেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।"[২]

স্বামীর এ অধিকারের ভিত্তি হলো, সে স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়ী। তবে তার আর্থিক সংগতি এ ব্যয় নির্বাহের অনুকূল না হলে নারী তার জীবন যাপনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা এবং জীবিকা উপার্জনের অধিকার লাভ করা উচিত। এছাড়াও আল্লামা ইবনে আবেদীন র.-এর মতে, "নারীর এমন অনেক ব্যয় আছে যার দায়িত্ব বহন করা পুরুষের জন্য জরুরী নয়। এ ধরনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সে গৃহের অভ্যন্তরেই কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারে।" ইবনে আবেদীন র. আরো লিখেছেন, স্বামী স্ত্রীকে এজন্যও কঠোর পরিশ্রম থেকে বিরত রাখতে পারে যে, এতে তার স্বাস্থ্যহানি হওয়ার আশংকা আছে, নিজের স্ত্রীকে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও সুঠাম রাখার অধিকারও স্বামীর আছে। এ অধিকারের ভিত্তিতে স্বামী স্ত্রীর এমন সব কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ

১. আল বাহরুর রায়েক, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৬।
২. ঐ

www.bjilibrary.com

আরোপ করার অধিকারী যা তার স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। আল্লামা ইবনে আবেদীন র. বলেন, এভাবে নিয়ম করা যেতে পারে ঃ

له منعها عن كل عمل يؤدى الى تنقيص حقه اوضرره او الى خروجها من بيته اما الذى لاضررله فيه فلا وجه لمنعها ـ

"স্বামী স্ত্রীকে এমন সব কাজ করতে মানা করতে পারে যা তার (স্বামীর) অধিকার খর্ব করে অথবা তার ক্ষতি করে কিংবা যদি কাজটি করার জন্য তাকে গৃহের বাইরে যেতে হয়। তবে যেসব কাজে তার কোনো ক্ষতি নেই সেসব কাজে বাধা দেয়া বা মানা করার কোনো কারণও থাকতে পারে না।"[১]

এ মূলনীতি অনুসারে এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়া সম্ভব। প্রশ্নটি হলো, নারী তার স্বামীর অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করার পর গৃহের বাইরে বিভিন্ন তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না কেন ? সে যদি দাম্পত্য অধিকারসমূহ আদায় করার ব্যাপারে কোনো প্রকার গাফলতি বা অবহেলা না করে তাহলে গৃহের অভ্যন্তরে তার যেমন চেষ্টা-সাধনা ও কাজ করার স্বাধীনতা আছে গৃহের বাইরেও তা থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের মতে এ প্রশ্ন ঠিক নয়। কারণ, শরীআত এ দু'টি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। শরীআত ঘরের চার দেয়ালকে নারীর আখলাক ও চরিত্রের আশ্রয়কেন্দ্র মনে করে এবং ঘরের বাইরে তার আখলাক ও চরিত্র সম্পদ লুণ্ঠিত হওয়ার আশংকা করে। নবী স. বলেছেন ঃ

المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطنُ.

"নারী গোপন রাখার বস্তু। যখন সে বাইরে বের হয় শয়তান তখন উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে।"[২]

হযরত উমর রা. বলেছেন ঃ

النساء عورة فاستروها بالبيوت.

"নারী গোপনীয় বস্তু। তোমরা তাদের ঘরের মধ্যে গোপন করে রাখো।"[৩]

এখানে একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্যও লুক্কায়িত আছে। আল্লামা ইবনে ইলহাম সে দিকেই ইংগিত করেছেন। তাহলো, ইসলাম দাম্পত্য বন্ধনকে অধিকতর মযবুত দেখতে চায়। কিন্তু এ সম্পর্ক এতো নাজুক যে, সামান্য আঘাতেই তা ছিন্ন হতে পারে। কোনো শরীক ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বামী গৃহের বাইরে স্ত্রীর অধিক মাত্রায় আসা যাওয়া মোটেই বরদাশ্ত করতে পারে না। কারণ, এভাবে অনেক রকম ফিতনার সৃষ্টি হয়।

১. আদ দুররুল মুখতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯১৫, ৯১৬।
২. তিরমিযী।
৩. আইনুল আখবার, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮।

www.bjilibrary.com

فان فى كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا اذا كانت شابة والزوج من زوى الهيئات.

"কারণ, গৃহের বাইরে অধিক মাত্রায় গমনাগমন ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বিশেষ করে স্ত্রী যদি যুবতী হয় আর স্বামী চরিত্রবান ও শরীফ হয়।"[১]

৩. অবাধ মেলামেশা বর্জন

এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, মুসলিম নারী তার স্বামীর অনুমতি ও সম্মতি নিয়ে গৃহের বাইরেও বিভিন্ন শিক্ষামূলক, ধর্মীয় ও সামাজিক কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই সে এ সত্যকে উপেক্ষা করতে পারে না যে, শরীআত তার এবং বেগানা পুরুষের মধ্যে আইন ও নৈতিকতার একটি প্রাচীর দাঁড় করে দিয়েছে। তার জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পারিবারিক জীবনের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ করে দেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এও যে. বেগানা পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা যেন নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের কারণ না হয়। যদি কোনো নারী আল্লাহর তৈরী এ প্রাচীর ভেঙে কোনো ময়দানে অগ্রসর হয়ে যায় তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে তার প্রতিটি পদক্ষেপ গোনাহ ও ধ্বংসের পথ অতিক্রম করে। এ ব্যাপারে তার নিয়ত যত সৎ এবং উদ্দেশ্য যতোই পবিত্র হোক না কেন। কারণ, এভাবে সে সেই লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে পদদলিত করে শরীআত যার পদদলিত হওয়া দেখতে চায় না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক আল্লাহভীরু আর কে হবে ? কার নৈতিক মহত্ব ও উচ্চমান তাঁর মহত কর্মের আকাশচুম্বিতার সমকক্ষ হতে পারে ? যেসব নারী ইসলামের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের আনুগত্য শপথ পাঠ করার জন্য তাঁর দরবারে হাজির হতো আজকের কোনো নারীর মধ্যে কি তাঁদের মতো সেই পবিত্র আবেগ অনুভূতি আছে ? পুরুষরা তো তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে বিশ্বস্ত থাকার প্রতিজ্ঞা করতো কিন্তু মহানবী স.-এর পবিত্র হাত কোনো দিন কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি। হযরত আয়েশা রা. বলেন ঃ

كان النبىّ ﷺ يبايع النّساء بالكلام بهذه الايته لاتشركن بالله شيئا وما مست يد رسول الله ﷺ يدامرءة الا امرأة يملكها.

১. ফাতহুল কাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৫।

www.bjilibrary.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াত 'লা-তুশরিক্না বিল্লাহি শাইয়ান' দ্বারা মৌখিক বাইয়াত নিতেন। তাঁর হাত নিজ মালিকানাভুক্ত নারী (স্ত্রী) ছাড়া অন্য কোনো নারীর হাত কখনো স্পর্শ করেনি।"[১]

নীচে উল্লেখিত বক্তব্যটি এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট ঃ

لا والله مامست يد رسول الله يد امرأة قط غير انه يبايعهن بالكلام وكان يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلامًا ـ

"না ; আল্লাহর শপথ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোনো (পর) নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের থেকে কেবল মৌখিকভাবে বাইয়াত নিতেন। তিনি তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়ার পর বলতেন; (ঠিক আছে, এখন যাও) আমি কথা দ্বারাই তোমাদের বাইয়াত নিয়েছি।"[২]

কোনো কোনো সময় এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, মেয়েরা নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে শরীআতের বিধি-বিধান মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে তাদের বলেছেন ঃ

انّى لا اصافح النساء انّما قولى لمأة كقولى لامرأة واحدة.

"আমি মেয়েদের সাথে মুসাফাহা করি না। আমার একশজন নারীকে সম্বোধন করে কথা বলা একজনকে সম্বোধন করে কথা বলার মতো। (তাই প্রত্যেকের থেকে আলাদা প্রতিশ্রুতি নেয়ারও প্রয়োজন নেই)।"[৩]

এ কারণে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষাদীক্ষা হোক বা সভ্যতা-সংস্কৃতি হোক কিংবা প্রতিরক্ষা ও রাষ্ট্রনীতি হোক সব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা না হওয়া অপরিহার্য। ইসলামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনো সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর যেমন অবকাশ নেই, তেমনি সহশিক্ষারও কোনো সুযোগ নেই। একজন মুসলিম নারী না পারে বেগানা পুরুষদের সাথে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বা নারী-পুরুষের সম্মিলিত মহড়ায় অংশ নিতে, না পারে খেলাধুলা এবং ভ্রমণ বা চিত্তবিনোদন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে। বাজার ও ব্যবসায় কেন্দ্র থেকে আইনসভা পর্যন্ত সর্বত্র নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং বিরাট অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

---

১. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অনুচ্ছেদ ঃ বাইয়াতুন নিসা।
২. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, অনুচ্ছেদ ঃ কাইফিয়াতু বাইয়াতিন নিসা।
৩. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৭ ; নাসায়ী, কিতাবুর বাইযাত, অনুচ্ছেদ ঃ নারীর বাইয়াত ; দারু কুতনী, পৃষ্ঠা-৪৮৭।

www.bjilibrary.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তৃতা শোনার জন্য মেয়েরাও আসতো। কিন্তু কখনো তারা পুরুষদের পাশাপাশি বসতো না। বরং তাদের বসার জায়গা সবসময় পুরুষদের বসার জায়গা থেকে আলাদা হতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এক ঈদের নামাযের বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال فوعظهنَّ.

"তিনি প্রথমে নামায পড়লেন তারপর বক্তৃতা করলেন এবং তারপর মেয়েদের কাছে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল রা.। তিনি মেয়েদেরও নসীহত করলেন।"[১]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার র. বলেন ঃ

قوله ثم اتى النساء يشعر بان النساء كنَّ على حدة من الرجال غير مختلَّطات بهم.

"এরপর তিনি মেয়েদের কাছে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, মেয়েরা পুরুষদের থেকে আলাদা ছিলেন, তাদের সাথে মিলেমিশে ছিলেন না।"[২]

এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস হলো ঃ

صلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى انّه لم يسمع النساء فاتاهنَّ فذكّرهنَّ.

"তিনি খুতবার পূর্বে নামায পড়লেন। তারপর খুতবা দিলেন। অতপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁর কথা মেয়েদেরকে শোনাতে পারেননি। তাই তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং নসীহত করলেন।"[৩]

এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, মেয়েরা পুরুষদের থেকে এতোটা দূরে ছিল যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো, তাঁর কথা হয়তো মেয়েদের কাছে পৌঁছেনি।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে শরীআত নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে চায়। নীচে বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে শরীআতের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি বুঝা যেতে পারে।

দুই ব্যক্তি একটি মোকদ্দমা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলো। তাদের মধ্যে একজন বললো, আমার

---

১. বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, অনুচ্ছেদ ঃ আল ইলমুল্লাযী বিল মুসলাহ।

২. ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৭-৩৮৮

৩. বুখারী, কিতাবুল ইলম, অনুচ্ছেদ ঃ ইযাতুল ইমামিন নিসা ওয়া তা'লীমিহিন্না; মুসলিম, কিতাবুস সালাতিল ঈদাইন। ভাষা মুসলিমের বর্ণিত।

www.bjilibrary.com

ছেলে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আপনি এ বিষয়টির ফায়সালা করে দিন। নবী স. বললেন ঃ তোমার ছেলেকে একশ'টা কোঁড়া লাগানো হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা হবে। তারপর তিনি আনিস নামক এক সাহাবাকে স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ

اغد على امرأة هذا فسلها فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها.

"এ (দ্বিতীয়) ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। সে যদি অপরাধ স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করো। সে স্বীকার করলে তাকে রজম করা হলো।"[১]

চিন্তা করুন, জীবন ও মৃত্যুর ফায়সালা হওয়ার মতো মোকদ্দমা শুনানির জন্যও তিনি নারীকে আদালতে তলব করা পসন্দ করেননি। বরং নিজের প্রতিনিধিকে তদন্ত করে আইন কার্যকরী করার অধিকার দিয়ে নারীর কাছেই পাঠিয়েছেন।

এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম নাসায়ী যে অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন তা ছাড়া এ হাদীসের উদ্দেশ্য আর কিছুই হতে পারে না। শিরোনামটি হলো ঃ

صون النساء عن مجلس الحكم.

"বিচারালয় থেকে নারীদের দূরে রাখা।"[২]

আল্লামা যায়নুল আবেদীন ইবনে নাজীম হানাফী র. লিখেছেন ঃ

ولا تكلف الحضور للدعوى اذا كانت مخدّرة ولا لليمين بل يحضر اليها القاضى اويبعث اليها نائبه يحلفها بحضرة شاهدين.

"যদি সে পর্দানশীন মহিলা হয় তাহলে দাবী প্রমাণ বা শপথ করার জন্য তাকে আদালতে হাজির হতে বাধ্য করা যাবে না। বরং বিচারক নিজেই তার কাছে যাবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠাবেন। প্রতিনিধি দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তাকে শপথ করাবে।"[৩]

ইবনে কাসেম র. ইমাম মালেক র.-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যদি কোনো মহিলাকে কসম করানোর প্রয়োজন পড়ে তাহলে তা কোথায় করানো হবে ? ইমাম মালেক র. জবাব দিলেন ঃ

---

১. বুখারী, কিতাবুল মুহারিবীন, মিন আমিনিল কুফরে ওয়ার রুদ্দাতি ; মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ ঃ হুদ্দেস যেনা।

২. নাসায়ী, কিতাবু আদাবিল কুদাহ।

৩. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ভারতে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-২৪৬।

www.bjilibrary.com

أما كل شيئ له بال فانهن يخرجن فيه الى المساجد فان كانت امرأة تخرج بالنهار اخرجت نهارا فاحلفت فى المسجد وان كانت ممن لا تخرج اخرجت ليلا فلحلفت فيه قال وان كان الحق انما هو شيئ يسير لابال له احلفت فى بيتها اذا كانت ممن لا تخرج وارسل القاضى اليها من يحلفها الطالب الحق.

"বিষয়টি যদি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে (কসম করানোর জন্য) তাকে মসজিদে আনা যেতে পারে। সে যদি এমন মহিলা হয়, যে দিনের বেলা বাইরে বের হয় তাহলে দিনের বেলায়ই তাকে আনা হবে এবং মসজিদের মধ্যে কসম করানো হবে। যদি সে দিনের বেলা বাইরে বের না হয় তাহলে রাতের বেলা তাকে মসজিদে আনা হবে এবং কসম করানো হবে। ইমাম মালেক র. বলেছেন ঃ যদি কোনো সাধারণ অধিকারের বিষয় হয় (আর সে গৃহের বাইরে বের হতে অভ্যস্ত না হয়ে থাকে) তাহলে তাকে তার বাড়ীতেই কসম করানো হবে। এমতাবস্থায় বিচারক তার কাছে এমন লোককে পাঠাবেন, যে অধিকারের দাবীদারের পক্ষ থেকে তাকে কসম করাবে।"[১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় মেয়েদের নিয়মিত যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো না। তা সত্ত্বেও এটা বাস্তব যে, তারা নিজের বিশেষ পরিবেশ ও কষ্টসহিষ্ণু জীবনের কারণে সবসময়ই সামরিক সেবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আজও প্রয়োজন দেখা দিলে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পারে। তবে প্রশিক্ষণের এই ব্যবস্থায়ও বেগানা পুরুষের সাথে মেলামেশার অবকাশ আদৌ না থাকা আবশ্যক।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এক যুদ্ধে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। এটি সে সময়ের ঘটনা যখন আমি হালকা পাতলা ও একহারা গড়নের ছিলাম। তিনি সাহাবাদের অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা অগ্রসর হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ আয়েশা! এসো আমি আর তুমি দৌড়ের প্রতিযোগিতা করি। দেখবে, আমি তোমাকে পিছে ফেলে যাবো। প্রতিযোগিতা হলো। আমি অগ্রগামী থাকলাম। এতে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। এর কিছু দিন পর আমি যখন এ ঘটনা ভুলে গিয়েছি এবং কিছুটা মোটা সোটাও হয়ে গিয়েছি এক সফরে তাঁর সাথে ছিলাম। এবারও

১. আল মুদাওওয়ানাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭১, ১০৩।

www.bjilibrary.com

তিনি সাহাবাদের বললেন ঃ তোমরা কিছুদূর সামনে অগ্রসর হয়ে যাও। তারা অগ্রসর হয়ে গেলে তিনি তাঁর সাথে আমাকে দৌড় প্রতিযোগিতার আহ্বান জানালেন। প্রতিযোগিতা হলো। এবার তিনি অগ্রগামী থাকলেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন ঃ এটা আগেরটার প্রতিশোধ।[১]

বিভিন্ন যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ কি নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রমাণ ?

বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পরস্পর অবাধ মেলামেশা ছাড়া নারী ও পুরুষ যুদ্ধের ময়দানে কিভাবে কাজ করেছে ? যদি তারা সম্মিলিতভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে তাহলে কি তা একথা প্রমাণ করে না যে, শরীআতের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা কোনো অপরাধ নয় ? কিন্তু এ প্রশ্ন কেবল তখনই উথাপিত হতে পারে যখন আমরা কোনো ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাকে মূলনীতির মর্যাদা দান করবো। অথচ দু'টি অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য সূত্র বা নিয়ম-কানুনকে মূলনীতি বলে। আর ব্যতিক্রম হলো সাময়িক প্রতিবন্ধকতার ফল। তাই সর্বযুগে সর্বাবস্থায় মূলনীতির ওপর আমল করতে হবে। তবে কোনো বাস্তব প্রতিবন্ধকতার কারণে শরীআত যদি আমাদেরকে সাময়িকভাবে মূলনীতি অনুসারে চলা থেকে অব্যাহতি দেয় তাহলে ভিন্ন কথা। তবে এ প্রতিবন্ধকতা যখনই বিদূরিত হবে তখনই আমরা মূলনীতি অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবো।

যুদ্ধ একটি বাস্তব বাধা। বরং সবচেয়ে বড় বাধা। এ সময় কোনো এক ব্যক্তিকে নয় গোটা দেশকে তার জীবন ও মুত্যুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তখন অবস্থা এতোই নাজুক হয়ে পড়ে যে, বহুসংখ্যক মূলনীতি ও আইন-কানুন অনুসারে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ জরুরী অবস্থার ওপর সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থাকে কিয়াস বা অনুমান করা ঠিক তেমন যেমন কেউ কোনো আগুন লাগা শহরে গিয়ে দেখলো যে, শ্রমিক ও মালিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সবাই আগুন নিভাতে ব্যস্ত। এ অবস্থা দেখে সে মনে করে বসলো যে, ঐ শহরে কাজকর্মের কোনো নিয়ম-কানুন বা পন্থা-পদ্ধতি নেই।

১. আদদুররুস সামীন ফী মানাকিবি উম্মাহাতিল মু'মিনীন, মুহিবুদ্দীন আত্-তাবারী, মৃত্যু ৬৯৪ হিঃ। ইমাম আহমদ র. এবং আবু দাউদ র.ও হযরত আয়েশা রা.-এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'বার দৌড় প্রতিযোগিতার উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় প্রতিযোগিতার পূর্বে সাহাবাদের অগ্রসর হয়ে যাওয়ার নির্দেশ একবার মাত্র দেয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মুহিবুদ্দিন তাবারীর উদ্ধৃত রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, দু'বারই তিনি সাহাবাদের অনুপস্থিতি জরুরী মনে করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

এ প্রশ্নটিও একই প্রকৃতির। তাছাড়াও মুসলিম নারীদেরকে যে পরিস্থিতিতে বেগানা পুরুষের সাথে যুদ্ধের ময়দানে যেতে হয়েছে তা যখন আমরা বিবেচনা করি তখন এ প্রশ্ন একেবারেই অর্থহীন বলে মনে হয়।

এমনিতেই যুদ্ধ স্বাভাবিক অবস্থার ভারসাম্য অনেকখানি নষ্ট করে দেয়। কিন্তু কোনো কোনো সময় তা এতো ভয়ানক ও বিপজ্জনক রূপ পরিগ্রহ করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ নিজ আসন থেকে নড়ে ওঠে এবং দেশের সামনেও প্রতিরক্ষার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো বিষয় থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণকে বিভিন্ন যুদ্ধে এ ধরনের ভয়ানক পরিস্থিতিরই মোকাবিলা করতে হয়েছে। এক দিকে তখনও তারা পুরোপুরি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেননি। এমতাবস্থায়ই বিরোধীদের সাথে ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অপরদিকে তাঁরা নিজেদের সংখ্যা, শক্তি ও সাজসরঞ্জামের দিক দিয়েও অনেক পেছনে পড়েছিলেন। তাঁদের মোকাবিলায় শক্ররা পুরোপুরি অস্ত্র সজ্জিত এবং সংখ্যায় কয়েকগুণ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে তাদের সাথে দলে দলে নারীদের হাজির করতো। তারা যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যে জাতীয় মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে তুলতো এবং তাদের উৎসাহ ও আবেগ চাঙ্গা করে মরণপণ লড়াই করার জন্য উৎসাহিত করতো। নারীদের সাথে রাখার একটি উদ্দেশ্য এও ছিল যে, তারা যাতে সামরিক সেবা ও চিকিৎসার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে। কারণ, চিকিৎসা বিজ্ঞান তখন পর্যন্ত পারিবারিক অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত কিছু দক্ষতার সীমা ডিঙাতে পারেনি। তাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশী অভিজ্ঞ হতো।

এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের তাদের নারীদের থেকে সামরিক সহযোগিতা গ্রহণ না করা রাজনৈতিক স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের সাথে রাখা তারা জরুরী মনে করেছিল। যাতে যে সেবাই মেয়েরা করতে সক্ষম ছিল তা থেকে যেন তারা উপকৃত হতে পারে, সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ স.-ও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যাতে যুদ্ধের ময়দানে মেয়েদের উপস্থিতি অনিবার্য পরিস্থিতি সীমা ডিঙিয়ে আরো অগ্রসর না হয়। সুতরাং গ্রন্থের শুরুতেই আমরা আলোচনা করে প্রমাণ করেছি যে, জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য তাদের কখনো উৎসাহিত করা হতো না। এমন কি তাদের কারো নিজ পক্ষ থেকে এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হলে তাকেও উৎসাহিত করা হতো না। এ কারণে অনেক বড় বড় যুদ্ধেও হাতেগোনা মুষ্টিমেয় সংখ্যক মহিলাকেই অংশগ্রহণ করতে দেখা যেতো।

www.bjilibrary.com

তা সত্ত্বেও যেসব মহিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইতো তাদের ওপর এ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল যে, তারাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ছাড়া অংশগ্রহণ করবে না। এ বাধ্যবাধকতার উদ্দেশ্য ছিল একথা জানা থাকা যে, কেমন মেজাজ ও স্বভাব প্রকৃতির নারীরা যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছে। তাদের হেফাযতের জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো, যুদ্ধের ময়দানে তাদের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা? এসব বিষয় নিশ্চিত না হয়ে তিনি মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি দিতেন না।

একবার কয়েকজন মহিলা অনুমতি ছাড়াই জিহাদের আকাঙ্ক্ষায় সেনাবাহিনীর সাথে রওয়ানা হলে তিনি তাদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলেন। হাশরাজ ইবনে যিয়াদ তার দাদী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

انّها خرجت مع رسول اللّه ﷺ فى غزوة خيبر سادس ستّ نسوة فبلغ رسول اللّه ﷺ فبعث الينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتنّ وباذن من خرجتنّ.

"তিনি খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে রওয়ানা হলেন। আরো পাঁচজন মহিলাও তার সাথে ছিল (তিনি বর্ণনা করেন) রাসূলুল্লাহ স. যখন বিষয়টি জানলেন, তখন এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আমাদের ডাকলেন। আমরা তাঁর সামনে হাজির হয়ে তার চেহারায় ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম। তিনি (অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে) বললেন,কার সাথে তোমরা বাড়ী থেকে বের হয়েছো এবং কার অনুমতি নিয়ে বের হয়েছো?"[১]

যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মেয়েরা প্রথমত নবী স.-এর নিকট থেকে অনুমতি নিতো। দ্বিতীয়ত নিজ গোত্রের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোকদের সাথে অংশগ্রহণ করতে হতো। হাশরাজ ইবনে যিয়াদের দাদী এবং তার সঙ্গিণীদের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণ ছিল এই যে, তারা এ দু'টি বিষয়কেই উপেক্ষা করেছিলেন।

উম্মে সানানা আসলামিয়া রা. তার নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

لمّا اراد رسول اللّه ﷺ الخروج الى خيبر جئت فقلت يا رسول اللّه ﷺ اخرج معك فى وجهك هذا اخرز السقاء واداوى المريض والجريح

১. মুসনাদে আহমদ, ৫ম খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা ; আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ফিল মারআতে ওয়াল আবদে ইয়াখদিমানে মিনাল গনীমাতে—ভাষা অন্য বর্ণনার।

www.bjilibrary.com

ان كانت جراح ولا تكون وابصر الرحل فقال رسول الله ﷺ اخرجي على بركة الله فان لك صواحب قد كلمني وأذنت لهن مع قومك ومن غيرهم فان شئت فمع قومك وان شئت فمعنا قلت معك قال فكوني مع ام سلمة زوجتي قالت فكنت معها.

"রাসূলুল্লাহ স. খায়বার অভিযানে যাওয়ার সংকল্প করলে আমি তাঁর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনার এ অভিযানে আমিও আপনার সাথে যেতে চাই। সেখানে গিয়ে প্রয়োজন পড়লে আমি মশক সেলাই করে দেব। কেউ যদি অসুস্থ বা আহত হয় তাহলে তার চিকিৎসা ও সেবা করবো—আল্লাহ না করুন এমনটা যেন না হয়—এবং উটের হাওদা ও অন্যান্য জিনিস পত্রের দেখাশোনা করবো। নবী স. বললেন, আল্লাহ কল্যাণ দান করুন। তুমি আমাদের সাথে যেতে পারো। তোমার ও অন্যান্য গোত্রের মেয়েরাও আমার সাথে আলোচনা করেছে। আমি তাদেরকেও অনুমতি দিয়েছি। এ সফরে তারা তোমার সঙ্গিণী হবে। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার নিজের গোত্রের লোকদের সাথে যেতে পার। আবার ইচ্ছা করলে আমার সাথেও যেতে পারো। আমি বললাম ঃ আমি আপনার সাথেই যাবো। তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে, তাহলে আমার স্ত্রী উম্মে সালামার সাথে শরীক হয়ে যাও। উম্মে সানানা বলেন ঃ আমি উম্মে সালামার সঙ্গিণী হয়ে গেলাম।"[১]

বাস্তব ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, সাধারণত মেয়েদের প্রকৃত অভিভাবক, বাপ, ভাই অথবা ছেলেদের মতো নিকটাত্মীয় মুহরেম পুরুষরাই তাদের সাথে করে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতো। হযরত আয়েশা রা. নবী স.-এর নীতি বর্ণনা প্রসংগে বলছেন ঃ

كان رسول الله ﷺ اذا اراد سفرًا اقرع بين ازواجه وايّهنّ خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে যেতে মনস্থ করলে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন এবং যার নাম উঠতো তাকে সাথে করে নিয়ে যেতেন।"[২]

যুদ্ধের ময়দানে মেয়েদের সেবার কাজও সীমাবদ্ধ থাকতো তাদের নিকটাত্মীয় ও আপনজনদের মধ্যে। কোনো সময় বেগানা পুরুষদের সাহায্য

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ ৮ম খণ্ড. পৃষ্ঠা-২১৪।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ হাদীসুল ইফকা।

www.bjilibrary.com

সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিলেও তারা অনিবার্যতার সীমা অতিক্রম করতো না এবং যথাসাধ্য খোলামেলা হওয়া থেকে বিরত থাকতো। ইমাম নববী র. মেয়েদের সামরিক সেবা সম্পর্কে বলেন ঃ

وهذا المداواة لمحارمهن وازواجهن وما كان منها لغيرهم لايكون فيه مس بشرة الا فى موضع الحاجة.

> "মেয়েদের এ চিকিৎসা ও সেবার কাজ তাদের মুহরেম পুরুষ ও স্বামীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। অন্যদের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে শরীর স্পর্শ না করে তা করা হতো তবে জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে তা ভিন্ন কথা।"[১]

যাই হোক সব যুগেই ইসলামী রাষ্ট্র এ ধরনের জরুরী ও নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। পূর্বোক্ত শর্ত মেনে এবং সীমার মধ্যে অবস্থান করে মুসলিম মেয়েরা নিজের আদর্শ ও দেশকে রক্ষার জন্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

ইতিহাস থেকে একটি ভ্রান্ত প্রমাণ ও তার পর্যালোচনা

এ আলোচনার সমাপ্তি টানার আগে ইসলামী ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা জরুরী বলে মনে হয়। কেননা একদিকে পূর্বের আলোচনাসমূহের সাথে এ ঘটনার গভীর ও নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। অপরদিকে এ ঘটনার ভিত্তিতে আমাদের যুগের কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মেয়েদের ব্যাপারে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মতবাদ ও দৃষ্টিভংগিকে অভিন্ন বলে প্রমাণ করতে চান। অতএব, এ দু'টির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য তালাশ করা দু'টি চরম পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারণার মধ্যে ঐক্যসূত্র অনুসন্ধান করারই নামান্তর। কারণ, পাশ্চাত্য নারীর জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক স্বাধীনতার দাবী করে তা ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম নারীকে যে দিকে নিয়ে যেতে চায় পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা তাকে ঠিক তার বিপরীত দিকে পথ দেখায়। ইসলাম গৃহকেই নারীর চেষ্টা-সাধনা ও কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু পাশ্চাত্য মতাদর্শ তাকে গৃহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শিক্ষা দেয়। ইসলাম নারীকে যে কর্মপদ্ধতি দিয়েছে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে তা তার অবমাননা ও লাঞ্ছনার সনদ। মোটকথা, নারী সম্পর্কে ইসলাম এবং পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার মধ্যে স্পষ্ট বৈপরিত্য বিদ্যমান। যে ঘটনার ভিত্তিতে এতো স্পষ্ট বৈপরীত্যকে অস্বীকার

---

১. শারহু মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৬।

www.bjilibrary.com

করা হয়েছে তাহলো, হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হলে হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে হযরত আয়েশা রা. রাজনীতিতে পদার্পণ করেন। তিনি হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে শরীআতের বিধান কার্যকর করার জন্য পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টা চালালেন এবং এ ক্ষেত্রে এতোদূর অগ্রসর হলেন যতোদূর কোনো নেতৃস্থানীয় পুরুষই কেবল অগ্রসর হতে পারে। এমনকি নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে হযরত আলী রা.-এর মতো ব্যক্তিত্বকেও প্রতিবন্ধক মনে করে তাঁর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

এ ঘটনা থেকে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ইসলাম পুরুষকে যতোটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অধিকার দেয় নারীর জন্যও ততোটা অধিকার বৈধ মনে করে। সুতরাং তার সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা সীমিত করা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক নয়। অন্য কথায় শরীআতের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যের কোনো গুরুত্বই নেই। পুরুষ ও নারী জীবনের সবরকম সমস্যার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে এবং তার সমাধানের প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে সমানভাবে স্বাধীন।

এ ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এতোটুকু বলতে চাই যে, এ ঘটনাটিকে যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা মেনে নিলেও তার ভিত্তিতে বড় জোর এতোটুকু বলা যায় যে, হযরত আয়েশা রা.-এর মতে নারীরও রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অধিকার ছিল। তিনি রাজনীতিকে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করতেন না। কিন্তু আরো অগ্রসর হয়ে একথা বলা ভুল হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও মেয়েদের রাজনৈতিক ভূমিকা এটাই ছিল বা এটাই ইসলামের বিধান। কারণ, কারো কোনো ব্যক্তিগত কাজকে সমষ্টির কাজ বলে প্রমাণ করা যায় না। দাবীটা যে পর্যায়ের এবং যে ধরনের হবে তা প্রমাণ করার জন্য সে পর্যায় ও মর্যাদার প্রমাণাদিও থাকা প্রয়োজন। নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্ম রাতের গভীর নিস্তব্ধতায় কিংবা বিশাল সাম্রাজ্যের কোনো প্রত্যন্ত এলাকায় সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনা নয় যে, দু'-একটি ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারাই আমরা তা প্রমাণ করতে পারি। এটি একটি ব্যাপকভিত্তিক ব্যাপার। এটিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও আইন কানুন অধ্যয়ন করতে হবে এবং তার মেজাজ ও প্রকৃতি দেখতে হবে। ইসলামী তাহযীবের মূলনীতি ও সামাজিক আইন-কানুন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে এবং তার আলোকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, ইসলামী সমাজে নারীর দিনরাতের কর্মতৎপরতা কি

www.bjilibrary.com

ছিল এবং তারা কি ধরনের জীবন যাপন করতো। এছাড়া সমাজে নারীর মর্যাদা নির্ধারণ করা যাবে না।

ইসলামের শিক্ষা ও মেজাজ সম্পর্কে বলতে গেলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইসলাম নারীকে গৃহের অভ্যন্তরে দেখতে চায়। আর ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলাম যে সমাজ গড়ে তোলে তাও ঘরকেই নারীর সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে নির্দিষ্ট করে। ঘরের বাইরে সে সবসময় পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব সে কখনো লাভ করে নাই এবং কখনো তা দাবীও করে নাই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলিম জাতি বহুসংখ্যক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তার সমাধানের জন্য জাতি কখনো কোনো নারীর ওপর নির্ভর করেনি। এ সুদীর্ঘ সময়ে কয়েকটি যুদ্ধও হয়েছে কিন্তু কোনো সময় কোনো মহিলা সেনাপতি হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোনো মহিলা সাহাবীকে এ পদের উপযুক্ত মনে করা হয়নি। অর্থ ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, কিন্তু এসব দায়িত্ব কোনো মহিলার ওপর অর্পণ করা হয়নি। নবী স.-এর ওফাতের পর ক্রমাগত একের পর এক খিলাফত সমস্যার সমাধান করেছে কিন্তু কোনো সময় কোনো নারীকে খলীফা বানানোর প্রশ্নও ওঠেনি।

হযরত আয়েশা রা.-এর কোনো কাজ দ্বারা সমষ্টিগত এ কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে নিশ্চিতভাবে তা হবে আমেরিকায় উপবাস ও দারিদ্র্যের দু'-একটি ঘটনার ভিত্তিতে এ দাবী করে বসার শামিল যে, অভাব অভিযোগ ও দারিদ্র সেখানে ব্যাপক এবং প্রায় প্রতিদিনই মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। এ দাবীকে যদি সত্য বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে সেখানকার প্রাচুর্য ও আরাম আয়েশের সবকিছুই অস্বীকার করতে হবে। সেখানকার সম্পদ ও প্রাচুর্যকে দারিদ্র ও কষ্টের কারণ এবং আরাম আয়েশ ও বিলাসিতাকে দারিদ্র ও অভাবের লক্ষণ বলে প্রমাণ করতে হবে। এরূপ দুঃসাহস যে খুব কম লোকই দেখাতে পারবে তা সবারই জানা।

এছাড়া হযরত আয়েশা রা.-এর কোনো কাজ যদি আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হয় তাহলে অন্যসব উম্মুল মু'মিনীন এবং বড় বড় মহিলা সাহাবা আমাদের জন্য অনুসরণীয় হবেন না কেন? হযরত আলী রা.-এর সাথে হযরত আয়েশা রা.-এর যুদ্ধ যদি আমাদের জন্য দলীল হয় তাহলে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর নীতি ও আচরণ কেন অনুসরণযোগ্য আদর্শ

www.bjilibrary.com

হতে পারবে না? যে সময় হযরত আলী রা., হযরত যুবায়ের রা., তালহা রা. ও হযরত আয়েশা রা.-এর মোকাবিলার জন্য বসরার অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন হযরত উম্মে সালামা রা. হযরত আলী রা.-কে বললেন ঃ

يا امير المؤمنين لولا ان اعصى الله وانك لاتقبله منى لخرجت معك وهذا

ابن عمى وهو والله اعز على من نفسى يخرج معك ويشهد مشاهدك.

"হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার সাথে এ যুদ্ধে আমার অংশগ্রহণ করা আল্লাহর না-ফরমানী হিসেবে গণ্য হবে। আর আমার এ পদক্ষেপ আপনি গ্রহণও করবেন না—এমনটা যদি না হতো তাহলে আমি আপনার সাথে যাত্রা করতাম। আমার এ চাচাতো ভাইটিকে সাথে নিয়ে যান। আল্লাহর শপথ! সে আমার কাছে আমার জীবনের চেয়েও বেশী প্রিয়। সে আপনার সাথে যাবে এবং আপনার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।"[১]

অপরদিকে হযরত আয়েশা রা.-কে তিনি লিখলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিম উম্মার মধ্যে আপনার মর্যাদা একটি দরজার মতো। আপনার হিজাব যেন তার ওপরে হুরমতের পর্দা। কিন্তু আপনি সে পর্দা ছিড়ে ফেলেছেন। (মনে রাখবেন) কুরআন আপনার তৎপরতাকে গুটিয়ে দিয়েছে, আপনি তা বিস্তৃত করবেন না। আল্লাহ আপনাকে ঘরের মধ্যে বসিয়েছেন আপনি তা ছেড়ে ময়দানে বেরিয়ে পড়বেন না। এ উম্মতের সহায়ক আল্লাহ তাআলা নিজেই আপনি নিজে জানেন নবী স. আপনাকে কতো ভালোবাসতেন। যদি উম্মতের দায় দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করতে চাইতেন তাহলে তা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। আপনি এও জানেন যে, দীনের থামগুলো যদি ভেঙে পড়তে শুরু করে তাহলে মেয়েরা তা খাড়া করতে পারে না। আর তাতে যদি চিড় ধরে তাহলে তা মেরামত করার সাধ্যও নারীর নেই। দীনের জন্য জিহাদ করার যোগ্যতা যদি মেয়েদের মধ্যে থাকতো তাহলে নবী স. সে বিষয়ে অবশ্যই আপনাকে অছিয়ত করে যেতেন। মেয়েদের জিহাদ এবং তাদের জন্য অতিব পসন্দনীয় ব্যাপার হলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং নিজেকে সংযত রাখে।

একবার চিন্তা করে দেখুন, নবী স.-এর সাথে যদি এমন অবস্থায় আপনার সাক্ষাত হতো যে, আপনি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে পাহাড় এবং টিলার মাঝে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ছুটে বেড়াচ্ছেন, তাহলে তাঁকে কি জবাব দিতেন? কাল আপনাকে নবী স.-এর সামনে হাজির হতে হবে। অথচ আপনি আল্লাহর নির্ধারিত পর্দা ছিড়ে ফেলেছেন এবং তাঁর সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন

১. তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৭; তারীখুল কামেল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪।

www.bjilibrary.com

করেছেন। আপনি যা কিছু করেছেন তা যদি আমি করতাম, আল্লাহর শপথ তাহলে জান্নাতে যাওয়ার মুহূর্তেও আমি লজ্জাবোধ করতাম। তাই আমার কথা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত পর্দাকে আপনি নিজের পর্দা এবং গৃহের আঙিনাকে নিজের দূর্গ বানিয়ে নিন। আপনি উম্মতের প্রকৃত কল্যাণকামী তখনই হবেন যখন আপনি তাদের সাহায্যের জন্য (ময়দানে না গিয়ে) ঘরেই অবস্থান করবেন। আমি নবী স. থেকে যে হাদীস শুনেছি তা যদি আপনাকে শুনাই তাহলে (একথা নিশ্চিত যে,) আপনি আমাকে সাপের মতো দংশন করার জন্য তেড়ে আসবেন।"[১]

শুধুমাত্র হযরত উম্মে সালামা রা.-এর সমালোচনা করেছেন বলে মনে করলে ভুল হবে। বরং উম্মতের শীর্ষস্থানীয় অনেকেই হযরত আয়েশা রা.-এর এ পদক্ষেপকে ভ্রান্ত এবং শরীআতের সীমালংঘন বলে ঘোষণা করেছিলেন।

হযরত আয়েশা রা. তাঁর যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য বসরায় পৌঁছে যায়েদ ইবনে সূহানকে নিজের সন্তান বলে সম্বোধন করে পত্র লিখলেন যে, "হযরত উসমানের কিসাস নেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে তুমিও তাতে শরীক হও। আর শরীক হতে না চাইলে নিজের কওমের লোকদেরকে অন্তত হযরত আলীর সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখো।" পত্রখানা পাঠ করে যায়েদ ইবনে সূহান বললেন ঃ আল্লাহ উম্মুল মু'মিনীনের প্রতি রহম করুন। তাঁকে গৃহে অবস্থান করতে আর আমাদের বাইরে বেরিয়ে জিহাদ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যা করতে তিনি বাধ্য, নিজে তা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন এবং আমাদের দিয়ে তা করাতে চাচ্ছেন। আর আমাদের যে কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের তা করতে বাধা দিচ্ছেন। তারপর পত্রের জবাবে হযরত আয়েশা রা.-কে লিখলেন ঃ "নিসন্দেহে আমি আপনার নিজের সন্তান (আর আপনি আমার মা)। তবে তার জন্য শর্ত হলো, আপনি এসব তৎপরতা পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে যান। অন্যথায় মনে করবেন, আমিই হবো আপনাকে পরিত্যাগকারী প্রথম ব্যক্তি।"[২]

বসরার অপর একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব রাসূল স.-এর সাহাবা জারিয়া ইবনে কুদামা হযরত আয়েশা রা.-কে বলেন ঃ আপনার এ বিদ্রোহের তুলনায় হযরত উসমানের শাহাদাত আমাদের কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা আপনাকে মর্যাদা দান করেছিলেন এবং পর্দা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি সে পর্দা ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং তার মর্যাদা নষ্ট করেছেন। কেউ যদি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয মনে করে তাহলে

১. আল ইকদুল ফরীদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭; আল ইমামাতু ওয়াস সিয়াসা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৭।
২. তাবারী, ৫ম খণ্ড, ১৮৩, ১৮৪ পৃষ্ঠা ; আল কামেল, ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৭।

www.bjilibrary.com

তার অর্থ দাঁড়ায় সে আপনাকে হত্যা করা জায়েয মনে করে। (ভেবে দেখুন, আপনি মানুষকে কতো নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।) অতএব, আপনি যদি স্বেচ্ছায় এসে থাকেন তাহলে আপনার নিজের ঘরে ফিরে যান। আর যদি এখানে আসতে আপনাকে বাধ্য করা হয়ে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে সকলের সহযোগিতা গ্রহণ করুন এবং নিজের অবস্থানস্থলে চলে যান।[১]

বিখ্যাত সাহাবা হযরত আবু বাকরাহ্ রা. বলেন ঃ "জামাল যুদ্ধে আমিও হযরত আয়েশা রা.-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু নবী স.-এর একটি বাণী আমাকে তা থেকে রক্ষা করেছে। কিসরার কন্যার সিংহাসনে আরোহণের খবর শুনে তিনি বলেছিলেন, যে জাতি তার শাসনক্ষমতা কোনো নারীর ওপর অর্পণ করে সে জাতি কখনো কামিয়াব হতে পারে না।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মতো সম্মানিত সাহাবা বলেন ঃ

وبيتها خير لها من هودجها

"হযরত আয়েশা রা.-এর জন্য তাঁর ঘর উটের হাওদার চেয়ে উত্তম।"[৩]

এসব সমালোচনা হযরত আয়েশা রা.-এর বিরোধীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে কেউ তা উপেক্ষা করতে পারে না। কেননা তাঁরা সবাই অত্যন্ত সম্মানিত। হযরত আয়েশা রা. নিজেও তাঁদের নেকী ও সত্যাশ্রয়িতার স্বীকৃতি দিতেন। বিরোধিতার আগে তাঁদের মতো সাহাবা এবং তাবেয়ীগণও যদি সত্য থেকে বিচ্যুত হন তাহলে দীনকে আঁকড়ে ধরে তার ওপর দৃঢ়পদে থাকা আর কার কাছে আশা করা যেতে পারে ?

তা ছাড়া এটিও ভেবে দেখার মতো একটি বিষয় যে, মুসলিম জাতিকে তার প্রথম দিকের কয়েকটি বছরে অসংখ্য রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক ঝড় ঝঞ্ঝার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং ইতিহাস সাক্ষী যে, জাতির পুরুষ লোকেরাই এসব ঘটনা প্রবাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। জাতির কোনো মহিলা সদস্যই কার্যত এর মোকাবিলা করেনি। হযরত আয়েশা রা.-কেই দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময় ঘটনা প্রবাহে একের পর এক উত্থান পতন এসেছে। কিন্তু হযরত আয়েশা রা. তা থেকে সবসময় দূরে অবস্থান করেছেন এবং সংস্কার ও সংশোধনের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর কি কারণ থাকতে পারে ? এটা কি প্রমাণ করে না যে, গৃহকেই তিনি তাঁর তৎপরতা ও কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু

১. তারীখুর রসূল ওয়াল মুলূক তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৬।
২. বুখারী, কিতাবুল ফিতান।
৩. আল-ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২।

www.bjilibrary.com

মনে করতেন ? তাঁর গোটা জীবন যে ধ্যান-ধারণা ও কর্মের সাক্ষ পেশ করছে কোনো একটি কাজের ভিত্তিতে তা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা যায় না। তাঁর এ কাজের এমন ব্যাখ্যা আমাদের অবশ্যই করতে হবে যা তাঁর গোটা জীবনের আচরণ ও কর্মধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কারণ, আমরা যা বুঝেছি বা ধরে নিয়েছি তাঁর সে কাজের পেছনে হয়তো সেসব কারণ আদৌ কাজ করেনি। বরং অন্য কিছু কারণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে হাজির করেছে। আসুন! এ ঘটনার তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা যাক।

হযরত উসমানের খিলাফতের শেষ দিকে তাঁর বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। লোকজন প্রকাশ্যে তাঁর সমালোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। এমনকি এক সময় বিভিন্ন অঞ্চলের গুণ্ডা ও উচ্ছৃঙ্খল লোকজন মদীনার ওপর চড়াও হয় এবং পরিণামে হযরত উসমানের শাহাদাতের মতো মহাদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো কোনো প্রবীণ ও সম্মানিত ব্যক্তি এ সয়লাব রোধ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। আর তাই এ ফিতনা দ্বারা দীন ও ঈমানের যে ক্ষতি হওয়ার ছিল তা ঠিকই হয়েছে। এটি ছিল এ ধরনের প্রথম ঘটনা যা জাতিকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিয়েছিল। দূরদর্শী ব্যক্তিগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এটি তাদের ব্যর্থতা এবং ফিতনাবাজ লোকদের সফলতা। যদি যথাসময়ে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে দীন চিরদিনের জন্য দুষ্কৃতকারীদের হাতের খেলনায় পরিণত হবে। কেউ কেউ এর প্রতিকার হিসেবে মনে করলেন, যারাই হযরত উসমানের শাহাদাতের ঘটনায় শরীক ছিল অতি শীঘ্র তাদের থেকে কিসাস নিতে হবে। তা না হলে সামগ্রিকভাবে জাতির সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস পাবে এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয় উচ্ছৃঙ্খল লোকের হাতে চলে যাবে। তারা যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচিত করবে এবং যখনই ইচ্ছা তাকে হত্যা করবে। জবাবদিহির জন্য কোনো শক্তিই তাদের বাধ্য করতে পারবে না। এরূপ চিন্তাধারার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত যুবায়ের রা. এবং হযরত তালহা রা.। মালীহ ইবনে আওফ আস-সালামী হযরত যুবায়ের রা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আপনারা কি চান ? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

ننهض الناس فيدرك بهذا الدم لئلا يبطل فان ابطاله توهين سلطان الله بيننا ابدا اذا لم يفطم الناس عن امثالها لم يبق امام الاّ قتله هذا انضرب قال والله ان ترك هذا الشديد ولا تدرون الى اين ذالك يسير.

www.bjilibrary.com

"এ রক্তের বদলা নেয়ার জন্য আমরা মানুষকে উৎসাহিত করছি যাতে তা ব্যর্থ হয়ে না যায়। কারণ, তা ব্যর্থ হয়ে গেলে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা (ইসলামী সরকার) চিরদিনের জন্য দুর্বল হয়ে পড়বে। মানুষের এ অভ্যাসের মূলোৎপাটন যদি সম্ভব না হয় তাহলে যিনিই ইমাম নির্বাচিত হবেন তাকেই তরবারির আঘাতে খতম ক'রে দেবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ ! এ কিসাস গ্রহণ করা অত্যন্ত মারাত্মক। তোমরা জানো না এর পরিণাম কত ভয়ংকর হতে পারে।"[১]

এখানে আরো একদল লোক ছিল যারা উম্মতের ঐক্য ও সংহতিকে মৌলিক গুরুত্ব দিচ্ছিল। তারা দেখছিলো যে, জাতির ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং গোটা জাতি একটি বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে তার সামনে হযরত উসমান রা.-এর কিসাসের বিষয় তুলে ধরার অর্থ হলো আরো অধিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনা। তাই তারা সর্বপ্রথম জাতিকে একটি কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করা অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেন। সুতরাং তারা হযরত আলী রা.-কে খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করলেন। মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের সমর্থন করলো। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর পর প্রথমোক্ত চিন্তাধারার অনুসারী বহুসংখ্যক লোক মদীনা ছেড়ে অন্যান্য শহরের দিকে যাত্রা করলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মক্কায় গিয়ে হাজির হলো যেখানে আগে থেকেই উম্মুল মু'মিনীনগণ অবস্থান করছিলেন। মদীনায় যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা তাঁরা জানতেন না। কারণ, এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই তাঁরা হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় চলে এসেছিলেন। তাঁরা মদীনা থেকে আগত লোকদের কাছে সেখানকার অবস্থা জানতে চাইলে তারা এমন চিত্র পেশ করলো যা প্রকৃত অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। অর্থাৎ ভাবখানা এমন যেন খিলাফত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং মদীনাতে দুষ্কৃতকারী ও গুণ্ডাপাণ্ডাদের দৌরাত্ম্য চলছে। তাদের নিয়োজিত এক ব্যক্তিই শাসনকার্য পরিচালনা করছে।

হযরত আয়েশা রা. তাঁর এক আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি অবস্থা ? সে বললো ঃ পরিস্থিতির কঠোরতায় সবাই যেন ধ্বংস এবং বধির হয়ে গেছে। হযরত আয়েশা রা. অনুশোচনা প্রকাশ করার পর আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ অবস্থা কি আমাদের অনুকূলে আছে না প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে ? সে বললো ঃ আমি এতো কিছু জানি না। হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর আটদিন পর্যন্ত জনগণ আমীর ছাড়াই জীবন যাপন করেছে। অতপর মদীনাবাসী এবং মদীনার দখলদাররা (অর্থাৎ বাইরের গুণ্ডারা) হযরত আলী রা.-এর চারপাশে একত্র হয়েছে।[২]

---

১. তারিখুর রুসুর অল মুলূক তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ.-১৭৩।
২. তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৫।

www.bjilibrary.com

হযরত আয়েশা রা.-এর আরো একজন আত্মীয় তাঁর কাছে বর্ণনা করেন ঃ

قتل عثمان واجتمع الناس على علىّ والامر امر الغوغاء.

"হযরত উসমান রা.-কে হত্যা করা হয়েছে। অতপর লোকজন সর্বসম্মত-ভাবে হযরত আলী রা.-এর বাইয়াত গ্রহণ করেছে। তবে প্রকৃত ক্ষমতা গুণ্ডাপাণ্ডাদের হাতে।"[১]

যারা মক্কায় পৌঁছেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত তালহা রা. এবং হযরত যুবায়ের রা.-ও ছিলেন। তাঁরা হযরত আলী রা.-এর বাইয়াতের ব্যাপারে একমত ছিলেন না। তাই হযরত আলী রা.-এর পক্ষে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ না নেয়া এবং নতুন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাঁদের মধ্যে কঠোর মনোভাব থাকা কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং হযরত আয়েশা রা.-এর জিজ্ঞাসার জবাবে তাঁরা যে ভাষায় উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছিলেন নিম্নোল্লেখিত বক্তব্য থেকে তা অনুমান করা যায় ঃ

انا تحملنا بقلتنا هرابا من المدينة من غوغاء واعراب وفارقنا قومًا حيادى لايعرفون حقا ولا ينكرون باطلا ولا يمنعون انفسهم -

"আমরা আমাদের সংখ্যাল্পতার কারণে দুষ্কৃতকারী ও বদ্দুদের ভয়ে পালিয়ে এসেছি। আর সেখানে রেখে এসেছি দিশেহারা লোকদেরকে (মদীনাবাসী) যারা ন্যায় ও সত্যকেও চিনে না এবং বাতিলকেও অপসন্দ করে না। আর নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের নেই।"[২]

হযরত তালহা রা. ও যুবায়ের এবং তাদের সমচিন্তার লোকজন যে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন মক্কায় পৌঁছার পরই তাঁরা সে লক্ষে উপনীত হওয়ার জন্য পরিস্থিতি অনুকূলে নিয়ে আসার কাজ শুরু করে দেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা জাতিকে হযরত উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নেয়ার আহ্বান জানান। এজন্য তাঁদের প্রয়োজন ছিল উম্মুল মু'মিনীনদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করা। ঘটনাক্রমে তাঁরাও তখন মক্কাতেই ছিলেন এবং নতুন পরিস্থিতির কারণে বেশ উদ্বিগ্নও ছিলেন। কোনো আন্দোলনের প্রতি তাদের সহানুভূতি তাতে জীবন প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারতো। তাই তাঁরা উম্মুল মু'মিনীনদের কাছে গিয়ে আবেদন জানালেন যে, দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা-সাধনা ও তৎপরতা তারা চালাচ্ছে তাতে তারাও যেন অংশগ্রহণ করেন। সমাজে হযরত আয়েশা রা. ও হাফসা রা.-এর প্রভাব বেশী থাকার কারণে তাঁরা বিশেষভাবে তাঁদের কাছে গিয়ে সহযোগিতার

১. তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৬।
২. তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলূক, তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৯।

www.bjilibrary.com

আবেদন জানালেন। কিন্তু কেবলমাত্র হযরত আয়েশা রা. ছাড়া আর সবাই একে সীমালংঘন বলে আখ্যায়িত করলেন এবং সহযোগিতা দান করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাই তারা সবাই মদীনায় ফিরে আসলেন।

হযরত আয়েশা রা. সম্ভবত চিন্তা করেছিলেন যে, ইতোপূর্বে শুধু এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রা.-এর দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতা 'ইরতিদাদ' বা ইসলাম ত্যাগের মতো ফিতনার মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছিল। এখনও এ উম্মতের মধ্যে এতোটা শক্তি ও সচেতনতা আছে যে, তা বর্তমান বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ দমন করতে পারে। প্রয়োজন শুধু একজন দৃঢ়সংকল্প ও মযবুত ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির যিনি এ উদ্দেশ্যে জাতিকে প্রস্তুত করে নিবেন। মোটকথা, চিন্তা যাই থাকুক না কেন, তিনি উম্মতকে তার অবস্থা শুধরে নেয়ার আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তাই এ ব্যাপারে তিনি বসরায় গিয়ে পৌঁছলে বসরার গভর্নর উসমান ইবনে হানীফ, ইমরান ইবনে হুসাইন এবং আবুল আসওয়াদকে তাঁর উদ্দেশ্য জানার জন্য তাঁর কাছে পাঠালেন। তাঁর প্রশ্নের জবাবে হযরত আয়েশা রা. বললেনঃ

ان الغوغاء ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله ﷺ واحد ثوا فيه وأوو المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله مع مانالوا من قتل المسلمين ...بلاترة ولا عذر فاستحلوا الدم الحرام واحلوا البلد الحرام والشهر الحرام فخرجت في المسلمين اعلمهم ما اتى هؤلاء وما الناس فيما وراء نا وما ينبغي لهم من اصلاح هذه القصة وقرأت لاخير في كثير من نجواهم الامن امر بصدقةٍ او معروف اواصلاحٍ بين الناس ومن يفعل ذالك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجراً عظيما فهذا شأننا الى معروف نأمركم به ومنكرٍ تنها كم عنه.

"গুণ্ডা এবং বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা রাসূল স.-এর হারামে যুদ্ধ করেছে, সেখানে বিদআতের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং বিদআতীদের আশ্রয় দিয়েছে। তারা এভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের লা'নতকে নিজেদের জন্য অবশ্যম্ভাবী করে নিয়েছে। তাছাড়া তারা মুসলমানদের ইমামকে কোনো যুলুম বা বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করেছে। সুতরাং একই সাথে তারা হারাম রক্তকে হালাল করে রক্তপাত ঘটিয়েছে। আর অধিকার ছাড়াই অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। হারাম মাস ও মদীনার মর্যাদা নষ্ট করেছে। আমার বেরিয়ে আসার কারণ হলো, ফিতনাবাজ লোকেরা কি কি দুষ্কর্ম

www.bjilibrary.com

করেছে এবং যাদের রেখে এসেছি তারা কি অবস্থায় সেখানে পড়ে আছে এবং এ পরিস্থিতিতে তাদের কিরূপ সংস্কার কর্ম করা উচিত জনগণকে তা জানানো। অতপর হযরত আয়েশা এ আয়াত পাঠ করলেন। আয়াতের অনুবাদ ঃ "তাদের বেশীর ভাগ কানাঘুষায় কোনো প্রকার কল্যাণ নেই। তবে কেউ যদি এভাবে দান খয়রাত, নেকীর কাজ এবং মানুষের সংশোধনের জন্য কিছু বলে তাহলে তা অবশ্যই ভাল কথা। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এরূপ করবে তাকে আমি বড় পুরস্কার দেব।" এরপর তিনি বললেন ঃ এ হলো আমাদের অবস্থান। আমরা তোমাদের ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করছি।"[১]

কা'কা' তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ উম্মুল মু'মিনীন! আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন ? তিনি বললেন ঃ

ای بنى الا صلاح بين الناس.

"বেটা! মানুষের মধ্যে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করতে এসেছি।"[২]

এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর সামনে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের কোনো লক্ষ ছিল না। আর তিনি পরিকল্পিতভাবে হযরত আলী রা.-এর সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেও বের হননি। বরং তাঁর লক্ষ ছিল শুধু নিজের প্রভাব খাটিয়ে উম্মতকে সংস্কার ও সংশোধনের প্রতি মনোযোগী করা।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ

ان عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وانما خرجت بقصد الاصلاح بين المسلمين وظنت ان فى خروجها مصلحة للمسلمين.

"হযরত আয়েশা রা. যুদ্ধ করেননি। কিংবা যুদ্ধের নিয়তে তিনি বেরও হননি। তিনি শুধু মুসলমানদের সংশোধনের জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর ঘর ছেড়ে বের হওয়ার মধ্যে মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত আছে।"[৩]

এতে সন্দেহ নেই যে, পরে হযরত আয়েশা রা.-কে হযরত আলী রা.-এর সাথে যুদ্ধও করতে হয়েছে। কিন্তু এতে তাঁর ইচ্ছা বা সংকল্প কোনোটাই ছিল না ; বরং পরিস্থিতি তাঁকে এতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।

অনুরূপভাবে এটিও সত্য যে, সমমনা লোকদের মধ্যে যদিও তিনি নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তাঁর অনুমোদনক্রমে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত

১. আল কামেল ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৯ ; তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৪।
২. আল কামেল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৯ ; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৭।
৩. মিনহাজুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫।

www.bjilibrary.com

নেয়া হতো এবং তাঁর পরামর্শ ছাড়া কোনো বিষয়ে ফায়সালা হতো না, কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইতিহাস থেকে এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ পেশ করা যায় না যে, তিনি শুধু একজন পরামর্শ ও শুভাকাঙ্ক্ষীর পর্যায় ছেড়ে অগ্রসর হয়ে নেতৃত্বের দাবীও করে বসেছিলেন। আর যেসব লোক তার ইংগিতে জান ও মাল বিলিয়ে দিতে শুধু রাজি ছিল তাই নয় বরং কার্যত যারা জান ও মাল বিলিয়ে দিচ্ছিল তারাও আইনগতভাবে তাঁকে নিজেদের খলীফা হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। এমনকি সেই সময় নামায পড়াতেন হযরত তালহা রা. অথবা যুবায়ের রা.। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হলে হযরত আয়েশা রা.-এর পরামর্শেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে এ দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু এ কাজের জন্য একজনও হযরত আয়েশা রা.-এর নাম প্রস্তাব করলো না। অথচ নামাযের ইমামতি জাতীয় নেতৃত্বের একটি ক্ষুদ্র মডেল বা নমুনা। এসব কিছুই সংঘটিত হচ্ছিল সেসব লোকের মধ্যে যারা তাঁর বিরোধী পক্ষ নয়, বরং সহযোগী ও সাহায্যকারী এবং যাদের দৃষ্টিতে তাঁর দীনি মর্যাদা হযরত তালহা রা., যুবায়ের রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

যাই হোক সে সময় অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো। আর এ পরিস্থিতির ফল ছিল এ ঘটনা। এ সময় হযরত আয়েশা রা.-কে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল সাধারণ পরিস্থিতিতে যা তাঁর নিকট থেকে কখনো আশা করা যেতো না। এমন একটি ঘটনাকে সব যুগের জন্য স্থায়ী সনদ মনে করা কোনো পিপাসা কাতর লোককে মদ পান করতে দেখে মদ জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেয়ারই শামিল।

❑

www.bjilibrary.com

যৌন সম্পর্ক

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত

যৌন সম্পর্কের ধরন কি হবে ? মানুষের ইতিহাস যতো প্রাচীন এ প্রশ্নও ততো প্রাচীন। এ প্রশ্নের উৎস যৌন আকাঙ্ক্ষা নয়। বরং এর পেছনে বংশ সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষাও কার্যকর আছে। কারণ, নিজের বংশধারাকে সচল রাখার জন্য যৌন সম্পর্ক ছাড়া আজ পর্যন্ত মানুষ আর কোনো পন্থা-পদ্ধতির কথা অবহিত নয়। এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষের বংশধারাও থেমে যাবে। এ কারণে প্রাচীনকালের ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ যৌন আবেগকে এমন একটি অদৃশ্য শক্তি বলে মনে করতো যা তার জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে ক্ষমতার অধিকারী। তাই মিশর, সুদান, পশ্চিম আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার অধিকাংশ জাতির মধ্যে এ শক্তির সামনে নিজেদের অসহায়ত্বের অনুভূতি লক্ষ করা যেতো। তারা নিজেদের গোষ্ঠী ও বংশকে যৌন শক্তির অভিশাপ ও ক্রোধ থেকে রক্ষা করার জন্য তার সন্তুষ্টি বিধানকে অতিব প্রয়োজনীয় মনে করতো। এ উদ্দেশ্যে কোনো কোনো জাতির লোক এমন সব মূর্তি নির্মাণ করেছিল যার মধ্যে যৌনতার দিকটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হতো। অনেক জাতি ও গোত্রের প্রতিমার আকার আকৃতিই হতো যৌনাঙ্গের অনুকরণে। কারণ, যৌনাঙ্গ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল, যে অদৃশ্য শক্তি মানুষের বংশধারা বাঁচিয়ে রেখেছে এটি তারই প্রতীক। এমন কি আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মগত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যও এমন সব জিনিস মনোনীত করা হতো যা যৌনাঙ্গের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতো অথবা তা থেকে কোনো না কোনোভাবে যৌন আবেগ প্রকাশ পেত। এমন অনেক জাতি পাওয়া যাবে যাদের আনন্দ বা দুঃখের অনুষ্ঠানে যৌন উপাদান অন্তর্ভুক্ত আছে। আজও ভারত এবং ভারতের বাইরে এমন অনেক অসভ্য উপজাতি আছে যৌন আবেগ ও অনুভূতির পূজা যাদের ধর্মের অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে।

এসবই মানুষের একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফল। আর তাহলো, সে চায় তার সন্তান থাকুক যাতে সে সন্তান জীবনের সবরকম তৎপরতায় তাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যখনই সে এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে মনোযোগী হয় তখনই তার সামনে বহু সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যেমন ঃ সে কি তার সব সন্তানকেই বাঁচিয়ে রাখবে নাকি কেবল সেসব সন্তানকেই বাঁচিয়ে রাখবে যারা তার জন্য উপকারী হবে ? তাদের লালনপালন ও সেবা যত্ন কে করবে ? এটি কি শুধু নারীর দায়িত্ব না পুরুষের, নাকি নারী-পুরুষ উভয়েই এ দায়িত্বের

www.bjilibrary.com

সমান অংশীদার ? এছাড়াও তাদের মধ্যে জীবনোপকরণ, অর্থ-সম্পদ ও আসবাব-পত্র কিভাবে বণ্টিত হবে ? এসব প্রশ্নই ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে বংশ ও গোত্র এবং জাতি ও রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করেছে। আর এভাবে তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়ে আসছে। গোত্রীয় ও উপজাতীয় জীবন কোনো এক সময় মাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। পিতা শ্রম ও কষ্টের বিনিময়ে জীবনোপকরণ সংগ্রহ করতেন আর মা তার মালিক মোখতার হয়ে সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য খরচ করতেন। এমন কি সন্তানরাও মায়ের নামেই পরিচিত হতো। কোথাও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে গোটা পরিবারের ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার কোথাও পিতা-মাতা উভয়ে মিলে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন বলে দেখা যায়।

সমস্যা সমাধানের উপায় ও পন্থা ভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে যৌন সম্পর্কের ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে। এ সম্পর্কের ধরন ছিল কোথাও সাময়িক বা অস্থায়ী আবার কোনো কোনো অবস্থায় একে স্থায়ী প্রকৃতির বলে মনে করা হয়েছে। কোনো কোনো জাতিকে এজন্য অনেক বিধি বন্ধনের বেড়া ডিঙাতে হতো। আবার কোনো কোনো অবস্থায় শুধু নারী পুরুষের ইচ্ছা ও সম্মতি তাকে বৈধ রূপ দান করতো। কোথাও এক বিবাহের প্রচলন ছিল। আবার কোথাও পরিবারের সবার একজন নারীকে ভোগ করার অধিকার ছিল। কোথাও বহু-বিবাহ প্রথা চালু ছিল আবার কোথাও এক বিয়ের নিয়ম প্রচলিত ছিল। মোটকথা, এমন একক কোনো নিয়ম-কানুন বা বিধান ছিল না যা সমস্ত জাতি মেনে চলতো।

এসব পন্থা পদ্ধতি সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয় যে, তা তখনকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। নিসন্দেহে এর কোনো কোনোটি মানুষ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রহণ করেছিল। তবে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, এর কোনো কোনো পন্থার প্রচলন হয়েছিল শুধুমাত্র যৌন তৃপ্তির জন্য। কারণ, এটা এক অকাট্য সত্য যে, যৌন আবেগ ও আকর্ষণ প্রায় অদম্য যার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন। তাই হয়তো সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখেই মানুষ যৌন ক্ষুধা ও আবেগ অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছিল। এ ধারণা পোষণ করা অজ্ঞতা বা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং আমাদের পর্যবেক্ষণ ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যৌন তাড়না ও ক্ষুধা সামাজিক প্রয়োজনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এ কারণে সমাজকে যথেষ্ট ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে। এ কারণে হাজার হাজার জীবন ধ্বংস হয়েছে। মানুষের সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশ উধাও হয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবর্তে অশান্তি, ভীতি ও উদ্বেগ

www.bjilibrary.com

বিস্তার লাভ করেছে। তিক্ততা, মতানৈক্য এবং হত্যা ও খুন-খারাবী ব্যাপকতর হয়েছে। যৌন আবেগ ও তাড়নার পেছনে ছুটার কারণেই এসব হয়েছে।

বৈরাগ্যবাদ

এ অবস্থাই বৈরাগ্যবাদ ও বিষয় বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যৌন আবেগ অনুভূতি অবদমিত করার মধ্যেই শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতার মুক্তি আছে বলে মনে হয়েছে। কারণ, ফিতনা ও ফাসাদের এ উৎস মুখ যতোদিন বন্ধ না হবে ততোদিন আরাম ও শান্তি লাভ করা যাবে না। মিসর, গ্রীস, ভারতবর্ষ, চীন, ইউরোপ এবং আরো বহু জায়গায় এ দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে ও প্রসার লাভ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি যেখানেই বিস্তার লাভ করেছে সেখানেই তা মানুষকে যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করেছে এবং তার থেকে দূরে অবস্থান করা ও তাকে সযত্নে এড়িয়ে চলাকেই মানবতার সোপান এবং কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উপায় বলে ঘোষণা করেছে।

খৃস্টবাদের কথাই ধরুন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পরে এটি সংসার বিরাগী তথা বৈরাগ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকাই এর সারকথা বলে স্থিরিকৃত হয়। খৃস্টবাদের ধ্বজাধারীরা এ থেকে এমনভাবে দূরে অবস্থান করতো যেমন নোংরা ও ক্লেদময় স্থান অতিক্রমকালে কেউ তার পোশাক পরিচ্ছদ সযত্নে আগলে রাখে।

কথিত আছে যে, বৈরাগ্যবাদের দিকপাল ও গুরু সিভিস অত্যন্ত দুর্বল ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেলে তাঁর এ চরম বার্ধক্যের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁর শিষ্য ও বন্ধুবর্গ চাইলেন তিনি যেন জংগল পরিত্যাগ করে কোনো লোকালয়ে অবস্থান করেন। তিনি এ আবেদন গ্রহণ করলেন। তবে এ বলে শর্ত পেশ করলেন যে, লোকালয়টি এমন হতে হবে যেখানে কখনো কোনো নারীর সাথে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আর এটি তো জানা কথা যে, এমন কোনো লোকালয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব ব্যাপার। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি যথারীতি জংগলেই আশ্রয় নিলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করলেন।

সেন্ট বেসিল অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া কোনো নারীর সাথে সাক্ষাত করা নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। সেন্ট জন আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত কোনো নারীর চেহারা দেখেননি। শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী বাধ্য হয়ে তাকে বলে পাঠালো যে, তিনি তাকে দেখতে না আসলে সে আত্মহত্যা করবে। এর জবাবে তিনি জানালেন, আজ রাতে যে সময় তুমি শয়নকক্ষে অবস্থান করবে তখন আমি আসবো। ওয়াদা পূরণ হলো এভাবে যে, স্ত্রী রাতের বেলা তাঁকে

www.bjilibrary.com

স্বপ্নে দর্শন করলো। সম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীকে জন্মদান করার জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সাম্রাজ্ঞী জানুবীয়া তার স্বামীর সাথে যৌন মিলনে রাজি হয়নি। পিশা যদিও বিয়ে করেছিলেন কিন্তু সারা জীবন ছিলেন কুমারী। অর্থাৎ স্বামীকে তিনি কখনো তাঁর সাথে যৌন মিলন করতে দেননি।

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, এসব পাদ্রীরা মা ও বোনদের সংস্রব থেকেও পালিয়ে বেড়াতে শুরু করেছিল। অথচ মা ও বোনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাকে সারা দুনিয়া মর্যাদা ও গৌরবের কাজ বলে মনে করে। মা ও বোনের নৈকট্যও যেন তাদের জন্য ছিল একটি আযাব।

এক পাদ্রী সাহেব সফর করছিলেন। সাথে ছিল তার মা। পথিমধ্যে একটি ঝর্ণার কাছে এসে পড়লো তারা। ঝর্ণার ওপর কোনো পুল ছিল না। পাদ্রী সাহেব দ্রুত তার হাত ও শরীরে কাপড় এঁটে সেঁটে জড়াতে শুরু করলেন। মা বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তোমাকে কাঁধে উঠিয়ে অপর পারে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ভয় হচ্ছে, যদি আমার শরীর তোমার শরীরে লেগে যায় তাহলে মুহূর্তের মধ্যে আমার সমগ্র জীবনের পুণ্য সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সেন্ট জনের সহোদরা ভগ্নি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতো। তার নির্জন ও জংলী জীবন অবলম্বনের দীর্ঘ দিন পর তার ভগ্নির মনে তাকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। তাকে আসার জন্য সে বহু পত্র লিখলো। কিন্তু ভাই বার বার অস্বীকৃতি জানাতে থাকলো। অবশেষে বোন বাধ্য হয়ে নিজেই জংগলে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করতে মনস্থ করলো। সেন্ট মশাই এতে ভড়কে গেলেন। তিনি পত্র দিয়ে জানালেন যে, আমি নিজেই আসবো। সুতরাং তিনি আসলেন ঠিকই কিন্তু চেহারা আকৃতির এতটা বিকৃতি ঘটিয়ে আসলেন যে, বোন তাকে চিনতে সক্ষম হলো না। সে এ অবস্থায়ই ফিরে গেল। বোনের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগপত্র আসলে তিনি তাকে লিখে জানালেন, আমি গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু মসীহর দয়া ও মেহেরবাণীতে তুমি আমাকে চিনতে পারনি। তাই আর কোনো দিন আমার সাক্ষাত লাভের চিন্তাও করো না।

সেন্ট পেমন সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি ছয় ভাইয়ের সাথে হঠাৎ পরিবার-পরিজন ছেড়ে জংগলে চলে গেলেন। যে দুর্বল ও বৃদ্ধা মায়ের সাতটি সন্তানের সবাই এক সাথে মাকে ছেড়ে চলে যায় সেই মায়ের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তিনি অস্থির হয়ে জংগলে ছুটে আসলেন। এমন সময় তিনি জংগলে পৌঁছলেন যখন তার সন্তানরা সবাই হুজরা থেকে বেরিয়ে গীর্জায় যাচ্ছিল। মায়ের চেহরা দেখামাত্র সবাই ভীত

www.bjilibrary.com

সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। মা তৎক্ষণাৎ তাদের পেছনে পেছনে ছুটলেন। কিন্তু বৃদ্ধার দুর্বল ও অসাড় পা দুটি যৌবনের তেজে ভরা পা গুলোর সাথে পাল্লা দিতে পারলো না। মা হুজরার দরজায় পৌঁছার আগেই সন্তানেরা ভেতর থেকে অর্গল এঁটে দিলো। অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, দরজায় দণ্ডায়মান দুর্বল ও অসহায় মায়ের হৃদয় বিদারক চিৎকার ও আহাজারিতে বনভূমি কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। এ অবস্থায় সেন্ট পেমন দরজার কাছে এসে এ কান্নাকাটি ও বিলাপের কারণ জানতে চাইলেন। মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার সমস্ত দুঃখ তোমাদের দেখতে না পাওয়ার কারণে। তোমরা কি জান না, আমি তোমাদের মা? আমি কি তোমাদেরকে আমার বুকের দুধ খাইয়ে প্রতিপালন করিনি? আমি কি তোমাদের লালন পালন করে এতো বড় করিনি? আমার এসব ইহসানের এটাই কি প্রতিদান? আমার সমস্ত অধিকারই কি তোমরা ভুলে গিয়েছো? আবেগপূর্ণ এসব কথা তাদের হৃদয়-মনের ওপর কোনো প্রভাবই ফেলতে পারলো না। এসব তাকওয়া পন্থীদের নিকট থেকে বড় যে সান্ত্বনা বাক্য পাওয়া গেল, তা হলো, তুমি মৃত্যুর পরেই কেবল আমাদের দেখতে পাবে। শেষ পর্যন্ত দুঃখী মাকে ব্যর্থ হয়ে এ সান্ত্বনা বাক্য নিয়েই ফিরে যেতে হলো।

পরিবার-পরিজন ছেড়ে চলে যাওয়ার সাতাশ বছর পর সেন্ট শ্যামুয়েলের মা যখন জংগলে তার অবস্থান স্থলের ঠিকানা জানতে পারলেন তখন সাক্ষাতের জন্য তিনি জংগলে হাজির হলেন। কিন্তু তার সমস্ত বক্তব্য, খোশামোদ, তোষামোদ এবং আহাজারি ব্যর্থ হলো। সেন্ট শ্যামুয়েল কোনো মতেই তার মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে রাজী হলেন না। অবশেষে যখন দেখলেন, মায়ের অস্থিরতা সীমাহীন হয়ে গেছে তখন তিনি তাকে বলে পাঠালেন, আমি সাক্ষাতের জন্য শীঘ্রই বাহিরে আসবো। প্রতিশ্রুতির পরও তিন দিন এবং তিন রাত অতিবাহিত হলো। চরম হতাশায় হুজরার দরজার সামনেই মা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন।[১]

খৃস্টধর্মের এ দু' তিনটি ঘটনা দ্বারা অন্যান্য বৈরাগ্যবাদী ধর্মের মূল্যায়ণ করা যায়।

এসব ধর্মের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, তা যৌন আবেগের অমিতাচারিতার কোনো সমাধান পেশ করে না। বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শিক্ষা দেয়। অথচ মানুষের জন্মগত ও স্বভাবগত আবেগ-অনুভূতি অবদমিত ও নির্মূল করা যায় না। তাকে অবদমিত করা হলেও বিকৃতরূপে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ইতিহাস সাক্ষী, যৌন চাহিদার সামনে যারা

১. এসব ঘটনা ইউরোপের নৈতিক চরিত্রের ইতিহাস নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণের চেষ্টা করেছে তারাই অস্বাভাবিক ও বে-আইনী পন্থায় সে চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

লেকী তার বিখ্যাত গ্রন্থ ইউরোপের নৈতিক চরিত্রের ইতিহাসে লিখেছেনঃ

"পোপ জন বিসেট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। এমনকি নিজের মা বোনের সাথে পর্যন্ত ব্যভিচার করেছেন। ১১৭১ খৃস্টাব্দে ক্যানটারবারীর বিশপ শুধু একটি ক্ষেত্রেই সতেরটি অবৈধ সন্তানের পিতা বলে প্রমাণিত হয়েছেন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে স্পেনের একজন বিশপের ৭০জন দাসী ছিল। ১২৭৪ খৃস্টাব্দে সিশেরের একজন পাদ্রী তৃতীয় হেনরীর ষাটটি অবৈধ সন্তান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এসব ঘটনাকে ব্যতিক্রম মনে করে কিছু সময়ের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও দেখবেন সে যুগের পাদ্রীদের ব্যাপক দুষ্কর্ম ও যৌনতার প্রমাণের জন্য ভুরি ভুরি নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি আছে। চির কুমারদের খানকাহ ও উপাসনালয় তখন আর খানকাহ বা উপাসনালয় ছিল না। বরং ব্যভিচারের আখড়া ও অবৈধ সন্তানদের কবরস্থানে রূপান্তরিত হয়েছিল। ব্যভিচার ও যৌন তাড়নার বশে 'মুহরেম' ও 'গায়ের মুহরেম' এর ভেদাভেদ উঠে গিয়েছিল। তাই বার বার এ ধরনের আইন জারী করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল যে, পাদ্রীরা যেন তাদের মা ও ভগ্নি থেকে দূরে থাকেন। খৃস্টবাদ যদিও সমকামিতা ও ইন্দ্রিয়সেবা তথা ব্যভিচারের মূলোৎপাটন করেছিল, তথাপি খানকা ও পাদ্রীদের আশ্রমের চার দেয়ালের অভ্যন্তরে যথারীতি তার পৃষ্ঠপোষকতা চলছিলো। খোদ ওয়াজ-নসীহতকারীগণই এ পাপে সর্বাধিক নিমজ্জিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে পোপের একজন দূত ধর্মের বাণী শুনানোর জন্য ইংল্যাণ্ডে আগমন করলেন। গির্জাসমূহের নৈতিক পতন সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য পেশ করলেন। কিন্তু এ বক্তব্য পেশের পর কয়েক ঘন্টা যেতে না যেতেই সবাই দেখতে পেল, তিনি তাঁর নির্জন কক্ষে এক নর্তকীর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মজা লুটছেন। কি ছিল এসব ? দাম্পত্য জীবনকে নিষিদ্ধ করার পরিণাম নয় কি ? বিয়ের পবিত্র ও স্বাভাবিক দাবী ও পন্থাকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হতো। এটিই সমস্ত অন্যায় ও দুষ্কর্মের মূল। পানির স্রোতের স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দিলে তা অবশ্যই জলাশয়ের মধ্যে পঙ্কিলতা ও দুর্গন্ধ সৃষ্টি করবে।"

অস্বাভাবিক ও প্রকৃত বিরুদ্ধ পন্থায় চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও তার মেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি এ চেষ্টা-সাধনাকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, মানুষের গঠনাকৃতি ও স্বভাব-প্রকৃতিই এমন যে, তার মধ্যে যৌন আবেগ ও চাহিদা প্রচণ্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে

www.bjilibrary.com

থাকে। এ চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করার মাধ্যমেই সে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। এটাকে বাদ দিয়ে তার আবেগ-অনুভূতি এবং চিন্তা ও মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। বরং অনেক সময় মানুষের ওপর তার এতো অধিক প্রতিক্রিয়া হয় যে, তার সমস্ত চিন্তাধারা ও দৈহিক শৃঙ্খলা পর্যন্ত বিকল হয়ে যায়।

১৯৫৭ সনের মার্চ মাসে বৃটেনের একদল মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ এগার হাজার মানসিক রোগীর কেস হিস্ট্রি পর্যালোচনা করার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, "যদি মনের শান্তি ও নানাবিধ মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পেতে চাও তাহলে বিয়ে করো।"

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর সতেরটি প্রতিনিধি দেশ অর্থাৎ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ভারত, প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ ও আদম শুমারীর রেকর্ডপত্র যাঁচাই বাছাই করে কোন্ প্রকারের লোক মধ্যম রকম বয়স লাভ করে থাকে তা জানতে সক্ষম হয়েছে। এ অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে, অবিবাহিত এবং বিপত্নীকদের তুলনায় বিবাহিত পুরুষদের বয়স অনেক বেশী হয়ে থাকে। এসব দেশের গড় বয়স নির্ণয় করলে বিবাহিত পুরুষদের গড় পড়তা বয়স প্রায় সাতান্ন বছর দাঁড়ায়। অন্যদিকে অবিবাহিত পুরুষরা গড়ে মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বেঁচে থাকে। আর সর্বাধিক গড় বয়স লাভ করে থাকে এসব দেশের নারীরা।

যৌন সম্পর্ক বর্জন করার ক্ষতি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তার পেছনে কার্যকর স্পিরিট তার সামাজিক সম্পর্ককেও ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কারণ, মানুষের অপকর্ম সম্পর্ককে অপবিত্র ও কলুষিত করে ফেলেছে শুধু এ কারণে যখন কোনো সম্পর্ক অবৈধ ও ঘৃণিত হয়ে যায় তখন দুনিয়ার এমন কোনো ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পর্ক আছে যা সবরকম অপবিত্রতা থেকে মুক্ত আছে। মা ও সন্তানের সম্পর্ককে প্রকৃতিগত মনে করা হয়। কিন্তু তার মধ্যেও নানাবিধ জটিলতা ও ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়ে আসছে। এসব জটিলতা ও ত্রুটির কারণে কি সন্তানকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে ?

যৌন আবেগকে অবদমিত করার একটি পরিণাম হলো সভ্যতার পতন। কারণ, সভ্যতার উন্নয়নে এ আবেগের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মানুষ শুধু সাদামাটা পন্থায় তার আবেগকে পরিতৃপ্ত করতে চায় না ; বরং তার মধ্যে বৈচিত্র ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে চায়। বিপনীকেন্দ্রসমূহের জৌলুস, বিনোদন কেন্দ্রসমূহের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী, বিশাল বিশাল অট্টালিকা এবং সভ্যতার

www.bjilibrary.com

অন্যান্য উপাদানের পেছনে মানুষের একটি আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। তাহলো সে চায় তার চারদিকে যেন এমন একটি পরিবেশ বিদ্যমান থাকে যাতে তার যৌনতৃপ্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এ আবেগকে ধ্বংস করার অর্থ, আমরা সভ্যতার উন্নয়নের কার্যকর একটি উপাদানকে ধ্বংস করছি।

কৌমার্য অবলম্বনের সর্বাধিক ক্ষতিকর দিক হলো, তা মানবতার শত্রু। আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষ জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এজন্য সৃষ্টি করেছেন যেন তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য এভাবে তৃতীয় আরেকটি মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে। পারস্পরিক এ আকর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, বর্তমানে যেসব মানুষ এ পথিবীতে আছে বাঁচার অধিকার কেবল তাদেরই নেই। তাদের পরে এ পৃথিবীতে মানব জাতির পাট চুকিয়েও দেয়া হবে না। তাই এ যৌন আকর্ষণ মানব জাতির টিকে থাকার উপায় হওয়া উচিত। কিন্তু কৌমার্য অবলম্বণকারী একজন মানুষ আল্লাহর এ ঘোষণার জওয়াব দেয় এই বলে যে, এ পৃথিবীর বুকে তার নিজের অস্তিত্বই একটি বোঝা স্বরূপ। তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিলে তার নিজের আত্মাই অপবিত্র ও গোনাহের কালিমায় কলুষিত হবে। পৃথিবীরূপ এ বাগান বিরাণ হলে হতে দাও। তবু আমার দেহে যেন কাঁটার আঁচড় না লাগে।

অবাধ যৌনাচার

প্রাচীনকাল থেকেই বৈরাগ্যবাদের পাশাপাশি এর সম্পূর্ণ বিপরীত আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি চলে আসছে। সেটা হলো, অবাধ যৌনাচারের দৃষ্টিভঙ্গি। এর তাৎপর্য হলো, যৌন আকাঙ্ক্ষা যেহেতু একটি প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষা। অন্যান্য প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষার মতো তারও পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে সঠিক ও বেঠিক এবং বৈধ ও অবৈধতার বাধ্যবাধকতা আরোপ নিরর্থক। কারণ, মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা মানুষের ওপর যুলুম করার শামিল। তাই সে যেভাবে চাবে সেভাবে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার অধিকার তার থাকা দরকার।

বৈরাগ্যবাদ যৌনতা ও তার ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে একটি পলায়নী কর্মপন্থা হলে লাগামহীন যৌনাচার মানুষের সংকল্প ও সাহসের পরাজয় এবং তার অন্যায় ও পাপের মনোবৃত্তির মোকাবিলায় ন্যায় ও সুকৃতির মনোবৃত্তির হতাশা ও পরাজয়ের ঘোষণা। এ মতবাদ স্বীকার করে নেয়ার পর সব রকমের ভোগ বিলাসিতা ও ফূর্তিবাজির দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ কারণে বিভিন্ন যুগে এর চরম বিস্তার ঘটেছে। সব জায়গায় ব্যভিচার ও ফূর্তিবাজির আখড়া কায়েম হয়েছে। যৌন লালসাবৃত্তি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং

www.bjilibrary.com

অবৈধ সম্পর্ক ও তার পরিণামকে সন্তুষ্টচিত্তে বরদাশত করা হয়েছে। এমনকি এ ধ্যান ধারণা সমাজের মধ্যে একটি স্থায়ী দেহ ব্যবসায়ী শ্রেণীকে শুধু বৈধই নয় বরং অতি প্রয়োজনীয় বানিয়ে দিয়েছে। সর্বতোভাবে তাকে উৎসাহিত করেছে যাতে যৌন লালসা চরিতার্থ করার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে এবং ইচ্ছামত যে কোনো সময় যৌন কামনাকে তৃপ্ত করা যায়।

সেন্ট অগাষ্টাইন এই শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এভাবে ঃ

দেহাপসারিণীদের পেশাকে বাধা দিও না। এতে অবৈধ যৌনাচার সমাজকে ধ্বংস করে ফেলবে।

সিসেরোর মতো পণ্ডিত ও দার্শনিক তার একটি বক্তৃতায় বলেন ঃ

"আমাদের মধ্যে কেউ যদি মনে করে, যুবকদের বেশ্যাদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা উচিত, তাহলে আমি বলবো, তার এ ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত কঠোর। আজ পর্যন্ত কে-ই বা তা মেনে চলেছে ? আর বর্তমান সময়ে তো দূরের কথা প্রাচীনকালের লোকজনদের মধ্যে কেউ এরূপ ধারণা পোষণ করেছে কি ? কখনো কোনো যুগে কেউ এর বৈধতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে কি ?"

এসব মতবাদ মানুষের যৌন নৈতিকতার ওপর কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছে সে প্রশ্ন বাদ দিলেও অস্বীকার করা যায় না যে, ইতিহাসের বেশীর ভাগ যুগে যৌন উচ্ছৃংখলতা ও পদস্খলন ছিল ব্যাপক।

বাইবেলের নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, "একদিন অধ্যাপক ও ফরীশীগণ ব্যভিচারে ধৃতা একটী স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে আনিল, ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরু, এই স্ত্রীলোকটা ব্যভিচারে, সেই ক্রিয়াতেই ধরা পড়িয়াছে। ব্যবস্থায় মোশি এ প্রকার লোককে পাথর মারিবার আজ্ঞা আমাদের দিয়াছেন, ... তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে ইহাকে পাথর মারুক। ...... তখন তাহারা ইহা শুনিয়া, এবং আপন আপন সংবেদ দ্বারা দোষীকৃত হইয়া একে একে বাহিরে গেল, প্রাচীন লোক অবধি আরম্ভ করিয়া শেষ জন পর্য্যন্ত গেল; তাহাতে কেবল যীশু অবশিষ্ট থাকিলেন,"–যোহন, ৮ ঃ ৩-৯ কারণ, তাহাদের কেহ-ই এ গোনাহ থেকে মুক্ত ছিল না।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা চলতো বিভিন্ন নামে। কখনো তা সামাজিক ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজন বলে আখ্যায়িত হতো, কখনো তাকে প্রকৃতির দাবী বলা হতো আবার কখনো ধর্মীয় বেশ ভূষায় তা আবির্ভূত হতো। কিন্তু আসলে এর পেছনে অধিক তৎপর থাকতো মানুষের কু-প্রবৃত্তি।

www.bjilibrary.com

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবে বিরাজমান যে অবস্থা হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী ও আবু দাঊদের মতো সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে তা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার জন্য আরবে চারটা পন্থা প্রচলিত ছিল। প্রথম পন্থা ছিল যথারীতি বিয়ে করা। কেউ কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে তার অভিভাবকের কাছে প্রস্তাব পাঠাতো। প্রস্তাব গৃহীত হলে মোহরানা আদায় করে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতো। দ্বিতীয় পন্থা ছিল, কোনো অভিজাত ও বিখ্যাত ব্যক্তির বীর্য লাভের জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে উক্ত ব্যক্তির সাথে রাত্রি যাপনের নির্দেশ দিতো এবং গর্ভধারণ ও তা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সে নিজে স্ত্রীর সংশ্রব থেকে দূরে থাকতো। তৃতীয় পন্থা ছিল দশ জনের কম সংখ্যক পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতো। এর ফলে যেসব সন্তান জন্ম লাভ করতো স্ত্রীলোকটি তাদেরকে যে পুরুষটির সাথে সম্পর্কিত করতো তাদেরকে তারই সন্তান বলে মনে করা হতো। চতুর্থ পন্থা ছিল, আরবে আইনগতভাবে স্বীকৃত পেশাদার বারবণিতা ছিল। তারা তাদের ঘরের দরজায় ঝাণ্ডা পুঁতে রাখতো। যে কোনো মানুষের তাদের সাহচর্যে যাওয়ার অনুমতি ছিল। এসব নারীদের ঘরে জন্মলাভকারী সন্তানরা কার সন্তান তা নির্ণিত হতো হস্তরেখাবিদদের সাহায্যে। তাদের সাহায্যে স্ত্রীলোকটির কাছে যাতায়াতকারী কারো সাথে তাদের সম্পর্কিত করে দেয়া হতো। আর সেই ব্যক্তিকে তা মেনে নিতে হতো।

আমাদের এ ভারতবর্ষেও যৌন সম্পর্কের এক দুটি নয় বরং আটটি উপায় ও পন্থা চালু ছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এর সবগুলোকেই বৈধ বলে মনে করা হতো।

কোনো কোনো সময় বন্ধা স্ত্রীলোকেরা সন্তান লাভের আশায় সপ্তাহের পর সপ্তাহব্যাপী পূজারী ও পুরোহীতদের সাথে রাত্রিযাপন করতো। সমাজের দৃষ্টিতে এটা আদৌ কোনো দূষণীয় ব্যাপার ছিল না।

সাইয়েদ শরীফুদ্দীন সামহুদী তাঁর "ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুসতাফা" নামক গ্রন্থে মদীনার এক ইহুদী বাদশার কথা উল্লেখ করেছেন। সে একটি আইন চালু করে রেখেছিল যে, নববিবাহিতা যে কোনো মেয়েকে স্বামীর বাড়ীতে যাত্রার পূর্বে তার সাথে অবশ্যই এক রাত কাটাতে হবে।

প্রাচীনকালে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা কোথায় কি কি রূপ ও পন্থায় চলতো তা একটি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। এখানে শুধু এতটুকু তুলে

www.bjilibrary.com

ধরা উদ্দেশ্য যে, যৌন বিপথগামিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা কোনো বিশেষ স্থান বা কালের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। বরং তা সব যুগে সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়েছে।

আধুনিক যুগ

কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বাস্তব সত্য যে, অবাধ যৌনাচারের ধারণা বর্তমান যুগের আগে আর কখনো এতো ব্যাপকতা লাভ করেনি। কারণ, বর্তমান সময় পর্যন্ত শত সহস্র অনৈতিকতা সত্ত্বেও নৈতিক চরিত্র, ভদ্রতা ও আভিজাত্য এবং পবিত্রতা ও আল্লাহভীরুতাকেই মানবতার সোপান মনে করা হয়ে থাকে। বর্তমান যুগের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তা যুক্তি-প্রমাণকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাবী করেছে যে, আরো দু-দশটি জীবের মত মানুষও একটা জীব যার নিজের কিছু আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা আছে। এ কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য জীবনের সামান্য কিছু সময় মাত্র তার পুঁজি যা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর সে অস্তিত্বহীনতার পর্দার আড়ালে চলে যাবে। সে যদি ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ কামনা করে এবং জীবনের মজা লুটতে চায় তাহলে জীবনের এ ফুরসতেই তা করতে হবে। তাই নিজের কামনা-বাসনা ও আবেগ-অনুভূতির নিদ্রাপুরী নির্মাণ না করে তাকে বরং আরো অধিকতর শানিত করতে হবে যাতে সে নিজের চারপাশে বিস্তৃত চারণ ক্ষেত্র থেকে অধিক পরিমাণে ভোগের সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং তাকে যেন এমন অবস্থায় পৃথিবী ছেড়ে যেতে না হয় যে, তার কামনা-বাসনা ও আশা-আকজ্ক্ষা অতৃপ্তির মাতম করতে থাকবে। সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টি ব্যভিচারকে এমন ঘৃণিত ও অশ্লীল রূপে চিহ্নিত করেছে যে, তার সাথে সাথে পাপাচার, গোনাহ এবং অত্যন্ত নোংরা কাজের লোকদের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অন্যথায় ব্যভিচারকে পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর বড় জোর শুধু এতটুকু কথাই বলা যায় যে, মানুষ তার একটি প্রাকৃতিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য তার চারপাশে খাড়া করা কৃত্রিম সীমারেখা ও বিধিবন্ধন মেনে চলেনি। এসব সীমারেখার বিরোধিতা করা এমন কোনো অপরাধ নয়, যে কারণে কাউকে দুষ্কর্মশীল বলা যেতে পারে। কোনো চতুষ্পদ জন্তু তার কামনা-বাসনা কিভাবে পূরণ করলো সে সম্পর্কে যেমন কোনো প্রশ্ন ওঠেনা, তেমনি মানুষের ব্যাপারেও এ প্রশ্ন নিরর্থক যে, সে তার আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনার আগুন নির্বাপিত করার পথে কোন্ কোন্ সীমারেখা মেনে চললো আর কোন্ কোন্ সীমারেখা মেনে চললো না। এখানে দেখার বিষয় হলো, তার এ কাজ দ্বারা অন্য কোনো মানুষের ক্ষতি হচ্ছে কিনা। তার কোনো কাজ যদি ব্যক্তি বা সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অবশ্যই তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অন্যথায় তাকে বৈধ না বলার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

www.bjilibrary.com

এ দর্শন পশুত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বলে প্রমাণ করেছে। নফসের দাসত্ব ও প্রবৃত্তির গোলামীর সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ সরবরাহ করেছে যাতে মানুষের ভেতরের বিবেক নামক সেই কাঁটা উৎপাটিত হয় যা পাপে লিপ্ত হলে দংশন করতে থাকে ও অনুশোচনার সৃষ্টি করে। যাতে প্রবৃত্তির পূজার জন্য তার হৃদয় মন এমন উদার ও উন্মুক্ত হয়ে যায় যেন সে কোনো নেকীর কাজ সম্পাদন করেছে। সুতরাং এখন সে দ্বিধাহীন চিত্তে তামাদ্দুন ও সভ্যতার এমন রূপরেখা নির্মাণে ব্যস্ত যার পরতে পরতে ফূর্তিবাজি ও যৌন আকাঙ্ক্ষার ছাপ স্পষ্ট। উদ্দেশ্য, সে যখনই দৃষ্টি মেলবে তখনই যেন ফূর্তিবাজির দৃশাবলী দেখতে পায়। তার কান পরিচিত হলে যেন আনন্দ ও ব্যঞ্জনাময় গানের সাথে পরিচিত হয় আর বিবেক ও চিন্তাশক্তি ব্যয়িত হলে তা যেন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পথে ব্যয়িত হয়। নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল সাহিত্য, নৈতিকতা বিধ্বংসী শিক্ষা, উলংগ ছবি, নোংরা সিনেমা, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার মোটকথা, যৌনতার আগুনকে উদ্দীপ্তকারী এমন কোনো উপায় কি আছে যা বর্তমান যুগের মানুষ অবলম্বন করেনি ?

লাহোরের 'সাপ্তাহিক এশিয়া' পত্রিকার লণ্ডনস্থ বিশেষ সংবাদদাতার কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

> "খুব সকালে ঘুম থেকে জাগতেই সে (ছাত্রটি) জানালার পাশের বেসিনে মুখ ধুতে গিয়ে দেখতে পায় নীচের পথ দিয়ে দলে দলে মেয়েরা যাচ্ছে। যখন সে নাশতা করে কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে তখন ঘর পরিষ্কার করার জন্য কাজের মেয়ে এসে হাজির হয়। কোনো বাড়ীর কাজের মেয়ে বা পরিচারিকা হয় বৃদ্ধা আবার কোনো বাড়ীর কাজের মেয়ে একেবারে যুবতী ও চরিত্রহীনা। অফিসে যাওয়ার সময়, টিকেটের জন্য লাইন হচ্ছে সেও এক লাইনে দাঁড়িয়েছে। লাইনে তার সামনে অথবা পেছনে অবশ্যই কোনো মেয়ে আছে। এখানে দৃষ্টি আনত করাতো দূরে থাক শরীরকে শরীরের স্পর্শ থেকে রক্ষা করাও কৃতিত্ব। লিফটে প্রবেশ করলে দেখা যাবে লিফটও এমনভাবে গাদাগাদি হয়ে ভরে যাচ্ছে যেমন ভিড়ের সময় আমাদের এখানকার বাসগুলো ভরে যায়। এখানে শরীরকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভবই নয়। বরং প্রশ্ন কেবল দৃষ্টির। কারণ, এ অবস্থায় কেউ যদি সামনে তাকায় তাহলে তার অর্থ হবে সামনে মহিলার চেহারা দেখতে থাকা। তাই সে লিফটের ছাদের দিকে তাকায়। এতে সাঁটা আছে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনসমূহ। প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনে নারীর দেহ সৌষ্টবকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাও বিপজ্জনক মাত্রায়। এসব বিজ্ঞাপনের মধ্যে

www.bjilibrary.com

কয়েকটি অবশ্যই বড় আকারের এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এগুলো মেয়েদের আণ্ডার ওয়ার প্রস্তুতকারী বিপণীসমূহের বিজ্ঞাপণ। কোনোটাতে নারীকে শুধু জাঙ্গিয়া পরিহিত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। আবার কোনটাতে দেখানো হয়েছে পরিধানরত অবস্থায়। উলংগপনা এমনিতেই ফিতনা। কিন্তু এসব বিজ্ঞাপনে তাকে মহাফিতনা বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই বেচারা বিজ্ঞাপন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সামনের মহিলাকেই দেখতে থাকে। এখানে গাড়ীতেও লিফটের অনুরূপ অবস্থা। আসন খালি নেই। সেও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। সে নিজেই হয়তো কোনো মেয়ের ওপর শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। (কলেজে) সে একটি আসনে গিয়ে বসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে হল পূর্ণ হয়ে গেল। তার দুই পাশে না হলেও এক পাশে অন্তত কোনো মেয়ে এসে বসে পড়েছে। কখনো কাঁধে কাঁধ লাগছে। কখনো পায়ের সাথে পা লাগছে। কখনো বাহুতে বাহুতে স্পর্শ হচ্ছে এবং কাঁধে কাঁধে ঘর্ষণ লাগছে।" (২৮শে মার্চ, ১৯৫৭ ইং)

কিছুদিন আগে একজন মহিলাকে শুধু এ অভিযোগে ইটালির আদালতে পেশ করা হয়েছিল যে, সে শুধু কাঁচুলি ও জাঙ্গিয়া পরেই রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আদালত এই বলে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয় যে, একজন সুন্দরী নারীর উন্মুক্ত দেহ কোনো ক্ষতির কারণ নয়।

নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদক জাপান সফরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি তার সফর অভিজ্ঞতা লিখে সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেছেন। "পৃথিবীর উলঙ্গ শহর টোকিও" শিরোনামে তিনি লিখেছেন ঃ

"আমার একজন জাপানী সাংবাদিকের বাড়ী যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে যে অবস্থার সম্মুখীন আমি হয়েছিলাম তাতে বেশ বিচলিত বোধ করেছি। আমি কলিংবেল টিপে দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতর থেকে কারো আগমনের প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু, একি দেখছি! ভেজা চুলে এক মহিলা একেবারে সদ্যজাত শিশুর মত উলঙ্গ হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সাংবাদিক বাড়ীতে নেই। আর মহিলা তার স্ত্রী। তিনি ছিলেন গোসলখানায়। একথাটা বলার জন্যই তিনি গোসলখানা থেকে দ্বিধাহীন চিত্তে উলঙ্গ অবস্থায়ই বেরিয়ে এসেছিলেন।"

সেই রিপোর্টে তিনি আরো লিখছেন ঃ

"রাতের বেলা এক ভোজ সভায় যাওয়ার সুযোগ হলো। জাপানী মেজবানরা মেহমানকে সাধারণত উন্নত মানের হোটেলেই দাওয়াত

www.bjilibrary.com

করে। কিন্তু ব্যতিক্রমীভাবে সেই মেজবান আমাকে তার বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানালেন। খাওয়ার পর্ব শেষ হলে নাচ গান শুরু হলো। এর ব্যবস্থা মেজবান আগে ভাগেই করে রেখেছিলেন। মেহমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি নেশায় বুঁদ হয়ে পড়লেন। তিনি মেহমানদের মধ্যে থেকে উঠে একটি মেয়ের সাথে নাচতে শুরু করলেন। তারপর এ ব্যক্তি এক এক করে সেই মেয়েটির সব কাপড় খুলে তাকে উলঙ্গ করে ফেললো। তার এ আচরণে হাসির চোটে মেজবান ও মেহমানদের অবস্থা ছিল কাহিল।"

এখন উলঙ্গপনা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা উপাসনালয়সমূহেও প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার[১] একটি পল্লী সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে, "সেখানকার একটি গির্জায় ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য এক অভিনব পন্থা কাজে লাগানো হচ্ছে। তা হলো, উপাসনা শুরু হওয়ার আগে সমস্ত পুরুষ উপাসনালয়ে উপস্থিত মহিলাদের সাথে কোলাকুলি ও আলিঙ্গণাবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে সোহাগ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ফল দাঁড়ালো এই যে, যে উপাসনালয়ে পুরুষের উপস্থিতি সংখ্যা তিন চারের অধিক কোনো দিনই হতো না তা এখন এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, চার্চের ব্যবস্থাপকদের উপাসনালয় সংলগ্ন আরো কয়েকটি নতুন কক্ষ তৈরী করতে হয়েছে।"

এখন বর্তমান নৈতিকতা বিধ্বংসী সিনেমার কথা একটি পূর্ণ কমিশনের জবানীতে শুনুন। আমেরিকার সরকার নিজ দেশে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য এ কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এ কমিশন তাঁর রিপোর্টে বলেছেন ঃ যৌন অপরাধ, ধর্ষণ, অপহরণ, শত্রুতামূলক হত্যা, নোংরা রোগ-ব্যাধি এবং মারদাঙ্গার বড় কারণ হলিউডে নির্মিত ফিল্ম। কমিশন আরো বলেছেন যে, এসব ফিল্মের ওপর যদি কড়াকড়ি আরোপ না করা হয় তাহলে এমন এক সময় আসবে যখন গোটা আমেরিকা গুণ্ডা, খুনী, ব্যভিচারী এবং ডাকাত ও লুটেরাদের বস্তিতে রূপান্তরিত হবে। কমিশন বলেছেন ঃ এসব ফিল্মের মাধ্যমে ডাকাতরা আমাদের যুবকদের কাছে হিরো বলে গণ্য হচ্ছে। যুব শ্রেণী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ডাকুদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে শুরু করেছে। অপহরণ ও ধর্ষণকে এখন পৌরুষের প্রতীক বলে মনে করা হয়। মেয়েরা পিতামাতাকে না জানিয়েই স্কুল কলেজ থেকে পালিয়ে যায়। কমিশন এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখিত যে, আমেরিকার আচার-আচারণ যা এক সময় সারা দুনিয়ার জন্য অনুসরণযোগ্য ছিল তা আজ অবনতি ও বিকৃতির চরম সীমায় পৌছে গিয়েছে। অশ্লীলতা এখন এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আইনের সাহায্যেও তার সংশোধন অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

---

১. বর্তমানে জিম্বাবাওয়ে (অনুবাদক)।

www.bjilibrary.com

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসের ঘটনা, ফ্লোরিডার (আমেরিকা) সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, আমেরিকার আইন অশ্লীলতার অনুমতি দেয় না। এ রায়ের সমালোচনা করে আমেরিকার একজন পর্ণো সাহিত্যিক (ফ্লাভিলি) লিখেছিলেন, অশ্লীলতাপন্থী আমেরিকায় আইন অশ্লীলতা চর্চা বন্ধ করতে পারবে না। তিনি আরো লিখেছিলেন—আমেরিকানরা অশ্লীলতাপূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছে ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সুতরাং অশ্লীলতার ওপর নিষেধাজ্ঞা তামাশায় পরিণত হয়েছে। আমেরিকানরা এখন সর্বাধিক সমস্যার জটাজালে আবদ্ধ। যৌনতাকে তারা সর্বাধিক ভয় পায় আবার তা উপভোগও করে। লেখক ফ্লাভিলি বলেছিলেন ঃ সোজাসুজি বলতে গেলে, আমরা একটি অশ্লীল ও নির্লজ্জ জাতি। শাস্তি বিধান করে আমরা অশ্লীলতা রোধ করতে পারবো বলে মনে করা এমন একটি ব্যাপার যা পড়ে আল্লাহভীরু পাদ্রিরও যৌন আবেগ উত্তেজিত হয়ে ওঠে (চরম বোকামী)।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহার এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ফ্রান্সে মদ্যপান সম্পর্কে তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে শতকরা ২৩ জন ফরাসী পুরুষ এবং ৪৩ জন ফরাসী নারী পানি ব্যবহার করে থাকে। পক্ষান্তরে শতকরা ৮২ জন পুরুষ এবং ৬০ জন্য নারী শুধু মদ ব্যবহার করে থাকে। যারা শুধু মদ ব্যবহার করে তাদের ছাড়া কিছুসংখ্যক নারী পুরুষ এমনও আছে যারা মদ ও পানি মিশিয়ে পান করে। এদের মধ্যে শতকরা ৯ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ। কমিটি তার রিপোর্টে বলেছেন ঃ বিগত দশ বছরে অতি মাত্রায় মদ্যপানের কারণে মৃতের সংখ্যা বার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মদ্য উৎপাদনের অবস্থা হলো, আমেরিকায় স্কচ হুইস্কি প্রস্তুতকারী কারখানাসমূহে মার্চের শেষ পর্যন্ত ২৪ কোটি ৩০ লক্ষ গ্যালন হুইস্কি মজুদ হয়ে গিয়েছিল এবং এর বিক্রির পরিমাণ পূর্বের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করেছিল। বর্তমান মজুদ আগামী দশ বছরের ঘাটতি পূরণের জন্য যথেষ্ট। গোটা স্কচ হুইস্কি শিল্প ৫৯ সনে সমাপ্ত বছরে ২ কোটি ৫৭ লাখ ৮০ হাজার গ্যালন হুইস্কি বিক্রি করেছে। এটা এক বছর পূর্বের বিক্রির পরিমাণ থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার গ্যালন বেশী। এর মধ্য থেকে ৯ লাখ ৫০ হাজার গ্যালন অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকায় এত অধিক পরিমাণ হুইস্কির মজুদ এটাই প্রথম।

পশ্চিম জার্মানিতে একটি পাঠশালার মালিক সম্পর্কে খবর হলো, তিনি প্রতি বছর তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রঙ্গিন পানীয় বিয়ারের একটি ঝর্ণা

www.bjilibrary.com

প্রবাহিত করেন। ১৮ বছরের অধিক বয়সী যে কোনো নারী বা পুরুষের জন্য উক্ত ঝর্ণা থেকে বিনামূল্যে মদ পান করার অবাধ অনুমতি থাকে। গত বছরের ন্যায় এবারও তিনি মদের ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলেন এবং তা এক নাগাড়ে সাত ঘন্টা পর্যন্ত চালু রাখা হয়েছিল। এ ঝর্ণা থেকে প্রায় ২৫,০০০ হাজার লোক (নারী এবং পুরুষ) বিনামূল্যে মদ পান করেছিল। জানা গেছে, এ বিশেষ উপলক্ষে ডাক ও তার বিভাগ এ ঝর্ণার ছবি মুদ্রিত স্মারক ডাক টিকিটও চালু করেছিল। অথচ এ মদ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মদ্যপান প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ডঃ রবার্ট পিরাস মন্তব্য করেছেন যে, সংঘটিত যৌন অপরাধ শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ মদ্যপানের ফলে হয়ে থাকে। এ মদের পেছনে শুধু বৃটেনেই বছরে সাড়ে ১৩শ কোটি টাকা খরচ হয়। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সেখানকার বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কাজেও ব্যয়িত হয় না। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে, ফূর্তিবাজি ও পশ্যাচার লালনের অসংখ্য উপায় উপকরণের জন্য কি পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। কোনো জাতি যদি এ পরিমাণ অর্থ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কাজে লাগায় তাহলে দেশকে শান্তি সুখের নীড় হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

এ উত্তেজনাকর ও যৌন আবেদনময় পরিবেশে কারো পক্ষে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং যা ঘটছে তা হলো, এ সভ্যতার আগারে লালিত মানুষ পশুর মতো সেসব সীমা ও বাধা বন্ধন ছিন্ন করছে যা তাদের যৌন সম্ভোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কয়েক বছর আগে ডিসপ্রে প্যারিস সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, প্যারিসে যেসব বিয়ে হয় তার মধ্যে শতকরা ৯০টি বিয়ে এমন যে, বিয়ের আগেই নারী পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের মেডিকেল বোর্ড আরো অগ্রসর হয়ে সমগ্র ফ্রান্স সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন যে, সে দেশে একজনও সতীসাধ্বী নারী নেই। আর এজন্য ফ্রান্সের মানুষ গর্বিত।

ফ্রান্সে কোনো সতীসাধ্বী নারী নেই, ফ্রান্সের গর্বের বিষয় শুধু এটাই না। বরং তার গর্বিত শির উন্নত রাখার জন্য একটি স্থায়ী শ্রেণী আছে যার কাজই হলো, ফ্রান্সের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা।

সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক একজন বিচারক মার্শাল সিকোট যিনি দশ বছর পর্যন্ত পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সহসভাপতি ছিলেন তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'সতীত্বের বিকিকিনি' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"প্যারিসে সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সতীত্ব বিক্রেতা আট হাজার নারী তাদের হোটেল অথবা বাড়ীঘড় থেকে বেরিয়ে এসে কারবার শুরু করে দেয়। এ

www.bjilibrary.com

আট হাজার নারীর প্রতি রাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার খরিদ্দার জোটে। প্রত্যেক পর্যটক তাদেরকে বোটন ডি বোলনের পার্কে মাউন্ট পেসরাসের আবছা আলো এবং মাউনটেনমারেনটার প্যারিসের ওয়েস্ট এণ্ডের উন্নত মানের হোটেলগুলোতে দেখতে পায়।

এবার কিছুটা বৃটেনের অবস্থা দেখুন ঃ

পুলিশ কমিশনার স্যার জন নাইট বদার ১৯৫৬ সনের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, এ বছর ধর্ষণের যতো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বছরই তা ঘটেনি। ১৯৩৮ সনে এ ধরনের যতো ঘটনা ঘটেছে গত বছর তার তিনগুণের চেয়েও ৩৮টি ঘটনা বেশী সংঘটিত হয়েছে।

১৯৫৭ সনের ৪ সেপ্টেম্বর ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, পাদ্রী এবং তিনজন মহিলার সমন্বয়ে পনর সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার জন ডল ফিল্ডন। তিন বছর পর এ কমিটি বৃটেনের নৈতিকতার বিশালাকার রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ কমিটির মতে, বেশ্যাবৃত্তি একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। তাদের দৃষ্টিতে বেশ্যারা সামাজিক একটি প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণ করছে মাত্র। তাদের মতে সম্পদের লালসাও বেশ্যাবৃত্তির একটি উৎসাহোদ্দীপক কারণ। যাই হোক, এ পেশায় কুমারী মেয়ে ও মহিলারা সর্বাবস্থায় নিজের ইচ্ছায় প্রবেশ করে থাকে।

পুরুষদের পারস্পরিক সম্পর্কের আধিক্য দেখে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, পুরুষদের মধ্যে সমকামিতার সম্পর্ক যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয় তাহলে এখন থেকে তা আর কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য না হওয়া উচিত। কারণ, নাগরিকদের ব্যক্তি জীবনে আইনের হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

১৯৫৯ সনে বৃটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে, বৃটেনে প্রতি তিন জন মহিলার মধ্যে একজন এমন যার নিজের স্বীকৃতি অনুসারে বিয়ের পূর্বেই পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বৃটেনে প্রতি বিশ জন শিশুর মধ্যে একজন অবৈধ। এরূপ বহু তথ্য সংযোজিত করার পর রিপোর্টের একজন প্রস্তুতকারী ডক্টর চেসার প্রশ্ন তুলেছেন, এ যুগে সতীত্ব কি অতীতের স্মৃতি এবং সেকেলে হয়ে গিয়েছে? অতপর তিনি নিজেই এর জবাব দিচ্ছেন ঃ এ ব্যাপারে আমার অবশ্য সন্দেহ আছে। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমরা সেদিকেই এগিয়ে চলেছি। এমনিতে প্রকৃতি সতীত্বের ধার ধারে না। জন্মধারা টিকে

www.bjilibrary.com

থাকুক এটাই তার মূল লক্ষ। প্রকৃত এবং নিখাদ সতীত্ব তো আমাদের মনোজগত থেকে আসে। এর অর্থ আমরা যে কোনো পথ গ্রহণ করতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা স্বাধীন।

দুনিয়ার অসংখ্য তৃপ্তিদায়ক বস্তুর মধ্যে যৌন তৃপ্তি অধিক আনন্দদায়ক, মাদকতাপূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। কেবল পবিত্রতা ও সতীত্বের ধারণাই মানুষকে এ তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ থেকে বিরত রাখতে পারে। এ ধারণা সেকেলে বলে আখ্যায়িত হওয়ার পর যৌন আবেদন ও আকর্ষণ মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং কর্ম-তৎপরতার ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, তাকে তৃপ্ত করা ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তাই মানুষের মধ্যে আসতে পারে না। তখন তার সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতা এ পরিতৃপ্তির পেছনে ব্যয়িত হতে থাকে। তাই এ প্রবৃত্তি পূজারী সভ্যতার ঝাণ্ডাবাহীরাও স্বীকার করতে চলেছে যে, এখন তাদের মনোযোগ জীবনের প্রকৃত সমস্যাসমূহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ভোগবাদিতা তাদের মেজাজ ও প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে গেছে। যেসব ব্যাপারে সময় ও মনোযোগ দাবী করে সেসব ব্যাপারে তাদের কোনো মনোযোগ ও আকর্ষণ নেই। কষ্ট সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম, ধৈর্য ও দৃঢ়তার মতো যেসব উন্নত গুণাবলীর সাহায্যে তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিল তা এখন এক এক করে তাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে।

ডক্টর এ্যালেক্সিস ক্যারল ALEXISE KARREL তাঁর MAN THE UNKNOWN গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"যান্ত্রীক আবিস্কার বৃদ্ধি করে অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং রসয়ায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন আবিস্ক্রিয়াকেও ততোটা বেশী গুরুত্ব দেয়া যায় না। এখন মানুষকে মনোযোগ দেয়া উচিত স্বয়ং নিজের প্রতি এবং নিজের বুদ্ধি-বৃত্তিক ও নৈতিক অযোগ্যতার প্রতি। এ সভ্যতাকে নিজেদের কল্যাণে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের দুর্বলতাই যখন বাধা হয়ে দাড়াঁচ্ছে তখন তার মধ্যে ভোগের আনন্দ, বিলাসিতার উপকরণ, সৌন্দর্যবোধ, ব্যাপকতা এবং জটিলতা বৃদ্ধি করে কি লাভ? যে জীবনব্যবস্থা নৈতিক অধঃপতন এবং মহান উত্তর পুরুষদের সৎ ও যোগ্যতম উপাদানসমূহের বিনাসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার নির্মাণে সূক্ষ্ম-শিল্পকর্ম ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে কোনো কল্যাণকর কথা নয়। অতি দ্রুতগামী সামুদ্রিক জাহাজ, অধিক আরামদায়ক গাড়ী, সস্তা রেডিও এবং দূরতম ছায়াপথের পর্যবেক্ষণের জন্য শক্তিশালী দূরবীণ তৈরী করতে থাকার চেয়ে অনেক উত্তম হবে যদি আমরা নিজেদেব প্রতি মনোনিবেশ করি।

www.bjilibrary.com

আধুনিক সমাজ নৈতিকতা বোধকে পরিপূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। আমরা এর বহিঃপ্রকাশকে আকস্মিকভাবে চারদিক থেকে অবদমিত করেছি। দায়িত্ববোধহীনতা প্রত্যেকের শিরায় উপশিরায় বাসা বেঁধেছে। যারা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, যারা কষ্ট ও পরিশ্রম করে, যারা সাবধানী ও দূরদর্শী তারা আজ অসহায়ত্বের শিকার। তাদের এখন তুচ্ছ বলে গণ্য করা হয়। যে মহিলার কয়েকটি সন্তান আছে। সে যদি নিজের ভবিষ্যত গড়ার পরিবর্তে সন্তানদের প্রতি মনোনিবেশ করে তাহলে সে নীচু মানসিকতাসম্পন্ন বলে গণ্য হয়। সমকামিতা ও ব্যভিচার নৈতিকতার কোনো তোয়াক্কাই করা হচ্ছে না। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষকরা পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে বসেছে। ভুল ও শুদ্ধ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পেশাদার অপরাধীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের জিজ্ঞেস করারও কেউ নেই।

এ নৈতিক অধঃপতন পর্যালোচনা করতে গিয়ে মানব প্রকৃতি বিশেষজ্ঞ এক মহিলা মিসেস হাডসন বলেন ঃ

"আমাদের সভ্যতার দেয়ালগুলো ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে, এর ভিত্তি দূর্বল হয়ে পড়েছে এবং এর কড়িকাঠ বেঁকে যাচ্ছে। জানিনা, এ গোটা ইমারত কবে মাটিতে মিশে যাবে ? বিগত কয়েক বছর থেকেই আমরা দেখে আসছি মানুষ নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলতে আগ্রহী নয়। তার টিকে থাকার একটি মাত্র পথই অবশিষ্ট আছে। তাহলো, নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। কারণ, এ সভ্যতার ধারকদের সবটুকু মনোযোগ ও আকর্ষণ অবাধ যৌন সম্পর্ক, বেশ্যাবৃত্তি এবং সতীত্ব ও সম্ভ্রমের বিকিকিনি তথা যৌন আকাঙ্ক্ষার ওপর কেন্দ্রীভূত। তাই তাদের নির্মাণ যোগ্যতা নষ্ট হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আরো অনেকরকম বে-রকমের অমিতাচার পরিদৃষ্ট হয়। যেমন পুরুষ ও নারীর তার আপন আপন শ্রেণীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। মানবীয় যোগ্যতার এ অপব্যয় ও অপচয় অত্যন্ত উদ্বেগজনক বৈকি।

যৌন সম্পর্কে এ প্রকৃতি এবং তার এসব প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল দেখে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এগুলো আমাদের সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার প্রমাণ, না কারণ ? এ ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ত হলো, এসব প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল একই সাথে ধ্বংসের প্রমাণ ও কারণ উভয়টিই।

প্রফেসর পিটারেম সরোকিম ১৯৫৭ সনের জানুয়ারীতে মুদ্রিত তার "আমেরিকায় যৌন বিপ্লব" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"আমেরিকাবাসী যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে দৌড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে যা তাদের পতনের পূর্বাভাস। প্রাচীন গ্রীস এবং রোম এভাবেই ধ্বংস হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

প্রফেসরের নিজের ভাষায় যৌনতার প্রচণ্ড সয়লাব আমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। আমাদের সভ্যতার প্রতিটি অঙ্গনে এবং সমাজ জীবনের ঘরে ঘরে তা প্রবেশ করেছে। তিনি একথাও লিখেছেন যে, আমেরিকার রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত যৌনতার উত্তাল তরঙ্গে উথাল-পাথাল হচ্ছে। যৌন উৎকোচ ও যৌন ব্লাক মেইলিং আর্থিক উৎকোচের মতোই ব্যাপকতা লাভ করেছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে যৌন কেলেংকারীতে জড়িত ব্যক্তিরা এবং তাদের বরকন্দাজ ও সাঙ্গপাঙ্গরা কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছে এবং চরিত্রহীন লোকেরা কোথাও পৌর কর্মচারী, কোথাও মন্ত্রী আবার কোথাও রাজনৈতিক দলের নেতা। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক উচ্ছৃংখল ও দুশ্চরিত্র লোক বিদ্যমান রয়েছে। এরা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয় প্রকার ফূর্তিবাজ ও চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত। প্রতিনিয়ত তালাকের সংখ্যা ও যৌন অপরাধ বৃদ্ধি, রেডিও টেলিভিশন, সাহিত্য ও বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ক্ষেত্রে যৌনতার তাণ্ডব আমেরিকানদের জন্য ধ্বংসের বার্তাবাহক। আমাদের বর্তমান পরিবেশ পুরো বা অর্ধ উলঙ্গপনায় ভরা। এমনকি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনসমূহের যৌনতার সংমিশ্রন আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সভ্যতা ও তামাদ্দুনে যৌনতা এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, আমেরিকানদের জীবনে ধ্বংসের কালোছায়া নিকটবর্তী হচ্ছে বলে মনে হয়।

এখন একজন কামপূজারী মানুষের স্বাভাবিক ও মনস্তাত্বিক পর্যালোচনা করুন এবং দেখুন, সে কিভাবে নিজের মধ্যে ধ্বংসাত্মক জীবাণু লালন করতে থাকে ঃ

এক ঃ কামুকতার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় মানুষের দৈহিক শক্তির ওপর। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কিছু শক্তি দিয়েছেন। এ শক্তি অসীম নয়, বরং সসীম। এসব শক্তির অযথা ব্যবহারে তার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য।

মানুষের শক্তির একটা বড় উৎস হলো যৌন বা কামশক্তি। এতো বড় উৎস যে তা থেকে বহু সংখ্যক নতুন সত্তা অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। যদি কেউ তার এ শক্তির অপচয় করে তাহলে সে নিজের মধ্যে থেকে এতো বড় একটা শক্তিকে বাইরে নিক্ষেপ করে যা তার মতো কয়েকটি জীবনের উৎস হতে পারে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে ভ্রান্ত উপায়ে যৌনতৃপ্তি লাভ মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতাকে কীভাবে ধ্বংস করে। সুতরাং এর ফলে সর্বপ্রকার দৈহিক বিক্রিয়া দেখা দেয়া নিশ্চিত বলে মনে করা হয়।

দুই ঃ এর দ্বিতীয় কুফল হলো, মানব বংশধারার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা। মানুষের জীবনের যে মূল লক্ষ থাকে তার মনোযোগ ও আগ্রহ সে দিকেই থাকে। সে জন্য সে তার সময় ও যোগ্যতা ব্যয় করে। সে যদি দুশ্চরিত্র ও

ফূর্তিবাজ হয় তাহলে তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ। এজন্যই সে তার সমস্ত কর্মতৎপরতা ও চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করবে। তার কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা, তার চিন্তা ও কর্ম, তার সাহচার্য, তার চালচলন, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, তার সামাজিকতা, এক কথায় তার সবকিছু সেই উদ্দেশ্যের চারপাশে আবর্তিত হবে এবং আরামপ্রিয়তা তার মন-মগজের ওপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করবে যে, শিশু-সন্তানের লালন-পালনের জন্য আরাম-আয়েশ ত্যাগ করা তার জন্য সম্ভব নয়। এজন্য দীর্ঘ একটা সময় ধরে সবরকমের বিড়ম্বনা ও কষ্ট সহ্য করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে হস্তক্ষেপ করে এরূপ যে কোনো সত্তা থেকে মুক্তি পাওয়া হবে তার বিরামহীন সাধনা।

এ্যালেক্সিস ক্যারল লিখেছেন ঃ "অধিক উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি হ্রাস পাচ্ছে এবং যতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নীচুমানের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। নারীরা স্বেচ্ছায় এলকোহল ও তামাক সেবনের মাধ্যমে নিজেদের ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলছে। তারা নিজেদের শরীরকে ছিমছাম ও সৌন্দর্য মণ্ডিত করার জন্য বিপজ্জনকভাবে খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণ করছে। এর সাথে সাথে তারা সন্তান জন্মদানেরও বিরোধী। এসবই হচ্ছে তাদের শিক্ষা নারী উন্নয়ন আন্দোলনের এবং আত্মস্বার্থ মূলক সংকীর্ণ দৃষ্টির কুফল।

তিন ঃ এ স্বার্থপরতা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে যে, যে মাকে স্নেহ ভালবাসার মূর্তিমান প্রতীক মনে করা হতো সে মা জন্ম শাসনের নামে নিজের সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করছে। গর্ভপাত এখন আর কোনো অন্যায় বা দূষণীয় কাজ বলেই বিবেচিত হয় না। জাতীয় এ সেবার জন্য ডাক্তাররা সদা তৎপর। এরপরও যদি কোনো হতভাগ্য সন্তান রক্ষা পেয়ে যায় তাহলে নিজের কোল খালি করে তাদের রাস্তায় বা হাসপাতালে ফেলে আসতে ভোগবাদী ও ফূর্তিবাজ মা লজ্জাবোধ করে না। আর বর্তমান ভোগবাদী সভ্যতা এ নিষ্ঠুরতাকে অপরাধ না বলে বরং সমাজের স্বাভাবিক সমস্যা বলে গণ্য করছে এবং নানা পন্থায় তার সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার রিপোর্ট অনুসারে প্রতি বছর দু' লাখেরও অধিক অবৈধ শিশু জন্ম লাভ করে। অবৈধ শিশু জন্মের এ গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো কোনো গোষ্ঠী এবং অধিকাংশ শাসক গোষ্ঠী প্রস্তাব করছে যে, সর্বজন স্বীকৃত পন্থায় যেসব মহিলা বিপদগামী হচ্ছে তাদের সবাইকে পুরোপুরি বন্ধা করে দেয়া হোক। কোনো কোনো মহলে এ প্রস্তাবও বিবেচনাধীন রয়েছে যে, একের অধিক অবৈধ সন্তান জন্মদাত্রী মায়ের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হোক।

www.bjilibrary.com

ইউ, এন, সিতে দশটি শিশুর কুমারী মাকে নয়টি শিশুর প্রতিপালনের জন্য সরকারী তহবিল থেকে সাহায্য দেয়া হয়। অপর দিকে সমাজ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন যে, কুমারী মা হিসেবে যেসব যুবতী নারী সন্তান জন্ম দেয় তাদের গ্লানি, পাপ এবং ভয়ভীতি দূর এবং অস্থিরতার প্রতিকার করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। শিশু সংক্রান্ত ব্যুরোর প্রধান মিসেস ক্যাথারাইন বি মির্টিগারের মতানুসারে কুমারী মায়েরা যে জটিল সমস্যার সম্মুখীন, শাস্তিবিধান তার কোনো সমাধান নয়।

বলা হয় যে, মানব বংশধারার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করার প্রশ্ন ততোক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারে যতোক্ষণ পর্যন্ত তার তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাদীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হবে। এ ক্ষেত্রে যদি সরকার সফল হয় তাহলে মানবতার প্রতি এর চেয়ে আর কোনো বড় কল্যাণ সাধনের ধারণা করা যেতে পারে না। কারণ, সরকারের হাতে পর্যাপ্ত উপায় উপকরণ থাকে। শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষার যে ব্যবস্থা সরকার করতে পারে কোনো সচ্ছল পিতামাতার পক্ষে তার ক্ষুদ্র একটা অংশও করা সম্ভব নয়। সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য এক টুকরা রুটির মুখাপেক্ষী সন্তান যতো মেধাবী, বুদ্ধিমান ও যোগ্যতা সম্পন্নই হোক না কেন তার শিক্ষাদীক্ষার জন্য সে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে? কিন্তু রাষ্ট্র বা সরকার তাকে অভাব ও দারিদ্রের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং তার যোগ্যতার লালন, পরিপুষ্টি ও স্ফুরণ ঘটাতে পারে।

কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, এটা মানবতার জন্য কল্যাণ কামনা বা তার প্রতি কল্যাণ সাধন নয়। বরং তার সাথে চরম যুলুম ও বাড়াবাড়ী যা শুধু কল্পনাই করা যেতে পারে। মানুষ নিষ্প্রাণ কোনো পাথর নয় যে, ভাস্কর তার ভাস্কর্য জ্ঞানের জোরে তা দ্বারা কোনো সুন্দর ভাস্কর্য মূর্তি নির্মাণ করবে। বরং মানুষ হলো আবেগ, অনুভূতি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও উপলব্ধির ধারক এক সত্তা। কোনো মানবীয় প্রাণ সত্তার লালন এবং তার চরিত্র নির্মাণ কেবল সে ব্যক্তিই করতে পারে যে তার আবেগের সাথে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যাবে এবং তার আনন্দ ও দুঃখের সাথে নিজের আনন্দ ও দুঃখকে একাকার করে দেবে। এ ধরনের আবেগ ও অনুভূতি কেবল সে ব্যক্তিদের মধ্যেই থাকতে পারে যারা তার সত্তা নির্মাণে হাজারো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে এবং সন্তান যার দেহ ও প্রাণের একটি অংশ। কিন্তু যে ব্যক্তিকে এসব স্তর অতিক্রম করতে হয়নি এবং রক্ত-মাংসের একটি পিণ্ডকে তার দায়িত্বে সোপর্দ করা হয়েছে, এ অনুভূতি ছাড়া যার আর কোনো অনুভূতি নেই, এ আবেগ ও অনুভূতি সে কোথা থেকে লাভ করবে? ধাত্রী শিশুকে দুধ পান করাতে পারে ঠিকই কিন্তু সন্তানের জন্য মায়ের বক্ষে পবিত্র আবেগ ও অনুভূতির যে ভাণ্ডার আছে শিশুর কণ্ঠনালীর নীচে

www.bjilibrary.com

অনুরূপ আবেগ ও অনুভূতি প্রবিষ্ট করে দেয়া তার সাধ্যের বাইরে। রাষ্ট্র বা সরকার নিঃসন্দেহে তার অভিভাবকত্ব করতে পারে। কিন্তু সে কোথায় পাবে সে স্নেহমাখা দুটি হাত, মহান স্রষ্টা যা বাপ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়নি। মা তার সন্তানকে শুধু বক্ষ নিংড়ানো দুধই পান করায় না, বরং সেই সাথে তার সে আবেগ-অনুভূতিও মিশিয়ে দেয় যার কারণে একটি দুর্বল ও অসহায় প্রাণ বেঁচে থাকে ও বেড়ে ওঠে। তার সুমধুর ঘুম পাড়ানি গান সন্তানকে যে শুধু ঘুম পাড়িয়ে দেয় তা নয়, বরং তা শত্রুতা, ঘৃণা এবং হিংসা ও বিদ্বেষের জন্য মৃত্যুর পয়গামও বটে। বাপের ক্রোধান্বিত দৃষ্টি সন্তানকে আনুগত্য ও অনুসরণের যে শিক্ষা দেয় আইনের শত সহস্র বন্ধনও তা করতে সক্ষম নয়।

চার ঃ সরকার পিতা-মাতার বিকল্প হতে পারে কিনা সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে সেই পিতা-মাতার মানসিকতা পর্যালোচনা করুন যারা নিজেদের দায়-দায়িত্ব সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে মুক্ত হতে চায়, যারা নিজেদের আরাম-আয়েশ ও ভোগবাদিতাকে এ জন্য টিকিয়ে রেখেছে যে, তাদেরকে এর ঝামেলা পোহাতে হবে না। তাদের থেকে কি এ আশা করা যায় যে, তারা অন্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নিজেদের সময়, শক্তি ও যোগ্যতা কুরবানী করবে ? যে ব্যক্তি সমাজ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাকে মওকা মনে করে এবং সামাজিক শাসনের ফাঁক গলিয়ে আত্মস্বার্থ উদ্ধারের জন্য রাত-দিন ওঁত পেতে থাকে সে কি সমাজকে মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে পারে ?

পাঁচ ঃ বিলাসপ্রিয় মন-মগজ মানুষকে এ অনুমতিও দেয় না যে, যাকে সে নিজের ভোগের উপকরণ বানায়। যার আবেগ-অনুভূতি দ্বারা সে তৃপ্তি লাভ করে তার সুবিধা অসুবিধা এবং দুঃখ-কষ্টে সে শরীক হোক। যাকে সে নিজের নাপাক প্রবৃত্তি ও কামনার শিকার বানায় তার থেকেই সে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে। যতোক্ষণ ফুলে মধু থাকে সে ভ্রমরের মতো ততোক্ষণ তা চুষতে থাকে কিন্তু ফুলের মধু শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সে অন্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

এ মানসিকতার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নেই। এ সম্পর্ককে সবসময়ই এমন একটি সম্পর্ক বলে মনে করা হয়েছে যেখানে দুটি মানুষ পরস্পরের সাথে স্নেহ ভালবাসার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তারা একে অপরের সমব্যাথী এবং সুখ-দুঃখের সাথী হবে। তাদের জীবন হবে বিশ্বস্ততা ও সমবেদনার জীবন। কিন্তু এখন এ ধারণা ফিকে হয়ে আসছে আর যৌন সম্পর্ক সাময়িক তৃপ্তির উপায় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যৌন তৃপ্তি যখন একমাত্র উদ্দেশ্য বলে নিরূপিত হয়েছে তখন কোনো মানুষ শুধু একজনকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে কেন এবং সবরকমের অসন্তুষ্টি ও

www.bjilibrary.com

তিক্ততা সত্ত্বেও তাকেই যথেষ্ট মনে করবে কেন ? অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, আমেরিকায় অতি মাত্রায় ধূমপানকারীর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়া হয়। যে স্বামী অতি মাত্রায় মদ্য পান করে তার বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্ত্রী (তালাক) আদালতের শরণাপন্ন হয়। আবার যে স্বামী প্রতিদিন দেরীতে বাড়ী আসে তার থেকেও স্ত্রী তালাক নিয়ে নেয়। একজন বৃটিশ মহিলা এ মর্মে স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছে যে, তার স্বামী তার মুখের দিকে সিগারেটের ধূঁয়া নিক্ষেপ করে। সে বলে, আমি তাকে কয়েকবার নিষেধ করেছি কিন্তু আমার প্রতিবাদে সে মোটেই কান দেয়নি। তাই আমাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। বর্তমানে লসএঞ্জেলসে তালাক সম্পর্কিত একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। মধ্যদেহী ছিমছাম গড়নের এক সুন্দরী যুবতী আদালতে তার বক্তব্য পেশ করেছে যে, আমার স্বামী জামা এবং জুতা পরিধান করে না। তাই তার সাথে আমার ঘর সংসার চলতে পারে না। আমেরিকার আদালত স্ত্রীর উপস্থাপিত এ যুক্তি প্রমাণকে বেশ মূল্যবান বলে গ্রহণ করেছে এবং নির্দেশ দেয় স্ত্রীকে তালাক দিতে। লণ্ডনের একটি আদালতে এর চেয়েও অভিনব ও চিত্তাকর্ষক এক মামলা দায়ের করা হয়। স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই বলে আবেদন জানায় যে, সে আমার জন্য অপেক্ষা না করেই রাতে খাবার খেয়ে নেয়। স্ত্রীর এ বদ অভ্যাসের বিরুদ্ধে আমি কয়েকবার তার কাছে অভিযোগ করেছি। এমন কি দু-একবার আমি তাকে শাসিয়েছি যে, সে যদি রাতের খাবার আমার সাথে না খায় তাহলে আমি তাকে তালাক দেব। কিন্তু আমার এ হুমকির কোনো প্রভাবই তার ওপর পড়েনি। অতএব, আমাকে তার থেকে আলাদা হওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। স্ত্রীর এ মারাত্মক অপরাধের কারণে আদালত স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য স্বামীকে অনুমতি দিয়ে দেয়।

একজন পাকিস্তানী সংবাদপত্র সম্পাদক ১৯৫৭ সনে আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> "একজন আইনজীবি যিনি বর্তমানে এখানে আইন ব্যবসা করেন তিনি তার একই স্ত্রীকে একের পর এক সাত বার তালাক দিয়ে পুনরায় তাকে বিয়ে করেছেন। মজার ব্যাপার হলো, তার এ স্ত্রীও আইন ব্যবসায় করেন। বর্তমানে তিনি তাকে আবার তালাক দিয়েছেন।"

ছয় ঃ অবস্থা এখন শুধু তালাক ও বিচ্ছিন্নতা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নেই। বরং রুচি-বৈচিত্র নৈতিকতা ও মানবতার সমস্ত মূল্যমানকে শিকেয় তুলে রেখেছে এবং মানুষকে পশুর স্তর থেকেও নীচে নামিয়ে দিয়েছে।

২৪ বছর বয়স্কা মিসেস ফ্রান্সিন প্যারী মার্টিন তার স্বামীকে এ অপরাধে হত্যা করে যে, সে তার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এজন্য তাকে যাবজ্জীবন

www.bjilibrary.com

কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। হত্যার পর লাশ নীচের কুঠরীতে কয়লার স্তুপের মধ্যে লুকানোর পর সে বাড়ীতে কয়েকজন যুবককে ডেকে আনে এবং তাদের সামনে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য প্রদর্শন করে। এ দম্পতি পাঁচ বছর দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছিল এবং তাদের তিনটি সন্তানও জন্মেছিল। জজ যখন বিবাদীকে জিজ্ঞেস করলো, এ তিনটি সন্তান তার নিহত স্বামীর ঔরষজাত কিনা তখন সে দ্বিধান্বিতভাবে জবাব দিয়েছিল, আমার ধারণা তাই। মিসেস মার্টিনের বিরুদ্ধে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ব্যভিচারে উৎসাহিত করার অভিযোগও আনা হয়েছিল। মামলা চলাকালীন সে স্বীকার করে যে, তার স্বামী যে সময় ঘুমাচ্ছিলো সে সময় সে একখানা ভারী কুঠার দিয়ে তার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে। সেসময় তার ছোট ছেলেটিও তার স্বামীর পাশে বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিলো। সে লাশ টেনে হিচড়ে নীচের কুঠরীতে নিয়ে যায় এবং কয়লার গাদার মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। পরে সে অস্থায়ী সন্ধি দিবসের উৎসবে নৃত্য দেখতে যায় এবং সেখান থেকে চৌদ্দ বছরের একটি বালকসহ কয়েকজন যুবককে বাড়ীতে নিয়ে আসে তাদের সামনে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য দেখায়।

এক দুশ্চরিত্রা অপরাধী নারীর যখন স্বামীর প্রতি আকর্ষণ শেষ হয়ে গেছে তখন তার দৃষ্টিতে স্বামীর পাঁচ বছরের বন্ধুত্বের মূল্য ও মর্যাদা থাকেনি। সে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর মুহূর্তেই এমনভাবে আনন্দে নেচে উঠলো যেন সে কোনো কাঁটা তুলে ফেলে দিল।

প্যারি মার্টিন তবুও তার বিরক্তি প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছে। কিন্তু আমেরিকান বিমান বাহিনীর সদস্য রোনাল্ড ডীন বান্ধবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের পর এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অনুমতিও তার ভাগ্যে জোটেনি।

ষোড়শী ফিলিপিনার সাথে রোনাল্ড ডীনের সাক্ষাত হয় লোয়াজেনের এক নৃত্যশালায়। দীর্ঘ ২১ মাস পর্যন্ত তারা দুজন ভালবাসার উত্তাল সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে এবং পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর ডীন তার স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে আসে। এখানে আসার পর তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। দু-বছর পর ডীনকে ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত আমেরিকার একটি ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ফিলিপিনা এবং ডীনের মধ্যে প্রায় এক বছর ধরে পত্র আদান প্রদান হতে থাকে। কিন্তু এরপর ডীন পত্র দেয়া বন্ধ করে দেয়। এর চার মাস পরে সে আমেরিকায় ফিরে আসলে ফিলিপিনার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু ডীন তাকে জানায় যে, সে তাকে তালাক দিতে এসেছে। ইংল্যাণ্ডে এক ইংরেজ মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং সে এখন গর্ভবতী। এ কথা শুনে ফিলিপিনার চোখের সামনে আসমান ও যমীন একাকার হয়ে যায়। সে ডীনকে অনেক অনুনয় বিনয় করে। কিন্তু ডীনের বক্ষে তো একটি

www.bjilibrary.com

মাত্র হৃদয়। আর সেখানে একজন মাত্র প্রিয়তমারই স্থান হতে পারে। সুতরাং সে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ছয়দিন পর্যন্ত এ কুরুক্ষেত্র চলার পর প্রতিবেশীরা রাইফেলের গুলির শব্দ শুনতে পায়। এরপর তারা গিয়ে দেখে ডীন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে নিষ্প্রাণ পড়ে আছে।

সাত ঃ একইভাবে একজন প্রেয়সীর বিভিন্ন প্রেমিকের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক। যেখানে একজন নারী দশ জন পুরুষের আরাধ্য এবং একজন পুরুষ দশজন নারীর কামনার ধন সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য। এক্ষেত্রে প্রিয়তমের হৃদয়-মন জয় করার জন্য প্রত্যেকেই অপরকে ডিঙিয়ে যেতে চেষ্টা করবে।

শক্তির অপচয়, মানব বংশধারার প্রতি অবহেলা ও বে-পরোয়া মনোবৃত্তি, ধৈর্য-স্থৈর্যের ঘাটতি, আবেগ প্রবণতার প্রাধান্য তথা আধিপত্য, ত্যাগ ও কুরবানীর পরিবর্তে স্বার্থান্ধতা ও শোষণের মনোবৃত্তি, ঐক্য ও স্নেহ ভালবাসার অবলুপ্তি এবং বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্যের বিস্তার, এসব হলো যৌন প্রবৃত্তি পূজার সাধারণ কুফল। আজ আমরা এসবই দেখতে পাচ্ছি। এ ফলাফল কি ব্যক্তি ও জাতির ধ্বংসের পূর্বাভাস নয়? যদি তাই হয়, তাহলে সে জাতির ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত যাদের মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণরূপে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং যৌনতা বাদ দিয়ে যাদের সভ্যতার কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু বর্তমানে সে জাতিই দর্শন ও শিল্পে, জ্ঞান ও সভ্যতায় এবং রাজনীতি ও তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে যারা যৌনতা ও কাম-প্রবৃত্তির পূজারীও বটে। যৌনতা ও প্রবৃত্তি পূজার কুফল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সময় আমাদের সামনে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন দেখা দেয়।

এ প্রশ্নের জবাব হলো, যেসব জাতি বর্তমানে নেতৃত্ব ও কর্তৃক চালাচ্ছে তারা এ মর্যাদা লাভ করেছিল তখন যখন তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির উৎসাহ-উদ্দীপনা যৌন কামনার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ফূর্তিবাজির চেয়ে সময়ানুবর্তিতা ছিল তাদের কাছে অগ্রগণ্য এবং প্রবৃত্তির ওপর তাদের এতটা নিয়ন্ত্রণ ছিল যে, তারা নিজেদের শক্তিকে গড়ার কাজে ব্যয় করছিলো। এর অর্থ এ নয় যে, তারা সবরকমের নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিল। বরং এর অর্থ হলো, সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়ার মতো গুণ ও বৈশিষ্ট্য অন্য সব জাতির তুলনায় তাদের মধ্যে অনেক বেশী ছিল এবং এখনো পর্যন্ত বেশী আছে। তাই তারা এ সভ্যতার জন্য সময়, শক্তি, যোগ্যতা এবং প্রাণ ও সম্পদের এতো বড় বড় কুরবানী পেশ করেছে যে, তাদের অধীন জাতিসমূহের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন। যদি কোনো পরিশ্রমী এবং কষ্ট সহিষ্ণু মানুষ কোনো

www.bjilibrary.com

অট্টালিকা নির্মাণ করে তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্ময়ের ব্যাপার হবে তখনই যখন কোনো অলস ও কুড়ে মানুষের দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হবে।

তবে বর্তমান সভ্যতা অতি দ্রুত গতিতে তার অবস্থান হারিয়ে ফেলছে। তার অভ্যন্তরে ধ্বংসের জীবাণু প্রবেশ করেছে যা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

❒

www.bjilibrary.com

ইসলাম ও যৌন সম্পর্ক

যৌন সমস্যার সমাধানে বড় বড় চিন্তাবিদগণ আজ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি। তারা যখন নৈতিক চরিত্র ও উন্নত জীবনাচারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন তখন যৌন আবেগকে এক নম্বর পাপ মনে করে বসেছেন। আবার যখন যৌন আবেগের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তখন নৈতিক চরিত্র ও উন্নত জীবনাচারের জগত ধ্বংস করে দিয়েছেন।

একমাত্র ইসলামই এমন একটি জীবন দর্শন পেশ করতে সক্ষম হয়েছে যা একদিকে যৌন সমস্যারও পুরোপুরি সমাধান পেশ করে আবার অন্য দিকে নৈতিক মূল্যমানকেও আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেয় না। আবেগ এবং প্রবৃত্তির গোলামী থেকে রক্ষা করে আবার তার পরিতৃপ্তির বৈধ ও স্বাভাবিক পথও নির্দেশ করে।

ইসলামের যৌন সমস্যা সম্পর্কিত শিক্ষাকে আমরা পাঁচটা শিরোনামে বিভক্ত করতে পারি।

(১) আল্লাহভীরুতার বৈরাগ্যবাদী দৃষ্টিকোণ প্রত্যাখ্যান।

(২) বৈধ সীমার মধ্যে যৌন তৃপ্তি লাভের তাগিদ দেয়া।

(৩) ব্যভিচার নিষিদ্ধ করণ

(৪) ব্যক্তির প্রশিক্ষণ

এবং

(৫) সমাজ সংস্কার।

আল্লাহভীরুতার বৈরাগ্যবাদী দৃষ্টিকোণ

সেন্ট পল তাঁর এক পত্রে লিখছেন ঃ

"অতএব আমি চাই যে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। অবিবাহিত পুরুষ সর্বদা প্রভুর চিন্তায় থাকে যে, সে কিভাবে প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি সর্বদা দুনিয়ার চিন্তায় থাকে অর্থাৎ কিভাবে নিজের স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। বিবাহিতা ও অবিবাহিতা নারীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। অবিবাহিতা নারী সর্বদা প্রভুর চিন্তায় থাকে যাতে তার শরীর ও আত্মা দুটিই পবিত্র থাকে। কিন্তু বিবাহিতা নারী দুনিয়ার চিন্তায় থাকে অর্থাৎ সে কিভাবে নিজের স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে। এসব আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য বলছি, হাসির উদ্রেক করার জন্য বলছি না। এজন্য

www.bjilibrary.com

যে, যা শোভনীয় তাই কার্যকরী হয় এবং তোমরা প্রভুর সেবায় নিসংশয় লেগে থাকো। (করিন্থীয়দের নামে প্রেরিত পলের পত্র।)

কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলাম দাম্পত্য জীবনের সমস্যা থেকে মুক্ত ও নিশ্চিন্ত থাকতে বলে না। কারণ, দাম্পত্য বন্ধন যদি অনিবার্যরূপে আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়ার মতো বিষয় হতো তাহলে মানুষ নিজের একটি প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য এ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে বাধ্য হতো না এবং মানব বংশধারা টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে শুধু এ সম্পর্ককেই অবলম্বন বানানো হতো না। বরং এমন কিছু বৈধ উপায় বলে দেয়া হতো যার মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জিত হতো। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণকারীরা এ উপায়কেই কাজে লাগাতো। কারণ, মানুষের প্রকৃতি যে কাজটির জন্য ছটফট করছে তা করতে তাকে নিষেধ করা হবে অথচ তার বিকল্প কিছু বলে দেয়া হবে না এটা তার কর্মকৌশলের পরিপন্থী।

অন্তত আল্লাহর যেসব বান্দা দুনিয়াতে শুধু এজন্য এসেছিলেন যে, মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ ও পন্থা বলে দেবেন। তারা যদি এর কোনো বৈধ পথ ও পন্থা অপসন্দ করতেন এবং যতোদিন পৃথিবীতে ছিলেন ততোদিন যৌন সম্পর্ক এবং দাম্পত্য জীবনের ঝামেলা থেকে দূরে অবস্থান করতেন তাহলে কিছুটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু বাস্তব এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً . الرعد : ٣٨

"আমি তোমার আগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দিয়েছিলাম।"–সূরা আর রা'আদ ঃ ৩৮

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ বিয়ে করা সমস্ত নবীর সুন্নত।

কুরআন বৈরাগ্যবাদকে আল্লাহর নৈকট্যের উপায় বলে স্বীকার করে না। কুরআনের দৃষ্টিতে এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের এমন একটি পন্থা যার পেছনে আল্লাহর দেয়া কোনো সনদ নেই, বরং মানুষ নিজেই তা গড়ে নিয়েছে।

وَرَهْبَانِيَّةَ ِابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. الحديد : ٢٧

"বৈরাগ্যবাদকে তারা নিজেরা আবিষ্কার করে নিয়েছে অথচ আমি তাদের ওপর বৈরাগ্যবাদকে নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ফরয করে

www.bjilibrary.com

দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের আবিষ্কৃত দীনকেও সেভাবে অনুসরণ করেনি যেভাবে অনুসরণ করা উচিত ছিল।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لاصرورة فِى الاسلام۔

"ইসলামে কৌমার্যের কোনো অবকাশ নেই।"[১]

হযরত আয়েশা রা. বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবাত্তুন বা কৌমার্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন।[২]

হযরত সামুরা রা. বর্ণনা করেছেন ঃ

ان النبِىّ نهى عن التبتل

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৌমার্য অবলম্বন ও দুনিয়াত্যাগী হতে নিষেধ করেছেন।"[৩]

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ইবনে মাজা এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হযরত সা'দ বলেন, নবী সা. 'উসমান ইবনে মায'উনকে 'তাবাত্তুল বা কৌমার্য অবলম্বন করতে বাধা দিয়েছেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন তাহলে আমরাও (অর্থাৎ হযরত সা'দের সমমনা) নিজেদের খাসী বানিয়ে ফেলতাম।[৪]

ইমাম নববী র. এ হাদীসের নীচে লিখেছেন ঃ

فانّ الاختصاء فى الادمى حرام صغيرا كان او كبيرا ...

"ছোট বা বড় যেই হোক না কেন মানুষের খাসী হওয়া হারাম।"

হযরত আনাস রা. বলেন ঃ

كان رسول الله يأمرنا بالباءة وينهانا عن التَّبتُّل نهيا شديدا.

"রাসূলুল্লাহ সা. সবসময় আমাদেরকে বিয়ে করার কথা বলতেন এবং বিয়ে না করে থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।"[৫]

---

১. মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১২ ; আবু দাউদ. কিতাবুল মানাসিক, অনুচ্ছেদ ঃ লা সারুরাতা ফিল ইসলাম ; মুসতাদরিকে হাকেম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৯।

২. নাসায়ী, কিতাবুন নিকাহ-বাবুন নাহী আনিত-তাবাত্তুল।

৩. তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফিননাহী আনিত তাবাত্তুল, নাসায়ী, কিতাবুন নিকাহ, ইবনে মাজা, আবওয়াবুন নিকাহ।

৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদঃ ইসতিহবাবুন নিকাহ লিমান তাকাত ইলাইহি নাফসুহ।

৫. সুনানে দারেমী, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল হাসসি আলাত তাযবীজ।

www.bjilibrary.com

সা'দ ইবনে হিশামের খেয়াল চাপলো, তিনি কুমার বা অবিবাহিত জীবন যাপন করবেন। তাই তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে পরামর্শ চাইলেন। হযরত আয়েশা রা. বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহর এ বাণী শোননি যে, আমি তোমার আগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম এ থেকে অবহিত হওয়া গেল যে, বৈরাগ্যবাদ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পথ নয়। অতএব কৌমার্য গ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করো।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. সাঈদ ইবনে যুবায়ের র.-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি বিয়ে করেছো ? সাঈদ জবাব দিলেন, না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন ঃ বিয়ে করে নাও। কৌমার্য আল্লাহভীতির আলামত নয়। কারণ, এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ স.। তাঁর সর্বাধিক সংখ্যক স্ত্রী ছিল।

বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের কোনো একজনকে তাঁর ইবাদাত বন্দেগী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাদের কাছে নবী সা.-এর ইবাদাত বন্দেগীর অবস্থা বর্ণনা করলে তারা তাঁর ইবাদাতকে খুবই অল্প মনে করলো। তারা বললো ঃ নবী সা.-এর আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। অল্প পরিমাণ ইবাদাত-বন্দেগীও তাঁর জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমাদের আপাদমস্তক ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরা। তাই আমাদের কর্তব্য তার চেয়ে অনেক বেশী ইবাদাত করা। এ মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তাদের একজন বললো ঃ আমি এখন থেকে সারা রাত ধরে নামায পড়বো, আর ঘুমাবো না। দ্বিতীয়জন বললো ঃ আমি এখন থেকে একাধারে রোযা রাখবো, কখনো রোযা পরিত্যাগ করবো না। তৃতীয়জন বললো ঃ পৃথিবীর যাবতীয় ঝামেলার উৎপত্তি হয় বিয়ের কারণে। অতএব, আমি কখনো বিয়ে করবো না এবং পুরো সময় আল্লাহর ইবাদাতে ব্যয় করবো।

নবী স. তাদের এ সিদ্ধান্তের বিষয় জানতে পেরে বললেন ঃ

اما واللّه انّى اخشاكم للّه واتقاكم له لكنّى اصوم وافطر واصلى وارقدوا اتزوّج النّساء فمن رغب عن سنّتى فليس منّى -

"আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী। কিন্তু আমি কোনো সময় (নফল) রোযা রাখি আবার কোনো সময় রাখি না, (রাতে) নামায পড়ি আবার নিদ্রাও

www.bjilibrary.com

যাই। আমি বিবাহও করি (এটাই আমার নীতি বা প্রথা) যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করে সে আমার কেউ নয়।”[১]

হযরত আয়েশা রা. নবী স.-এর এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন ঃ

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس منّي.

“বিয়ে করা আমার সুন্নাত। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করে না আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।”[২]

এর অর্থ হলো, আল্লাহ্‌ভীরুতার জন্য যদি কেউ বিয়ে না করা জরুরী মনে করে তাহলে সে আল্লাহর নবী স.-এর পেশকৃত আল্লাহভীরুতার ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেই অজ্ঞ। কারণ, আল্লাহ্‌র ভয় নবীকে রাতের বেলায় যেমন সিজদাবনত রাখে তেমনি আল্লাহর ভয়ই তাঁকে দাম্পত্য বন্ধন সৃষ্টিতে বাধ্য করে। সে জন্য যে ব্যক্তি এ বন্ধনকে দৃঢ় করার চিন্তা করে এবং সেজন্য চেষ্টা-সাধনায় রত থাকে ইসলামের দৃষ্টিতে সে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির প্রমাণ দেয়। আর এ চেষ্টা ও সাধনার পুরস্কার সে আল্লাহর কাছে পাবে।

عن ابى مسعود الا نصارى رض عن النبيّ ﷺ اذا انفق المسلم نفقةً على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقةً.

“আবু মাসঊদ আনসারী রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন মুসলমান যে সময় আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়ার নিয়তে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে সে খরচও তার জন্য সাদকা বা নেক কাজ বলে গণ্য হয়।”[৩]

স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতির জন্য উপার্জন ও খরচ করাকে সাধারণত দুনিয়াদারীর কাজ বলে মনে করা হয়। এ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনের জন্যই তিনি এ খরচকে সাদকা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার মাধ্যমে যেমন পুরস্কার লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তেমনি পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতির লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহকারী ব্যক্তিও পুরস্কার ও সওয়াবের অধিকারী বলে গণ্য হয়।

অন্য একটি স্থানে নবী স. এ বিষয়টি আরো খোলাসা করে বলেছেন ঃ

ولست تنفق نفقة تبتغى لبها وجه اللّه الاّ اجرت لبها حتّى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك.

---

১. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আত তারগীবু ফিন নিকাহ।

২. ইবনে মাযা, আবওয়াবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফী ফাদলিন নিকাহ।

৩. বুখারী, কিতাবুন নাফাকাত ও ফাদলিন নাফাকাত আলা আহলিহি ; মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরাবীন।

www.bjilibrary.com

"আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যা কিছু খরচ করো তোমাকে অবশ্যই তার পুরস্কার দেয়া হবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবার গ্রাস তুলে দাও তার পুরস্কারও তুমি লাভ করবে।"[১]

নবী স. আরো বলেন ঃ

دينارٌ انفقته فى سبيل اللّه ودينارٌ انفقته فى رقبةٍ ودينارٌ تصدقت به على مسكينٍ ودينارٌ انفقته اهلك ... اعظمها اجرًا الّذى انفقته على اهلك.

"যে দিনারটি তুমি আল্লাহর পথে খরচ করলে, যে দিনারটি তুমি ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্য খরচ করলে, যে দিনারটি তুমি কোনো মিসকীনকে সাদকা হিসেবে দিলে এবং যে দিনারটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করলে ...... এর মধ্যে সে দিনারটির সওয়াব ও পুরস্কার অধিক যেটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করলে।"[২]

সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ আল্লাহর সাথে সম্পর্কের পথে বাধা এ চিন্তা করে সা'দ ইবনে হিশাম রা. তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিলেন এবং জমি বিক্রি করে বিক্রয় লব্ধ অর্থও জিহাদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে চাচ্ছিলেন। তাঁর গোত্রের কোনো একজন লোক একথা জেনে ফেলে। তিনি হযরত সা'দ রা.-কে বললেন ঃ তোমার অনুরূপ ধ্যান-ধারণার অধিকারী কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

أليس لكم فى اسوةٌ حسنة.

"তোমাদের জন্য আমার জীবনে কি অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ নেই ?"[৩]

দাম্পত্য জীবনের দায়-দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নবী স. কখনো অবহেলা করেননি এবং আজীবন সমস্ত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন। এটা তাঁর সুন্নাত সুতরাং যে ব্যক্তি এসব অধিকার নস্যাত করে সে তাঁর পথের অনুসারী নয়। তার জীবন সে পথ থেকে অনেক দূরে যে পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াতের চিত্র অংকিত আছে।

১. বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ওয়াছায়া, বর্ণনার ভাষা মুসলিমের।
২. মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি আলাল ইয়াল।
৩. মুসনাদে আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩।

www.bjilibrary.com

উসমান ইবনে মায'উন রা. তাঁর পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতির প্রতি মনোযোগ দেয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি রাতদিন সবসময় ইবাদাতে মশগুল থাকতে শুরু করেছিলেন। বিষয়টি জানতে পেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে পাঠালেন। উসমান ইবনে মায'উন রা. আসলে তিনি বললেন ঃ 'উসমান! আমাকে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়নি। বলো, তুমি কি আমার নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করেছো ?

উসমান ইবনে মায'উন রা. জবাব দিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! না। আমি তো আপনার আদর্শ ও নীতিরই মুখাপেক্ষী।

নবী স. বলেন ঃ আমার নীতি ও আদর্শ হলো, আমি (রাতের বেলা) নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই। কখনো রোযা রাখি আবার কখনো রোযা রাখি না (নফল রোযা), বিয়ে এবং তালাকের ওপর আমল করি। এটাই আমার নীতি এবং আদর্শ। যে ব্যক্তি আমার নীতি ও আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। উসমান! আল্লাহকে ভয় করো। (কারণ) তোমার ওপর আল্লাহর যেমন হক আছে তেমনি সন্তানদেরও হক আছে। এমন কি মেহমান এবং তোমার নিজেরও হক আছে। অতএব, এসব হক আদায়ের চেষ্টা করো।[১]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. সম্পর্কে নবী স. অনুরূপ খবর পেলে তাঁকেও তিনি বলেছিলেন ঃ ইবাদাত বন্দেগীতে এতোটা নিমগ্ন হয়ো না যে, স্ত্রী, সন্তান, মেহমান এবং স্বয়ং নিজের নফসের যে হক তোমার ওপর বর্তায় তা একেবারে ভুলে যাও।

একবার হযরত সালমান ফারসী রা. হযরত দারদা রা.-এর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর কোনো সাজগোজ বা সৌন্দর্য চর্চা নেই এবং তার পরিধানেও ছেঁড়া ফাটা কাপড়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ভালো আছেন তো ? জবাবে হযরত দারদা রা.-এর স্ত্রী বললেন ঃ আপনার ভাই আবুদ দারদা রা.-এর দুনিয়ার সাথে কি সম্পর্ক ? তিনি ইবাদাত বন্দেগী থেকে কোনো ফুরসতই পান না। আমার খোঁজ-খবর নেয়ার সময় কোথায় তার ? ইতিমধ্যে হযরত আবুদ দারদা রা. এসে হাজির হলেন। তিনি হযরত সালমান রা.-এর সামনে খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে ওজর পেশ করে বললেন ঃ আমি রোযা রেখেছি তাই আপনার সাথে খেতে পারছি না। হযরত সালমান বললেন ঃ আপনি যতোক্ষণ না খাবেন আমিও খাবো না।

১. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৮, সুনানে দারেমী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আননাহী আনিত তাবাত্তুল

www.bjilibrary.com

অবশেষে হযরত আবুদ দারদা রা. রোযা ভঙ্গ করে তার সাথে খেতে বসলেন। রাতের বেলা তিনি নামাযের প্রস্তুতি শুরু করলেন। হযরত সালমান রা. বললেন এখন তো আরাম করার সময়, আরাম করুন। কিছুক্ষণ পর আবুদ দারদা আবার নামাযের জন্য উঠে পড়লেন। হযরত সালমান রা. বললেনঃ না, এখনো নয়। রাতের শেষ ভাগে তিনি নিজেই তাকে জাগালেন এবং উভয়ে এক সাথে নামায পড়লেন। এরপর হযরত সালমান রা. হযরত আবুদ দারদা রা.-কে বললেন ঃ তোমার ওপর রবের যেমন হক আছে তেমনি তোমার স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি ও নিজেরও হক আছে। অতএব, সবগুলো হকই আদায়ের চেষ্টা করো। একটি হক আদায় করার চিন্তা অন্যান্য হকের ব্যাপারে যেন গাফেল করে না দেয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা জানতে পেরে হযরত সালমান রা.-কে সমর্থন করে বললেন ঃ সালমান সত্য কথা বলেছে।[১]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হক বা অধিকার উপেক্ষাকারী যেমন অপরাধী এবং গোনাহগার। অনুরূপ দাম্পত্য অধিকারসমূহের প্রতি অবহেলা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শনও এমন এক অপরাধ যে, এ সম্পর্কে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

❒

১. বুখারী, কিতাবুস সাওম, অনুচ্ছেদ ঃ মান আকসামা আলা আখীহ লি ইউফতিরা ফিত তাতাওউ ; কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ সুনউত তায়াম ওয়াত তাকাল্লুফ লিদদায়ফ।

www.bjilibrary.com

যৌন তৃপ্তি
(বৈধ সীমার মধ্যে)

সমস্ত বৈরাগ্যবাদী ধর্ম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তাকওয়ার পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছে। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

وفى بضع احدكم صدقة.

"স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও নেক কাজ।"[১]

আল্লামা ইবনে ইলহাম হানাফী র. কুরআন ও হাদীসের দলীল-প্রমাণের আলোকে এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন ঃ

ان الاشتغال به افضل عن التخلي عنه لمحض العبادة.

"দাম্পত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকার চেয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে মশগুল থাকা অধিক উত্তম।"[২]

যেসব বাতিল মতবাদ নারীকে সাপ ও বিচ্ছুর মতো মনে করে তা থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয়। ইসলাম সেসব মতবাদের বিরোধী। কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। সে কেবল তখনই নারীর নিকট থেকে দূরে অবস্থান করতে সক্ষম যখন সে তার এ প্রকৃতিগত আকর্ষণকে অস্বাভাবিক পন্থায় ধ্বংস করে ফেলবে। যৌন কামনার পরিতৃপ্তির জন্য হযরত লূত আ.-এর কওম সমকামিতার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। হযরত লূত আ. তাদের এ অস্বাভাবিক প্রবণতার নিন্দা করে বললেন, যৌন তৃপ্তির স্বাভাবিক ও পবিত্র উপায় হলো নারী। সুতরাং এজন্য নারীর সান্নিধ্যে যাওয়াই বুদ্ধি ও বিবেকের স্বাভাবিক দাবী।

يٰقَوْمِ هٰؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ط
اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ○ - هود : ٧٨

"হে আমার কওম! এই তো আমার মেয়েরা আছে তারা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। অতএব আল্লাহকে ভয় করো। আমার মেহমানদের সাথে

---

১. মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ ইন্না ইসমাস সাদাকাত ইয়াকিয়ু আলা কুল্লি নাওইম মিনাল মারুফ।

২. ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪০।

www.bjilibrary.com

নোংরা কাজ করে আমাকে লাঞ্ছিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও বুদ্ধিমান এবং সৎলোক নেই ?"—সূরা হুদ ঃ ৭৮

মানুষ সাধারণত আবেগ ও ভাব প্রবণতার কাছে পরাস্ত হয়। খুব কম মানুষই একে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় বেশীর ভাগ লোক বৈধ এবং স্বাভাবিক উপায় ও পন্থার অবর্তমানে অবৈধ ও অস্বাভাবিক উপায় ও ফন্দি কাজে লাগাতে থাকে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্যই শরীআত বিয়ের জন্য তাগিদ দিয়েছে। কারণ, শরীআতের দৃষ্টিতে বিয়ে হলো যৌনতৃপ্তি লাভের বৈধ ও স্বাভাবিক উপায়। বিয়ের তাগিদ দিয়ে নবী স. বলেছেন ঃ

من قدر على النكاح فلم ينكح فليس منّا.

"তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ আছে সে যদি বিয়ে না করে তাহলে সে আমাদের কেউ নয়।"

আবুয যাওয়ায়েদ নামক এক ব্যক্তি অবিবাহিত জীবন যাপন করছিল। হযরত উমর রা. তাঁকে বললেন ঃ তোমার বিয়ে না করার কারণ হলো, হয় তোমার পুরুষত্ব নেই, নয়তো তুমি গোনায় লিপ্ত আছো। বিখ্যাত তাবেয়ী তাউস র. হযরত উমরের এ উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিল না এরূপ অপর এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন বিয়ে করে নাও। তা না হলে আমিও তোমার ব্যাপারে সে একই কথা বলবো। হযরত উমর রা. যা আবু যাওয়ায়েদকে বলেছিলেন। শরীআত এতদূর পর্যন্ত নির্দেশ দিয়েছে যে, যদি স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার মতো সামর্থ না থাকে তাহলে দাসী রাখো।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط - النساء : ٢٥

"তোমাদের মধ্যে যার বংশীয়া (স্বাধীন) মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ নেই তার উচিত কোনো ঈমানদার ক্রীতদাসীকে বিয়ে করে নেয়া।"—সূরা আন নিসা ঃ ২৫

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, কোনো কোনো সময় মানুষ এমন পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় যখন তার দাম্পত্য জীবনের দায় দায়িত্ব বহনের যোগ্য আর থাকে না। এরূপ পরিস্থিতির শিকার হলে শরীআত বেশী করে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছে যাতে সে আল্লাহর স্মরণের এ ঢাল দিয়ে যৌন আবেগ ও উত্তেজনার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও শরীরে যতো বেশী শক্তি

www.bjilibrary.com

হবে যৌন আবেগ-অনুভূতিও ততো বেশী তীব্র হবে। রোযার মাধ্যমে শরীর যেমন দুর্বল হয় যৌন আবেগ-অনুভূতিও তেমনি স্তিমিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন।

يا معشر الشبّاب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصّوم له وجاءُ

"হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ আছে তাদের অবশ্যই বিয়ে করা উচিত। কারণ, বিয়ে চোখকে আনত রাখে (অর্থাৎ কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে) এবং লজ্জাস্থানকে (অন্যায় কাজ থেকে) রক্ষা করে। তবে যার বিয়ে করার সামর্থ নেই তার উচিত রোযা রাখা। কারণ, রোযা তার জন্য (গোনাহর বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ।"

হানাফী ও মালেকী ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, রোযা যে ব্যক্তিকে গোনাহ থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং সে যদি ক্রীতদাসী রাখতেও সক্ষম না হয় আর তার যদি এ মর্মে দৃঢ় আশংকা হয় যে, বিয়ে না করলে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে তাহলে তার জন্য বিয়ে করা ফরয। তবে বিয়ে ফরয হওয়ার জন্য খোরপোষ দেয়া এবং মোহরানা পরিশোধের আর্থিক সামর্থ থাকতে হবে কি হবে না এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মত-পার্থক্য বিদ্যমান।

হানাফী ও কিছু সংখ্যক মালেকী ফিকাহবিদ বিয়ে ফরয হওয়ার জন্য খোরপোষ দেয়ার সামর্থ থাকা জরুরী মনে করেন। কেননা, সামর্থ না থাকলে সে এজন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। এভাবে তাকে একটি গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য আরেকটি গোনায় জড়িয়ে পড়তে হবে।

তবে অধিকাংশ মালেকী ফিকাহবিদদের মতে খোরপোষের চিন্তায় বিয়ে বিলম্বিত করা ঠিক নয়। ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তা থেকে বাঁচার জন্য শরীআতসম্মত কর্মপন্থা অনুসারে আমল করা উচিত।

তাঁদের মতে এমন কি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো দূরে থাক শুধু আশংকা দেখা দিলেই বিয়ে করা ফরয হয়ে যায়। হানাফীদের মতে, আশংকার বর্তমানে সামর্থ থাকার শর্তে ওয়াজিব হয়ে যায়। (ফরয ও ওয়াজিব উভয় হুকুমই বাধ্যতামূলক এ দুটির মধ্যে আইনগত পার্থক্য আছে। কিন্তু কার্যত কোনো পার্থক্য নেই।)

হাম্বলী ফিকাহবিদদের মত মালেকীদের চেয়েও কঠোর। তারা বলেন ঃ বিয়ে না করার কারণে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নয়, শুধু ধারণা

www.bjilibrary.com

হলেই বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে যায়। খোরপোষ দেয়ার সামর্থ থাক বা না থাক এরূপ অবস্থার উদ্ভব হলে বিয়ে করে নেয়া এবং বিয়ের পর হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ

وان احتاج الانسان الى النكاح وخشى العنت بتركه قدّمه على الحج الواجب وان لم يخف قدم الحج ونص الامام احمد عليه فى رواية صالح وغيره وان كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح ان لم يخش العنت.

"কারো যদি বিয়ে করার প্রয়োজন হয় এবং বিয়ে না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে তাহলে বিয়েকে ফরয হজ্জের চেয়েও অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে যদি ব্যভিচারের আশংকা না থাকে তাহলে হজ্জকে বিয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার দেবে। এ বিষয়ে সালেহ এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকে ইমাম আহমদ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। ইবাদাত যদি ফরযে কিফায়া শ্রেণীর হয় যেমন ঃ শিক্ষা, জিহাদ ইত্যাদি তবে ব্যভিচারের আশংকা না হলে তা বিয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। অন্যথায় বিয়েই অগ্রাধিকার পাবে।"[১]

আল্লামা ইবনে হাযম র. লিখেছেন ঃ

فرض على كل قادر على الوطن ان وجد من اين ... يتزوج اوليتسرى ان يفعل احدهما ولا بد فاز عجز عن ذالك فليكثر من الصوم.

"যৌন সম্ভোগে সক্ষম ব্যক্তি যদি স্বাধীন বংশীয়া মহিলাকে বিয়ে করতে কিংবা ক্রীতদাসী রাখতে সক্ষম হয় তাহলে দুটির যে কোনো একটি করা তার জন্য ফরয। আর এর কোনোটিই করতে অপারগ হলে বেশী করে রোযা রাখবে।"[২]

বিয়ের শরয়ী ও আইনগত গুরুত্ব বুঝার জন্য হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা ইমাম আকমালুদ্দীন আলবাবারতীর নিম্নোক্ত উক্তিটিই যথেষ্ট ঃ

---

১. এখতিয়ারাতু শায়াখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-১১৯।
২. আল মুহাল্লা, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪০।

www.bjilibrary.com

وما اتفق فى حكم من احكام الشرع مثل ما اتفق فى النكاح من اجتماع دواعى الشرع والعقل والطبع.

"শরীআত, বিবেক বুদ্ধি এবং প্রকৃতির চালিকা শক্তিসমূহ যতো অধিক পরিমাণে বিয়ের সপক্ষে কাজ করছে শরীআতের অন্য কোনো বিধানের সপক্ষে ততো করছে না।"[১]

---

১. আল ইনায়াত আলাল বিদায়া আল মাতবূ' আলা হাশিয়াতি ফাতহিল কাদীর, ২য় খণ্ড , পৃষ্ঠা-৩৩৯।

www.bjilibrary.com

ব্যভিচার হারাম

যৌন পরিতৃপ্তি লাভের যে পন্থাগুলো ইসলাম বৈধ করে দিয়েছে সেগুলোর ওপর আমল করার জন্যও ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাকীদ করে। এগুলো ছাড়া যৌন কামনা পরিতৃপ্ত করার যতো পথ হতে পারে ইসলাম তার সবগুলোই হারাম ও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এমন কি তার নিকটবর্তী হতেও ইসলাম নিষেধ করেছে।

কুরআন মজীদ ঘোষণা করছে ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَّسَآءَ سَبِيْلاً ○ - بنى اسرائل : ٣٢

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। কারণ, তা লজ্জাহীনতার কাজ এবং জঘন্য পন্থা।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২

ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ - الشورى : ٣٧

"তারা বড় বড় গোনাহ এবং লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকে।"

–সূরা আশ শূরা ঃ ৩৭

ব্যভিচার শুধু বড় গোনাহ নয়, অনেক বড় গোনাহ। তাই তার কলুষ কালিমা থেকে ঈমানদাররা পবিত্র থাকেন।

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ

اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ○ - الفرقان : ٦٨

"(রহমানের বান্দারা) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে শরীক করে না। আল্লাহ যাকেই হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন এমন কোনো প্রাণকে তারা হত্যা করে না। তবে ন্যায় ও সত্যের দাবীই যদি তা হয় তাহলে ভিন্ন কথা আর তারা ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি এ ধরনের গোনায় লিপ্ত হবে সে তার কৃতকর্মের শাস্তি লাভ করবে।"

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৮

কুরআন নামাযী ও সফলকাম মু'মিনদের একটি গুণ বর্ণনা করেছে এই বলে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ○

www.bjilibrary.com

"তারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তবে নিজের স্ত্রী ও দাসীদের ক্ষেত্রে নয়। (কারণ, তাদের থেকে যৌন তৃপ্তি লাভের ক্ষেত্রে) তারা তিরস্কৃত হবে না। কারণ, এ দু'টি পন্থাই বৈধ। তবে এছাড়া তৃতীয় কোনো পন্থা যে তালাশ করবে সে প্রকৃতই সীমালংঘনকারী।"

–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৫-৭

কাজী ইবনে রুশদ লিখেছেন ঃ

اباحه فى الشرع على وجهين احدهما عقد النكاح والثانى ملك اليمين فلا يحل استباحة الفرج بما عدا هذين الوجهين.

"শরীআত দু'টি উপায়ে যৌন তৃপ্তি লাভ করা বৈধ করেছে। এক, বিয়ে করা এবং দুই, ক্রীতদাসী রাখা। এ দু'টি পন্থা ছাড়া আর কোনো পন্থায় যৌনসুখ ভোগ হালাল হতে পারে না।"[১]

আল্লামা ইবনে কাইয়েম র. বলেন ঃ

فان الا بضاع فى الاصل على التحريم فيقتصر فى اباحتها على ماورد به الشرع وما عداه فعلى اصل التحريم.

"কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা মূলত হারাম। তাই শরীআত কর্তৃক বর্ণিত সীমার মধ্যেই এর বৈধতা সীমাবদ্ধ। এ সীমার বাইরে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা মূলনীতি অনুসারেই হারাম।"[২]

"আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ" গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

فقواعد المذاهب تجعل الرجل مقصوراً على من يحل له كما تجعل المرأة مقصورةً عليه.

"ফিকহী মাযহাবসমূহের নীতিসমূহ পুরুষকে কেবল সেসব নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুমতি দেয় যারা তার জন্য হালাল। অনুরূপভাবে এ নীতিমালা নারীকে তার স্বামীকে যথেষ্ট মনে করতে বাধ্য করে।"[৩]

ব্যভিচার হারাম হওয়ার কারণসমূহ

প্রশ্ন হতে পারে, যৌন সম্পর্কের বিষয়টিকে কিছু সীমাবদ্ধতা ও বিধি বন্ধনের অনুগামী করার পেছনে কি যুক্তি ও কৌশল রয়েছে এবং অবাধ ও

১. মুকাদ্দামাতি ইবনে রুশদ-আল মাতবুআ মা'আল মুকাওয়ানাতিল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১, ২২।
২. যাদুল মাআদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯।
৩. আল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪।

www.bjilibrary.com

উন্মুক্ত রাখার মধ্যে কি কি ক্ষতি নিহিত আছে যে, ইসলামী শরীআত প্রথম উপায়টিকে বৈধ এবং দ্বিতীয়টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ?

কুরআন মজীদ এ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দিয়েছে। সূরা নিসায় বিয়ে করার নির্দেশ এবং ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ قف وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا ○ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○ - النساء : ٢٨-٢٦

"আল্লাহ চান তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের রীতিনীতি, তাদের অনসৃত সে পথেই তিনি তোমাদের চালাতে চান আর তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। তিনি জ্ঞানী এবং কুশলী। আল্লাহ রহমতের সাথে তোমাদের প্রতি মনযোগ দিতে চান। কিন্তু যারা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা যেন সত্য পথ থেকে বহু দূরে সরে যাও। আল্লাহ চান তোমাদের বোঝা হালকা করতে। (কেননা) মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

–সূরা আন নিসা ঃ ২৬-২৮

সূরা আন নূরে ব্যভিচার হারাম ঘোষণা করা এবং সামাজিক বিধি-নিষেধ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰيَاتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلاً مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ - النور : ٣٤-٣٥

"আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করেছি এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশপূর্ণ বাণী পাঠিয়েছি। আল্লাহ আসমান এবং যমীনের নূর বা জ্যোতি।

www.bjilibrary.com

তাঁর এ নূরের উপমা হলো, ঠিক যেমন একটি তাকের ওপর একটি জ্বলন্ত প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের চিমনীর মধ্যে রাখা। চিমনীটা যেন একটি উজ্জ্বল তারকা। প্রদীপটি জ্বালানো হয় একটি বরকতপূর্ণ গাছ-জলপাই গাছের তেল দ্বারা যা পূর্বমুখীও না আবার পশ্চিমমুখীও না। এ কারণে তার তেল এতো স্বচ্ছ যে, মনে হয় এখনই তা আপনা থেকেই আলো দিতে থাকবে। যদিও আগুন তাকে স্পর্শই করেনি। আলোর ওপরে আলো। আল্লাহ তা'আলা যাকে খুশী তাঁর আলোর দিকে পথ দেখান আর মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করেন। আল্লাহ সবকিছু অতি উত্তমরূপে জানেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৩৪-৩৫

এ আয়াতগুলো থেকে আমাদের সামনে কতকগুলো সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

প্রথম সত্যটি হলো, অবাধ যৌন চর্চার পরিবর্তে মহান আল্লাহ কর্তৃক বাতলে দেয়া সীমার মধ্যে অবস্থান করে যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আল্লাহর সেসব সম্মানিত বান্দাদের নীতি ও আদর্শ যাদের ওপর তাঁর রহমত সব সময় বর্ষিত হতো। যারা মানবতার তরীকে আবেগ-উত্তেজনা এবং কামনা বাসনার ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করে জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধির উপকূলবর্তী করেছেন। যারা মনুষ্যত্বের সঠিক মর্যাদা দিয়েছেন। এবং তাকে সফলতার গোপন রহস্য এবং ব্যর্থতার কারণ অবহিত করেছেন। যাদের চেষ্টা-সাধনার ফলে পৃথিবী এমন একটি সমাজ লাভ করেছে যেখানে আবেগ ও বিবেকের ভারসাম্য পুরোপুরি বজায় ছিল। যাদের প্রচেষ্টার ফলে আবেগে মত্ত মানুষেরা সমকালের সুধী সমাজে পরিণত হয়েছে এবং জ্ঞান ও দূরদৃষ্টিহীনরা জ্ঞান ও বুদ্ধির এমন দিকপাল হয়েছেন যে, চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তা তাদের জন্য গর্ব প্রকাশ করতো। যাদের আবেগ অনুভূতি এতোটা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ছিল যে, তা ছিল পবিত্রতা ও সতীত্বের রক্ষক। তাদের জীবন ও কর্ম এমন নিষ্কলুষ ছিল যে, তাতে নিষ্কলংক সূর্যও লজ্জাবোধ করতো এবং তাদের উন্নত চরিত্র চন্দ্র ও তারকার মহত্ত্বকেও লজ্জা দিতো।

দ্বিতীয় সত্যটি হলো, যে জাতিই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় লিপ্ত হয়েছে সে জাতিই ব্যর্থ হয়েছে। সে এমন এক অন্ধের মতো ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যার হাত ধরার মতো কেউ নেই। তার প্রতিটি পদক্ষেপ হয় পাগলের পদক্ষেপের মতো, যাতে বিবেক-বুদ্ধির কোনো স্থান থাকে না। কারণ, আবেগ উচ্ছ্বাসের আতিশয্য তার দূরদৃষ্টির আলোকবর্তিকাকে নির্বাপিত করে দিয়েছিল এটা ইতিহাসের সিদ্ধান্ত। ইতিহাস অসংখ্যবার তার সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় সত্য হলো, এসব আইন-বিধানের মাধ্যমে কুরআন চায় মানুষ আবেগ অনুভূতির দাস না হয়ে আল্লাহর আজ্ঞাবহ দাস হোক। যাতে সে তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতের উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে এবং এমন সৌভাগ্যের জীবন লাভ করতে পারে যেখানে আছে শুধু শান্তি আর শান্তি। যে জীবন দুঃখ-কষ্ট থেকে বহুদূরে অবস্থিত। কিন্তু প্রবৃত্তির দাসরা চায় গোটা দুনিয়া যেন তাদের মতোই প্রবৃত্তির পূজায় নিমগ্ন থাকে।

চতুর্থ সত্য হলো, আল্লাহ তা'আলা যৌন সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি। এর ওপর শুধু বাধ্য-বাধকতা ও কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তাই তিনি মানুষের সামনে বৈধ পথসমূহ উন্মুক্ত রেখেছেন। এসব পথ যদি রুদ্ধ হতো তাহলে আবেগ উত্তেজনার সয়লাব সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতো। কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ অত্যন্ত দুর্বল। সে আবেগ ও উত্তেজনা দমন করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এভাবে মানুষের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ রেখেছেন। তাঁর আইনে কোনো প্রকার কঠোরতার অবকাশ রাখেননি।

পঞ্চম এবং সর্বশেষ সত্য হলো, আল্লাহভীরুতা, পরহেজগারী এবং তাকওয়া ও পবিত্রতা প্রকৃতির দাবী। এটা মানুষের ভেতর থেকে উত্থিত একটা প্রতিধ্বনী। এ কারণে মানুষের প্রকৃতি পবিত্রতা, সচ্চরিত্র এবং নিষ্কলুষতাকে শুধু অস্বীকার করে না তাই নয়, বরং অগ্রসর হয়ে তাকে স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানায়। এ অনুসারে কাজ করে মানুষ সবরকম পরিচ্ছন্নতা ও ঔজ্জ্বল্য লাভ করে এবং সে এমন আলো লাভ করে যা দ্বারা সফলতার দ্বারে পৌঁছতে পারে।

لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.

"তবে যে আল্লাহর আলো লাভ করতে পারে না তার জন্য কোথাও আলো নেই।"

ইসলাম যৌন সম্পর্কের যে ধারণা পেশ করেছে, আসুন আমরা এখন তার একটু বিশ্লেষণ করে দেখি যে, সে এ ধারণা অনুসারে কিভাবে ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং সমাজকে সংস্কার করে। কারণ, এ দু'টি বিষয়ের ওপরেই কোনো ধারণা বা দর্শনের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

❒

www.bjilibrary.com

ব্যক্তির প্রশিক্ষণ

কোনো সামাজিক রূপরেখাই বাস্তবে ততোক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারে না যতোক্ষণ না তার ছত্রছায়ায় জীবন যাপনকারী মানব গোষ্ঠী উক্ত সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদের জীবনে যথাযথ পরিবর্তন না আনে। এজন্য প্রত্যেক সমাজ যে মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় সে মতবাদ অনুসারে তার জনগাষ্ঠীকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ইসলামও ব্যক্তির শুদ্ধি ও সংশোধনকে অন্যান্য সব বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দান করেছে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য মতবাদের তুলনায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো, সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশাবাদী থেকেই তার সংশোধনের কাজ শুরু করে। সে মানুষ সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত ধারণা পোষণ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ দুষ্কর্মশীল বা গুণ্ডা নয়। বরং প্রকৃতিগতভাবেই সে ফেরেশতা সুলভ ঊর্ধগামিতার অধিকারী। কিন্তু ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা এবং বিকৃত শিক্ষা দীক্ষা তাকে অধঃপতন ও নীচুতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এখানে এসে সেসব ধ্যান-ধারণা ও দর্শনের মূল কর্তিত হয়ে যায়। বর্তমানে পৃথিবীর নেতৃত্বের ঝাণ্ডা যার হাতে এবং যা গোনাহ ও ব্যভিচারকে ঠিক তেমনি প্রকৃতির দাবী ও প্রয়োজন বলে মনে করে যেমন শরীরকে শীতাতপ থেকে রক্ষা করার জন্য পোশাকের এবং বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। মানুষ তার খাদ্য ও পোশাকের প্রয়োজন পূরণ করতে যখন দ্বিধা ও সংকোচ অনুভব করে না তখন যৌন আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণ করার বেলায় লজ্জাবোধ করবে কেন ?

মহত্ত্বের অনুভূতি

পক্ষান্তরে ইসলামের দাবী হলো, ব্যভিচার একটি গোনাহ ও পাপের কাজ। আর পাপের কাজ মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কেবল নেকীর কাজই ইসলামের মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মহত্ত্ব ও মর্যাদা গোনাহর কাজে নয় নেকীর কাজে, অকল্যাণের কাজে নয় কল্যাণের কাজে। অন্যথায়, কোনো অশোভন কাজে মানুষ বিবেকের দংশন ও অনুশোচনা অনুভব করবে কেন ? ভ্রান্ত আচরণে তার মন তাকে তিরস্কার করে কেন ? এর একটিই মাত্র কারণ। তাহলো, মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ প্রশংসনীয় ও মর্যাদার কাজের সাথে সম্পৃক্ত। পবিত্র স্বভাব এবং উত্তম কাজের দ্বারাই তার ব্যক্তিত্বের লালন হয়। তার মধ্যে যদি এসব মৌলিক গুণাবলী না থাকে তাহলে সারা দুনিয়ার চোখে তার কোনো গুরুত্বই থাকবে না। এ অনুভূতিই একজন জঘন্য মানুষকেও সবার সামনে ভাল কাজের মুখোশ পরে আসতে বাধ্য করে। সে চায়, দুনিয়া

তার কুৎসিত মন এবং মন্দ চাল-চলনকে আলোকপ্রাপ্ত মন এবং পবিত্র কাজ বলে বিশ্বাস করুক।

কুরআন মজীদ মানুষের এ অনুভূতিকেই জীবন্ত ও জাগ্রত করে তোলে এবং তার কাছে বার বার এ বলে আবেদন জানায় যে, আর কতোদিন এ আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত থাকবে ? তোমার শরাফত ও মর্যাদা এবং সংকল্পের লক্ষ যদি তোমার কাছে সত্যিই প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে সেসব পূর্ণতা অর্জনের জন্য জীবনকে নিয়োজিত করো যা দিয়ে তুমি তোমার হারানো মহত্ত্বকে ফিরে পেতে পারো।

কুরআন মজীদ কতো অভিনব ভঙ্গিতে এ সত্যকে তুলে ধরেছে ঃ

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَايَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ط اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ـ الاعراف : ٢٨

"আর তারা যখন লজ্জাহীনতার কোনো কাজ করে তখন বলে ঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এরূপ কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদের এ কাজ করতে আদেশ করেছেন। তুমি বলে দাও, আল্লাহ লজ্জাহীনতার কাজে কখনো আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলো যার কোনো জ্ঞান তোমাদের নেই ?"

—সূরা আল আরাফ ঃ ২৮

এটি চিন্তা করে দেখার মতো বিষয় যে, আজকের অপরাধী ও পাপী চক্র এবং আরব জাহেলিয়াতের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিতদের ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে কতো সাযুজ্য বিদ্যমান যে, এরাও নিজেদের উচ্ছৃংখলতা ও ফূর্তিবাজির জন্য ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বিকৃত করে আর তারাও নিজেদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে ইতিহাসকেই পেশ করতো। সে যুগের জাহেলরা তাদের ভ্রান্তনীতি ও কর্মের সমর্থনে আল্লাহর অহীর নির্দেশ বলে আখ্যায়িত করতো। বর্তমান যুগেও নফস ও প্রবৃত্তির দাসেরা তাদের নফস ও প্রবৃত্তির পূজা করে যাচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দূরদৃষ্টি এবং দর্শনের নামে।

বিবেকের আহ্বান

তবে মানুষ যেহেতু প্রকৃতগতভাবেই ভালো ও কল্যাণকর কাজকে ভালোবাসে। তাই তার বিবেক নিজেই এসব কু-প্রবৃত্তির সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে এমন কতিপয়

কার্যকারণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা বাইরের কোনো চাপ ছাড়াই সবরকম খারাপ জিনিসের ব্যাপারে ঘৃণাবোধের সৃষ্টি করে। এসব কার্যকারণ অনেক সময় এমন জোরদার হয়ে ওঠে যে, মানুষ তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অন্যথায় বর্তমান যুগে গোনাহর কাজকে যতো চাকচিক্য ও যাদুময় ভঙ্গিতে তুলে ধরা হচ্ছে তাতে নেকী ও ভালো কাজের ধারণা পর্যন্ত মন-মগজ থেকে মুছে যাওয়ার কথা।

আভ্যন্তরীণ এসব কার্যকারণ বা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের একটিকে বলা হয় বিবেক বা উপলব্ধি যা মানুষের উত্তম কার্যাবলীর প্রশংসা করে এবং মন্দ কাজের জন্য তাকে তিরস্কার করে। আর সবসময় তাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, গোনাহ বা পাপ কার্যের কলুষ-কালিমা তার মহত্ত্বকে ভূলুণ্ঠিতকারী এবং মহান আল্লাহ তাকে যে সুউচ্চ পদ মর্যাদা দান করেছেন তার পরিপন্থী।

বিবেকের এ কণ্ঠ দুষ্কর্মের পথে জগদ্দল পাথরের মতো প্রতিবন্ধক। কিন্তু সেদিকে যদি কর্ণপাত না করা হয় এবং তাকে অবদমনের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চলতে থাকে তাহলে এ কণ্ঠ ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ইসলাম তার শিক্ষার মাধ্যমে বিবেককে আরো অধিক সংবেদনশীল ও শক্তিশালী করে তোলে যাতে তা মন্দ এবং অকল্যাণ প্রবেশের সেসব রাস্তারও পাহারাদারী করে যেখানে আইনের ভয়, বদনামের আশংকা এবং সামাজিক চাপ পাহারাদারী করতে অক্ষম।

নাওয়াস ইবনে সামআন বর্ণনা করছেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে নেককাজ ও গোনাহর তাৎপর্য জানতে চাইলো। নবী স. তাকে জবাব দিলেনঃ

البرّحسن الخلق والاثم ماحاك في نفسك وكرهت ان يطلع الناس عليه.

"নেকী হচ্ছে উত্তম চরিত্র আর গোনাহ হচ্ছে তাই যা তোমার মনে দ্বিধা ও সংকোচের সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে অবহিত হোক তা তুমি পছন্দ করো না।"[১]

এ হাদীসটির প্রত্যেকটি শব্দ চিন্তার দাবী রাখে। মহামূল্যবান এ বাণী অনেকগুলো গভীর তাৎপর্য উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছে। নেকীর কাজ তাই যাতে নৈতিক চরিত্রের সৌন্দর্য ও মাধুর্য এবং কর্মে পবিত্রতার দীপ্তি ফুটে উঠছে। কিন্তু গোনাহ এ সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব থেকে বঞ্চিত। মন্দ ও অকল্যাণের বৈশিষ্ট্য হলো, তা সবসময় হৃদয়-মন ও বিবেকের কাঁটা হয়ে থাকে। তা অপরাধীকে কখনো মনের সজীবতা প্রফুল্লতা নিয়ে জনসমক্ষে আসতে দেয় না। কিন্তু একজন সৎ মানুষের হৃদয়-মন-বিবেকের এ দংশন ও টানাপোড়েন থেকে

১. তিরমিযী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মাজায়ে ফিল বাররে ওয়াল ইছমে।

www.bjilibrary.com

মুক্ত থাকে। নিজের কাজের জন্য তাকে অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে হয় না। বরং সে খুশী ও নিশ্চিত থাকে এই ভেবে যে, অতীত জীবনে সে তাই করেছে যা তার করা উচিত ছিল।

ঈমান মানুষের মধ্যে এ বিশেষ গুণটিই সৃষ্টি করে ঃ

اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ.

"তোমার ভালো কাজ যদি তোমাকে আনন্দিত করে এবং মন্দ কাজ অসন্তুষ্ট করে তাহলেই তুমি ঈমানদার।"[১]

লজ্জাবোধের লালন

মহত্ত্বের অনুভূতি যখন জেগে উঠে এবং সংবেদনশীলতা ও বিবেকের শক্তি যখন জীবন্ত থাকে তখন মানুষ তার মর্যাদার তুলনায় নীচু পর্যায়ের কোনো কাজ করতে লজ্জা ও অপমান বোধ করে। গোনাহর কাজে জড়িত হয়ে তার মাথা উন্নত হয় না। বরং অবনত হয়। পাপ কার্য তার জন্য গর্বের কারণ নয় বরং লজ্জা-অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বোধ ও অনুভূতি যদি নিস্তেজ হয়ে পড়ে তাহলে মানুষকে গোনাহর হাত থেকে রক্ষাকারী সমস্ত শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রত্যেক যুগে ভাল কাজের দিকে আহ্বানকারী প্রত্যেক আল্লাহর বান্দা এ সত্যটি বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

عن ابى مسعود رض قال قال النبى ﷺ ان مما ادرك الناس من كلام النّبوة الاولى اذا لم تستحى فاصنع ماشئت.

"আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, অতীত যুগের নবীদের শিক্ষার যে অংশটুকু মানুষের কাছে পৌঁছেছে তার মধ্যে একথাও আছে যে, যদি তোমার লজ্জা-শরম না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই করো।"[২]

লজ্জা-শরম ও আত্মমর্যাদাবোধের শিক্ষা সবসময়ই নবুওয়াতের শিক্ষার সাথে অঙ্গীভূত হয়েছে কেন এক সময় নবী স. তার কারণ বর্ণনা করেছেন।

একবার হযরত সা'দ রা. জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যদি দেখে যে, কোনো এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর শ্লীলতা হানি করছে তাহলে তার আত্মমর্যাদাবোধ কি তাকে কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক চার জন সাক্ষী

---

১. বুখারী, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ ঃ "ইযা লাম তাসতাহয়ী ফাসনা" মা শি'তা, আবু দাউদ, কিতাবুল আদব বাবুল হায়া।

২. মিশকাত, কিতাবুল ঈমান–আহমদ সূত্রে।

www.bjilibrary.com

তালাশ করে আনার অনুমতি দেবে ? আল্লাহ্ না করুন ! আমার ক্ষেত্রে এরূপ অসহনীয় ঘটনা ঘটলে আমি প্রথমে সে বদমাশকে সেখানেই হত্যা করবো।

আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এ বক্তব্য শুনে নবী স. উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

أتعجبون من غيرة سعد والله لانا اغير منه والله اغير منى من اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ـ

"তোমরা সা'দের মর্যাদাবোধ দেখে বিস্মিত হচ্ছো ? আল্লাহর শপথ, আমি তার চেয়ে অধিক মর্যাদা বোধ সম্পন্ন। আর আল্লাহ তাআলা আমার চেয়েও অধিক মর্যাদা বোধ সম্পন্ন। আল্লাহ্ তাঁর এ মর্যাদা বোধের কারণে গোপন ও প্রকাশ্য সবরকম অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতা হারাম ঘোষণা করেছেন।"[১]

এ হাদীসটি থেকে যে বিষয়টি আমরা জানতে পারি তাহলো, কোনো নীচু স্বভাব প্রকৃতির মানুষও যখন নীচু ও মন্দ কাজকে তার সাথে সম্পর্কিত করা পসন্দ করে না তখন মহান আল্লাহর পবিত্র ও মহত্ত্ব মণ্ডিত সত্তা তো এর চেয়ে অনেক উর্ধে। তাই গোনাহ ও অশ্লীলতা তাঁর কাছে প্রিয় ও পসন্দনীয় হতে পারে না এবং তিনি তা করার জন্য নির্দেশও দিতে পারেন না। একজন শরীফ ও লজ্জাশীল মানুষের নিজের পক্ষে গোনায় লিপ্ত হওয়াতো দূরের কথা অন্য কারো গোনায় লিপ্ত হওয়াও সে দেখতে পারে না। তাহলে সর্বাধিক মর্যাদা বোধের অধিকারী আল্লাহ্ বান্দার লজ্জাহীনতা অপরাধ প্রবনতা কি করে খুশী মনে বরদাশত করতে পারেন ? প্রত্যেক যুগে তিনি তাঁর মনোনীত বান্দাদের জবানীতে এ অপসন্দের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহর এসব গুণাবলীর প্রভাব তাঁর যে বান্দার ওপর যতো বেশী পড়বে সে গোনাহ্ থেকে ততো বেশী নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবে। শুধু গোনাহ ও অপরাধের কল্পনাও একজন সত্যিকার আল্লাহভীরু ব্যক্তির মাথা লজ্জায় অবনত করে দিতে পারে। এ কারণে দুনিয়ার সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كان النبى ﷺ اشد حياءً من العذراءِ فى خدرِها وكان اذا كره شيئًا عرفناه فى وجهه.

"নবী স. পর্দানসীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। লজ্জাহীনতার কোনো ব্যাপার ঘটলে তিনি মুখে কখনো তার উল্লেখ

১. বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ ; অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী লা শাখসা আগইয়ারু মিনাল্লাহি; মুসলিম, কিতাবুল লিআন।

www.bjilibrary.com

পর্যন্ত করতেন না। বরং তাঁর চেহারায় অনীহা ও অপসন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠতো যা আমরা বুঝতে পারতাম।"[১]

এ লজ্জাশীল মানুষটি দুনিয়াকে যেভাবে লজ্জাশীলতার শিক্ষা দিয়েছেন তা নিম্নোক্ত দুটি হাদীস থেকে অনুমান করা যায়।

عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جدّه قال قلت يانبى اللّه عوراتنا ما نَأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك الاّ من زوجتك اوما ملكت يمينك قال قلت يا رسول اللّه ﷺ اذا كان القوم بعضهم فى بعض قال ان استطعت ان لاّ يراها احدُ فلا ترينَّها احداً قال قلت يانبِىّ اللّهُ اذا كان احدنا خاليًا قال فالله احق ان يستحى منه من الناس.

"বাহাজ ইবনে হাকীম তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা আমাদের সতর (গোপনীয় স্থানসমূহ) কখন হিফাজত করবো এবং কখন তার হিফাজত করবো না? তিনি জবাব দিলেন; স্ত্রী এবং দাসী ছাড়া আর কারো সামনে সতর উন্মুক্ত হতে দিও না। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! অনেক লোক যখন এক সাথে থাকে এবং মানুষ তার সতর রক্ষায় পুরোপুরি সক্ষম না হয় তাহলে কি করবে? তিনি বললেন ঃ যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবে যাতে কেউ তোমার গোপনীয় স্থানসমূহ দেখতে না পারে। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যখন একাকী থাকে তখনও কি বিবস্ত্র হতে পারবে না? তিনি বললেন ঃ তখন আল্লাহ তো থাকেন। আর মানুষের তুলনায় লজ্জা করার বেশী উপযুক্ত হলেন আল্লাহ।[২]

عن عتبة بن عبد السَّلمى رض قال قال رسُول اللّه ﷺ اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين.

"উতবা ইবনে আবদুস সালমা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইলে তার আড়াল করা উচিত। এ সময় তারা যেন গাধার মতো উলঙ্গ না হয়।[৩]

১. মুসলিম, কিতাবুল আদাব ; অনুচ্ছেদ ঃ কাসরাতু হায়াইহী স.।
২. তিরমিযী, আবওয়াবুল ইসতিযান ওয়াল আদাব, বাবু মা জায়া ফী হিফযিল আওরাহ ; ইবনে মাযা, আবওয়াবুন নিকাহ বাবুত তাসাত্তুর ইনদাল জিমা।
৩. ইবনে মাজা, আবওয়াবুন নিকাহ, বাবুত তাসাত্তুর ইনদাল জিমা।

www.bjilibrary.com

এ শিক্ষা লজ্জাশীলতার মর্যাদা এত উচ্চে তুলে ধরেছে যে, বর্তমান যুগের মন-মগজের পক্ষে তার কল্পনা করাও অসম্ভব।

নবী স.-এর সর্বাধিক প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা রা. বলেন ঃ আমি নবী স.-এর শরীরের গোপনীয় অংশ কখনো দেখিনি।[১]

সভ্যতা, ভদ্রতা এবং লজ্জা-শরমের একটি মানদণ্ড এটি। আরেকটি মানদণ্ড হলো তাই যা বর্তমান উলঙ্গ সভ্যতা পেশ করছে। পর্দাহীনতা ছাড়া এ সভ্যতা পূর্ণতাই লাভ করতে পারে না।

ইসলামী সভ্যতার অবস্থা হলো, নারী পুরুষের সম্পর্কের স্বাভাবিক সীমার মধ্যেও লজ্জা-শরম বাদ দেয়া হয় না। অন্যদিকে তথা কথিত আধুনিক সভ্যতায় উলঙ্গপনার অবস্থা হলো পুরুষ এবং নারী খোলা বাজার-ঘাটেও বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে। একদিকে মুখ থেকে অভদ্রোচিত ও অশালীন কথা পর্যন্ত বের করতে অস্বীকৃতি জানানো হচ্ছে। অন্যদিকে অলিতে গলিতে রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেমের কাহিনী শুনানো হচ্ছে এবং ভালোবাসা ও যৌবনের যৌন আবেগময় গান গাওয়া হচ্ছে। এখন বলুন! চরিত্র গঠনের কোন্ পন্থাটা মানুষকে গোনাহর চোরাবালিতে আটকা পড়া থেকে রক্ষা করতে পারে ?

আখেরাতের মুহাসাবা

লজ্জানুভূতি পুরোপুরি প্রকৃতিগত ব্যাপার। কিন্তু আখেরাতের চিন্তা এবং সেখানে সমস্ত কাজকর্মের জবাবদিহির ভয় থেকে তার জীবন ও স্থায়িত্ব লাভ ঘটে। অন্যথায় তা হয়তো হ্রাস পেতে থাকতো। কেননা এর প্রসার ও জীবনদায়ী শক্তি হলো তিরস্কার ও অপমানের ভয়। তিরস্কার বা প্রশংসা যা লাভ করার মানুষ তা এ পৃথিবীতেই লাভ করবে। এর বাইরে আর কোনো জগত নেই যেখানে আমাদের সমস্ত কাজকর্মের বিচার-বিশ্লেষণ হতে পারে। যেখানে এ ধারণা ও বিশ্বাস কাজ করে সেখানে মানুষ গোনাহ ও পাপ কার্যের জন্য এতো অসংখ্য সুযোগ অনুসন্ধান করতে পারে, যার ফলে গোনাহ আর গোনাহ বলে বিবেচিত না হয়ে সওয়াবের কাজ বলে বিবেচিত হতে থাকে এবং স্বয়ং তিরস্কারকারী শক্তিসমূহই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ইসলাম এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, এ বিশ্বজাহানে এমন একটি মহান সত্তা আছেন যাঁর দৃষ্টি থেকে কোনো মানুষের কাজকর্মের কোনো অংশই আড়াল হতে পারে না। দিবালোকে সংঘটিত কাজকর্ম যেমন আড়াল হতে পারে না তেমনি রাতের গভীর অন্ধকারে সংঘটিত কাজকর্মও আড়াল হতে পারে না। পাহাড়ের মতো বিরাট বিরাট ঘটনা থেকে শুরু করে মনের গভীরের ইচ্ছা অনুভূতি

১. একই সূত্র, মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩।

www.bjilibrary.com

পর্যন্ত তিনি সমানভাবে পরিজ্ঞাত এবং এমন একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন সমস্ত মানুষের সামনে তার সব কাজকর্মের দফতর খুলে ধরা হবে। সর্বজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী সত্তার সামনে তাকে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। এ বিশ্বাস মানুষকে সেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে যা তাকে লাঞ্ছিত ও খাটো করতে পারে।

এখন যদি দু'চারজন মানুষের সামনে আমাদের কোনো অন্যায় প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে লজ্জায় আমাদের দৃষ্টি অবনমিত হয়ে যায়। অনুশোচনা ও অপমানে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, কাল দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এবং তাদের প্রভু ও মালিকের সামনে তার জীবনের সমস্ত কাজকর্ম পড়ে শুনানো হবে এবং তার জীবনের সব দোষ-ত্রুটি ও কলুষ কালিমা প্রকাশ করে দেয়া হবে তাহলে তার চেয়ে সতর্ক ও পবিত্র জীবনের অধিকারী আর কে হতে পারে? এ বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করার জন্য কুরআন মজীদ স্থানে স্থানে এমন ভঙ্গিতে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করেছে যা থেকে যালেমদের সীমাহীন আফসোস এবং চরম অপমান ও লাঞ্ছনার চিত্র ফুটে ওঠে। আরো ফুটে ওঠে কিভাবে তাদের চেহারায় লাঞ্ছনা ও অপমানের চিহ্ন হবে, লজ্জায় তাদের দৃষ্টি নত হবে এবং হৃদয়-মন ভীত সন্ত্রস্ত হবে। এর সাথে সাথে কুরআন মজীদ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে সৎলোকদের শুভ পরিণামের কথা উল্লেখ করে যাতে মানুষের দৃষ্টিতে গোনাহ ঘৃণিত এবং নেককাজ প্রিয় বলে গণ্য হয়।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ○ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ○ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ○ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ○ - عبس : ٣٨-٤٢

"অনেক চেহারা সেদিন দীপ্তিময়, হাস্যোজ্জ্বল আনন্দিত ও উৎফুল্লচিত্ত হবে। আবার অনেক চেহারা সেদিন ধূলামলিন, কালো ও বিবর্ণ হবে। তারাই অকৃতজ্ঞ কাফের এবং পাপী।"–সূরা আল আবাসা ঃ ৩৮-৪২

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ط وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا لا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ج كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ - يونس : ٢٦-٢٧

www.bjilibrary.com

"যারা নেক কাজের পন্থা অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং এর চেয়েও অধিক। তাদের চেহারায় কালিমা বা অপমান-গ্লানির চিহ্ন থাকবে না। তারা হবে জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের সমপরিমাণ শাস্তি লাভ করবে। তাদের চেহারায় লাঞ্ছনা ও অপমানের কালিমা ছেয়ে থাকবে। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের রক্ষা করার মতো কেউ থাকবে না। তাদের চেহারায় এমন কালিমার ছাপ থাকবে যেন ঘনঘোর রাতের এক টুকরা আবরণ জড়িয়ে রয়েছে। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরদিন থাকবে।"—সূরা ইউনুস ঃ ২৬-২৭

একজন ঈমানদারের ঈমানের ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর সত্তা এবং প্রতিদান বা কিয়ামত দিবসের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। তার জীবনের সব কাজকর্ম এ কেন্দ্রবিন্দুর চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। মন ও মগজের মধ্যে এ আকীদা-বিশ্বাস দৃঢ়মূল হওয়ার পর গোনাহর কল্পনা করা পর্যন্ত তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোনাহ তার কাছে আর আনন্দের কারণ থাকে না। বরং এ কারণে মন সংকোচ অনুভব করতে থাকে।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবন কাহিনী থেকে উপদেশ ও শিক্ষালাভের অফুরন্ত ভাণ্ডার যেমন লুকায়িত আছে তেমনি তা থেকে আমাদের সামনে এ সত্যও ফুটে ওঠে যে, যে হৃদয় আল্লাহভীতির আবাসস্থল আর যেসব দৃষ্টিতে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার দীপ্তি মিশে আছে তাকে দুনিয়ার অন্য কোনো রূপ সৌন্দর্য ম্লান করে দিতে পারে না। মিশর সুন্দরীরা তাদের রূপের আকর্ষণে ইউসুফের পবিত্র হৃদয়-মনকে যাদুমুগ্ধ করতে চাচ্ছে। কিন্তু ইউসুফের অবস্থা হলো তিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁপছেন। অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহর দরবারে দু'খানা হাত তুলে আকুলভাবে প্রার্থনা করছেন এই বলে যে, চরম এ ঝঞ্ঝার মধ্যে তুমিই পার আমার পা মজবুত রাখতে। যে কোনো বিপদ মুসীবত আমি বরদাশত করতে পারি যদি তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহ থেকেও আমি রক্ষা পাই।

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ ج وَاِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ

اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ○ - يوسف : ٣٣

"হে প্রভু! তারা যে কাজে লিপ্ত হতে আমাকে আহ্বান জানাচ্ছে তার চেয়ে জেলখানা আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর তুমি যদি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করো তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং এভাবে জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"—সূরা ইউসুফ ঃ ৩৩

www.bjilibrary.com

চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ করে দেখুন। একদিকে প্রবৃত্তির কামনাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য শত রকমের চক্রান্ত করা হচ্ছে। হাজারো পন্থায় ধোঁকাবাজি ও চক্রান্তের জাল বিছানো হচ্ছে। তাকওয়া ও পবিত্রতার অঙ্গনকে অন্ধকার ও কুৎসিত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে রক্ত-মাংস, আবেগ-অনুভূতি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার অধিকারী এ মানুষই রূপ ও সৌন্দর্যের আকূল আবেদন মাখা প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করছেন। বন্দী জীবনের শত কষ্ট বরদাশত করতে তিনি প্রস্তুত কিন্তু গোনাহর কালিমা মেখে আরাম-আয়েশের জীবন কাটাতে তিনি প্রস্তুত নন। এখন আপনিই বলুন ! কোনো মহাজ্ঞানবান সত্তার কাছে জবাবদিহির দৃঢ়বিশ্বাস মনে না জন্মালে কি এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে ? যে হৃদয়-মন এ বিশ্বাস থেকে মুক্ত, আবেগ অনুভূতির সয়লাবের মুখে তার পক্ষে কি পাহাড়ের মতো অটল থাকা সম্ভব ?

হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামের সামনে অকস্মাত এক সুঠামদেহী সুদর্শন পুরুষের আবির্ভাব হয়। নির্জন পরিবেশে তাকে দেখা মাত্রই হযরত মরিয়ম আ. আল্লাহর ভয়ে বলে উঠছেন ঃ

اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا○- مريم : ١٨

"তোমার মনে যদি আল্লাহর ভয় থাকে তাহলে আমি তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"–সূরা মরিয়ম ঃ ১৮

সে মানুষটি যখন তাঁকে বললেন যে, তিনি মানুষের আকৃতিতে আল্লাহর ফেরেশতা। তিনি এসেছেন তাঁকে এক সৎ ও যোগ্য সন্তানের সুসংবাদ দিতে। একথা শুনে হযরত মরিয়ম আ. বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করছেন ঃ

اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ○- مريم : ٢٠

"কি করে আমার পুত্র সন্তান হবে ? এ পর্যন্ত কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। আর আমি নষ্টা বা ভ্রষ্টাও নই।"–সূরা মরিয়ম ঃ ২০

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

سبعة يظلهم اللّه يوم لا ظل الا ظله شاب نشأ فى عبادة اللّه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انى اخاف اللّه ورجل ذكر اللّه خاليًا ففاضت عيناه.

"যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ছায়া দান করবেন। সেই যুবকও

www.bjilibrary.com

তাদের মধ্যে একজন, যে আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। সে ব্যক্তিও তাদের মধ্যে শামিল যাকে কোনো মর্যাদার অধিকারিণী সুন্দরী যুবতী পাপ কাজে লিপ্ত হতে আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে, গোনাহের কাজে আমি আল্লাহকে ভয় পাই। এমন ব্যক্তিও তাদের একজন যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের আমলের কথা মনে হওয়ায় তার চোখে অশ্রু ঝরতে থাকে।"[১]

কিয়ামতের ভয় থাকলে যে চরিত্রের সৃষ্টি হয় এটি তাই। ইসলাম একজন ঈমানদারের কাছে এ ধরনের উন্নত চরিত্রই আশা করে।"

গোনাহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

ইসলাম গোনাহর বিরুদ্ধে মানুষের স্বভাবগত অনুভূতিকে জাগ্রত করেই ক্ষান্ত হয় না বরং গোনাহ ও নেকী, হক ও বাতিল এবং সুন্দর ও অসুন্দরের স্পষ্ট ধারণাও দান করে। যাতে সত্য পথের মুসাফিরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে ফিরতে না হয় এবং একজন মুক্তিকামী মানুষ যেন ভালভাবে জানতে পারে গোনাহ এবং নেকী কি ? কোন্ কোন্ কাজ মর্যাদাপূর্ণ এবং কোন্ কোন্ কাজ নীচু ও অমর্যাদার ? আর কেউ যদি ভ্রষ্টতা ও নষ্টামিকেই চিন্তা ও দৃষ্টির পূর্ণতা মনে করে তাহলে এ ধরনের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভোগ করতে হয় তাকেও তা ভোগ করতে হবে।

জীবনের অন্য সবক্ষেত্রের মতো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইসলাম বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিয়েছে। উভয়ের কি ধরনের সম্পর্ক আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ আর কোন্ প্রকারের সম্পর্ক আসমান ও যমীনের মালিকের দৃষ্টিতে অপসন্দীয় ও ঘৃণিত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থতা ও সমূহ ক্ষতির কারণ তা-ও ইসলাম বলে দিয়েছে।

স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের জন্য পরীক্ষা

প্রথম পদক্ষেপেই ইসলাম যৌন আকর্ষণ সম্পর্কে ঘোষণা করে যে, পার্থিব জীবনের এ পরীক্ষাগারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এটি বান্দাকে পরীক্ষা করার একটি উপায় বা মাধ্যম। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অন্তহীন পারস্পরিক আকর্ষণ মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় যেখান থেকে তার সত্যাশ্রয়ী কিংবা প্রবৃত্তি পূজারী হওয়ার সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণ করা যায়। একদিকে আবেগের আতিশয্য তাকে সবরকম বন্ধন ছিন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে আল্লাহভীতি এবং বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবী তাকে

১. বুখারী, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ আসসাদাকাতু বিল ইয়ামীন ; মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ ইখফাউস সাদাকা ; তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহুদ, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফিল হুববি ফিল্লাহ।

www.bjilibrary.com

সীমারেখা মেনে চলতে বাধ্য করে। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ব্যক্তির ঈমানের দাবী পরীক্ষার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। সে তার আকীদা-বিশ্বাস ও সংকল্পে কতোটা সাচ্চা এভাবে তার একটা পরীক্ষাও হয়ে যায়।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা এবং মুসনাদে আহমদ নবী স.-এর এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন ঃ

ما تركت بعدى فتنة اضرّ على الرّجال من النساء.

"আমার পরে পুরুষদের জন্য স্ত্রীলোকের চেয়ে ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা আমি রেখে যাচ্ছি না।"[১]

অপর এক ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন ঃ

ما من صباحٍ الاّ وملكان ينادیان ويلٌ للرّجال من النساء وويل للنّساء من الرّجال.

"প্রত্যহ ভোরে দু'জন ফেরেশতা এ মর্মে ঘোষণা করে যে, পুরুষদের জন্য মেয়েরা এবং মেয়েদের জন্য পুরুষরা ধ্বংসাত্মক।[২]

ব্যভিচারের পরিণাম

এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যে ব্যক্তি পবিত্রতাকে বর্জন করে না এবং আবেগ উত্তেজনার অযৌক্তিক ও বিবেক বর্জিত দাবী যা সরল ও সত্য পথ থেকে ফিরাতে পারে না তার জন্য কামিয়াবী অপেক্ষা করছে।

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ○ - الفرقان : ٦٨

"(তারাই আল্লাহর নেক বান্দা) যারা তাঁর সাথে আর কোনো ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন এমন কোনো প্রাণকে সংগত কারণ ছাড়া বধ করে না। আর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। যে এসব গোনাহর কাজ করবে সে তার গোনাহর পরিণতি অবশ্যই ভোগ করবে।"

—সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৮

---

১. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মা ইউত্তাকা মিন শুউমিল মারআ।

২. ইবনে মাজা, আবওয়াবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনাতুন নিসা; মুসতাদরিক হাকেম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৯। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী খারেজা ইবনে মুসআবকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল ও অবিশ্বাস যোগ্য ঘোষণা করেছেন। তবে মুহাদ্দিস ইবনে আবী হাতেমের সিদ্ধান্ত এতো কঠোর নয়। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া হাদীসটির সনদের একটি বর্ণনা পরম্পরার সমালোচনা করেছেন এবং অন্যগুলোকে বিশুদ্ধ মনে করেছেন। এখানে উল্লেখিত হাদীসটি পরিত্যক্ত সনদে বর্ণিত নয়। দেখুন, তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে ৭৮।

www.bjilibrary.com

عن ابى سعيد رض قال قال رسول الله ﷺ الدُّنيا حلوةٌ خضرةٌ وَانَّ الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتَّقوا الدنْيا وَاتَّقُوا النِّسَاء فانَّ اوَّل فتنة بنى اسرائيل كانت فى النِّسَاء.

"আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ এ পৃথিবী একটি মিষ্টি ও তরতাজা বস্তু। আল্লাহ তোমাদের এ স্বাদ ও গন্ধময় পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করতে যাচ্ছেন। অতএব তোমরা দুনিয়ার বৈচিত্রের মোহ থেকে দূরে থাকো এবং নারীদের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি বনী ইসরাঈলদের সর্বপ্রথম পরীক্ষা হয়েছিল নারীদের মাধ্যমে।"[১]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, দুনিয়ার খেলাফতের ব্যাপক এখতিয়ার সেসব মহত কর্মশীল এবং নেককার আল্লাহর বান্দাদের হাতে সোপর্দ করা হয় যাদেরকে এসব এখতিয়ার দুনিয়ার ভোগ, লালসা এবং আরাম-আয়েশের মধ্যে নিমজ্জিত করতে পারে না। বিশেষ করে যারা হয় পবিত্রতার রক্ষক, যাদের ফেরেশতার ন্যায় নিষ্কলুষ জীবন পবিত্রতার মানদণ্ড বলে বিবেচিত। কিন্তু যে জাতির জীবন এ মহামূল্যবান বস্তু থেকে মুক্ত তাকে আল্লাহ তাআলা এ মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন। দেখে উপদেশ গ্রহণ করার মতো চক্ষু থাকলে অতীত জাতিসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে যে, প্রবৃত্তি পূজার কারণে কিভাবে তাদেরকে খিলাফতের পদমর্যাদা থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

পবিত্রতার পুরস্কার

প্রশ্ন হলো, কিভাবে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে ? এ প্রশ্নের জবাব আরো একটি প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে নিহিত। সে প্রশ্নটি হলো, মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় কেন ? এর দুটি মাত্র কারণ আছে। একটি হলো সে ব্যভিচারের মধ্যে তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করে। এতে তার আবেগ উত্তেজনা ও কামনা বাসনা তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। দ্বিতীয় কারণ হলো, সে পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপন করতে পারে না, তাই ব্যভিচার করতে বাধ্য হয়। এ বাধ্যবাধকতা পরিবেশ বা সমাজের সৃষ্টি হতে পারে কিংবা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের সৃষ্টি হতে পারে। অথবা তা শিক্ষা বা সভ্যতা সংস্কৃতির সৃষ্টিও হতে পারে। যতোদিন পর্যন্ত এ দুটি উৎস ও কার্যকারণ বন্ধ করা না হবে ততোদিন পবিত্রতার ক্ষেত্র নিরাপদ হতে পারে না।

১. মুসলিম ; ইবনে মাজা, আবওয়াবুল ফিতান, তবে ফা-ইন্না আউয়ালা ফিতনাতা ... থেকে শেষ অংশটুকুর উল্লেখ নেই।

www.bjilibrary.com

অতএব, ব্যভিচার ও তার বিষময় ফলাফল থেকে বাঁচতে হলে দুটি জিনিস অত্যন্ত জরুরী। প্রথমত, মানুষের চোখে গোনাহর বৈচিত্র ও নতুনত্ব ফিঁকে এবং আকর্ষণহীন হওয়া। দ্বিতীয়ত, তার সামনে সঠিক পথ খোলা থাকা। যাতে সে আবেগ-উত্তেজনার মোকাবিলায় নিরস্ত্র হয়ে না পড়ে। আর সঠিক পথগুলোতেও এতোটা আকর্ষণ ও বৈচিত্র সৃষ্টি করতে হবে যে, তার জন্য অবৈধ পথের দিকে তাকানোর প্রয়োজন না পড়ে।

ইসলাম গোনাহর কাজকে আকর্ষণহীন করার জন্য এমন একটি জীবনের ধারণা পেশ করেছে যা এ জীবনের চেয়ে অধিক বৈচিত্রময় ও অনেক বেশী আকর্ষণীয়। যে জীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগ সামগ্রী প্রচুর ও অফুরন্ত।

ইসলাম একদিকে মানুষকে ব্যভিচার ও কুকর্ম থেকে বিরত রাখে অন্যদিকে এমন সব সুন্দরী ও সুঠামদেহী অপ্সরীতুল্য কুমারী নারীর প্রতিশ্রুতি দেয় কল্পনা শক্তিও যাদের রূপ-যৌবনের চিন্তা ও কল্পনা পর্যন্ত করতে সক্ষম নয়। রূপ ও যৌবনের এ অনন্ত ঝলক গোনাহর আকর্ষণকে নিষ্প্রভ করে দেয় এবং আনন্দ ও ফূর্তির চিরস্থায়ী ব্যবস্থার বিশ্বাস দুনিয়ার অস্থায়ী আনন্দের ব্যবস্থাকে স্বাদহীন করে তোলে। জীবনের সেই উজ্জ্বল দিকের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের মধ্যে এমন এক আকাঙ্ক্ষা ও অস্থিরতার সৃষ্টি করে যে, সে এটিকেই তার চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নেয়।

বিয়ের উদ্দেশ্য

ব্যভিচারের দ্বিতীয় কারণ ও উৎস ধ্বংস করার জন্য ইসলাম বৈধ পন্থাগুলোকে একেবারেই সহজসাধ্য করে দিয়েছে। তা অবলম্বন করার জন্য ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে চরমভাবে উৎসাহিত করে যাতে ব্যক্তি নিজেকে গোনাহর কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্য এ নয় যে, বাড়ীতে একজন রক্ষিতা থাকবে। বরং ইসলাম বিয়েকে উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং পবিত্রতা সংরক্ষণের উপায় বলে মনে করে। এ বিষয়টিকেই কুরআন মজীদ অলংকারপূর্ণ ভাষায় পেশ করেছে ঃ

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ .... مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ.

"ব্যভিচারী নয়, বরং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধকারী, পুরুষ ব্যভিচারিণী নয় .... বরং বিবাহ বন্ধনের ছত্রছায়ায় সুরক্ষিতা নারী।"

–সূরা মায়েদা ঃ ৫, সূরা আন নিসা ঃ ২৫

এ আয়াত দু'টিতে ব্যবহৃত احصان ও اسفاح শব্দ দু'টির দ্বারা কুরআন মজীদর বিয়ের মূল লক্ষ স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছে। শব্দটি দ্বারা ঢেলে ফেলে দেয়া বা প্রবাহিত করার অর্থও বুঝায়। এ জন্য বলা হয় ঃ

لانَّـه كان عن غير عقد كانَّـه بـمـنزلـة الـماء الَّذِى لايـحبسـهُ شيْءٌ.

"কারণ, তা বিবাহ বন্ধন ছাড়াই হয়ে থাকে। সুতরাং তা এমন পানির মতো যা ধরে রাখার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই।"[১]

অবাধ যৌন সম্ভোগ প্রবাহিত পানির স্রোতের ন্যায়, যার সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। এ কারণে জুয়ার যে তীরে কোনো কিছু লাভ করা যায় না এবং প্রতিযোগিতায় যার কোনো মূল্য নেই তাকে আস-সাফীহ বা বেকার তীর বলে।

এ থেকে জানা গেল, ইসলামী শরীআত ব্যভিচার নিষিদ্ধ এবং বিবাহ বৈধ করার মাধ্যমে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। প্রথমটি হলো, ব্যক্তি যেন তার যৌন চাহিদা পূরণের জন্য লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারী না হয়, বরং সীমারেখা মেনে চলে। দ্বিতীয়টি হলো, সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এ বাধ্যবাধকতা যেন উপকারী ও কার্যকরী হয়। কুরআন বিয়ে বুঝাতে দ্বিতীয় যে শব্দটি ব্যবহার করেছে তা হলো হিসন। হিসন শব্দের অর্থ হলো সুরক্ষিত দূর্গ, উত্তম জাতের ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। এসব অর্থ ইংগিত দেয় যে, বিবাহের মাধ্যমে ব্যক্তি হারাম পথসমূহ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। সে এমন সব হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে যায় যার সাহায্যে যৌন উন্মাদনামূলক সবরকম অবাঞ্ছিত আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। নবী স. এ বিষয়টিই নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

اذا احـدكـم اعـجـبتـه الـمـرأة فـوقـعـت فى قـلـبـه فـلـيـعـمـد الـى امـرأتـه فـلـيـوقـعـها فـانَّ ذالـك يـردّما فى نفسـه.

"তোমাদের কারো কাছে যদি কোনো নারী পসন্দনীয় বলে মনে হয় এবং তাতে তার মন প্রভাবিত হয় তাহলে তার উচিত নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং তার সাথে মিলিত হওয়া। এভাবে তার মনের কামনা-বাসনা তৃপ্ত ও প্রশমিত হবে।"[২]

এ হাদীস আমাদের শিক্ষা দেয়, একজন ঈমানদার কি উদ্দেশ্যে বিয়ে করে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে কোন্ মহান কল্যাণ সে অর্জন করতে চায় ? আর কুমার জীবনের এমন কি বিপদ আছে প্রতি মুহূর্তে যার আশংকায় আশংকিত থাকতে হয়।

---

১. লিসানুল আরব سفح শব্দ।
২. মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ ; তিরমিযী, আবওয়াবুর রাদা

www.bjilibrary.com

লক্ষ অর্জনের জন্য স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা

এ কারণে ইসলামী শরীআত স্বামী স্ত্রীর কাছে জোরালো দাবী জানায় যে, তারা যেন এ লক্ষ অর্জনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে এবং এমন কোনো আচরণ বা নীতি গ্রহণ না করে যা সতীত্ব ও সম্ভ্রমহানীর কারণ হতে পারে।

عن ابى هريرة رض قال قال رسول اللّه ﷺ اذا دعا الرّجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملئكة حتى تصبح.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মিলনের জন্য আহ্বান জানালে স্ত্রী যদি সাড়া না দেয় আর এ কারণে সে যদি সারা রাত তার প্রতি রাগান্বিত থাকে, তাহলে ফেরেশতারা ভোর পর্যন্ত সেই স্ত্রীকে লা'নত করতে থাকে।"[১]

অন্য এক অবস্থা সম্পর্কে নবী স. বলেছেন ঃ

اذا الرّجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التّنور

"কেউ যদি স্ত্রীকে সহবাসের জন্য আহ্বান জানায়, আর স্ত্রী যদি সেই সময় খাবার পাকাতে ব্যস্ত থাকে তবুও সে তৎক্ষণাৎ স্বামীর ডাকে সাড়া দিবে।"[২]

ইসলাম নারীর কাছেই শুধু এ দাবী করে না। বরং নারীর আবেগকে পরিতৃপ্ত করার জন্য পুরুষকেও নির্দেশ দেয়। এর অন্যথা হলে সে একটি বড় অধিকার আদায় না করার অপরাধে অপরাধী হবে।

আবদুর রহমান আল জাযরী বলেন ঃ

وتحتم على الرجل ان يعفها بقدر ما يستطع كما تحتم عليها ان تطيعه فى ما يامرهابه من استمتاع الا لعذر صحيح.

"চারটি ফিকহী মাযহাবের আইনই পুরুষের জন্য এ বিষয়টি আবশ্যকীয় করে দেয় যে, সে তার সাধ্যানুসারে নারীকে পবিত্র রাখবে। অনুরূপভাবে এ বিষয়টি নারীর জন্য আবশ্যকীয় ঘোষণা করেছে যে, স্বামী যদি তার কাছে পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায় তাহলে সে কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া তা প্রত্যাখ্যান করবে না।"[৩]

---

১. বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, বিয়ে অধ্যায়।

২. তিরমিযী, আবওয়াবুর রাদা, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফী হাককিয যাওজে আলাল মারআ ; ওয়া রাওয়া ইবনু মাজা ; ওয়াল বায়হাকী ওয়াল হাকেম।

৩. আল ফিকাহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪।

www.bjilibrary.com

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন ঃ

وَحَصِّنُوْا فروج هذه النساء.

"এসব নারীদের লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখো।"

অর্থাৎ পুরুষদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো, তারা নিজের স্ত্রীর সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং তাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাবে।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ

ويجب على الرّجل ان يّطازوجته بالمعروف وهو من اوكد حقّها عليه اعظم من اطعامها.

"স্বামী স্ত্রীর সাথে অতি উত্তম পন্থায় মিলিত হবে। এটা স্ত্রীর সর্বাপেক্ষা বড় অধিকার। এমন কি ভরণ পোষণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।"[১]

জাহেলী যুগে আরবে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতো। যেমন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা ও মতানৈক্য দেখা দিলে স্বামী স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার জন্য তাকে বলতো, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো হারাম। এভাবে তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করতো। (একে যিহার বলা হয়) অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের দাবী অনুসারে কাজ না করার শপথ করতো (একে 'ঈলা' বলা হয়)।

এভাবে স্ত্রী বেচারী স্বামী থাকা সত্ত্বেও স্বামীহীনা হয়ে পড়তো এবং নিজের যৌন চাহিদা পূরণের জন্য ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ছাড়া তার সামনে আর কোনো উপায়ই থাকতো না।

প্রথম পন্থাটি ইসলামের মেজাজের সাথে সাংঘর্ষিক। এ জন্য ইসলাম এটিকে হারাম ঘোষণা করেছে। কারণ, স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকেই পরস্পরের জন্য পবিত্রতার উপায়। এমতাবস্থায় কেউ যদি স্ত্রীকে মা এবং বোনের মর্যাদা দিয়ে বসে এবং যে বাঁধ পবিত্রতা ও সম্ভ্রমের লুটেরাদের প্রতিরোধ করে তা ভেঙ্গে দেয় তাহলে সেটা হবে মারাত্মক এক মূর্খতা।

সুতরাং কুরআন মজীদ 'যিহারের' ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে স্ত্রী স্ত্রীই থাকবে। তোমাদের অর্থহীন এবং হঠকারী কথাবার্তার কারণে মা হয়ে যাবে না। তোমাদের মুখ যদি এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কথা বলার অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকে তাহলে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দাও। স্ত্রীর সাথে স্বামীর মতো সম্পর্ক বজায় রাখো, তার সন্তান হয়ে যেও না।

২. ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬।

www.bjilibrary.com

"ঈলা'র ক্ষেত্রে ইসলাম স্বামীকে চার মাসের অবকাশ দিয়েছে যাতে স্বামী এ সময়ের মধ্যে এ মর্মে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, স্ত্রীর সাথে তার বনিবনা হবে, না কি হবে না ? এ সময়ের পরেও যদি সে স্ত্রীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আগ্রহী বা উদ্যোগী না হয় তাহলে ধরে নেয়া হবে, সে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছে। তাই এখন থেকে নারী তার অধিকার সংরক্ষণকারী অন্য কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে নেয়ার ব্যাপারে স্বাধীন।[১]

ইসলামী শরীআত এ বিষয়ে তৃতীয় যে মূলনীতিটি একজন স্বামীকে অনুসরণ করতে বলে তা হলো, যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের সেই স্বাভাবিক পথটি অবলম্বন করা যার মাধ্যমে নারীর যৌন চাহিদারও পরিতৃপ্তি হয় এবং প্রবৃত্তির বৈধ দাবীসমূহকে খর্ব করে এমন কোনো পন্থাও তাকে আদৌ গ্রহণ করতে না হয়। শরীআত এ কারণে নারীর সাথেও পায়ুকাম হারাম ঘোষণা করেছে। কারণ, কোনো নীচ ও হীন স্বভাবের মানুষ হয়তো এভাবে তার কামাগ্নি নির্বাপিত করবে। কিন্তু পবিত্র জীবন যাপনের জন্য যে তৃপ্তি দরকার তা থেকে নারী বঞ্চিত থেকে যাবে।

عن ابى هريرة رض قال قال رسول اللّه ﷺ ملعونٌ من اتى امرأةً فى دبرها.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, সে ব্যক্তির ওপর লা'নত যে তার স্ত্রীর সাথে পায়ুকাম করে।"[২]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن ابى هريرة رض عن النّبىّ ﷺ قال لا ينظر اللّه الى رجل جامع امرأة فى دبرها.

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সংগম করে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে দৃষ্টিপাতও করবেন না।"[৩]

এ নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করে ইমাম ইবনে কাইয়েম লিখেছেন ঃ

فللمرأة حقٌّ على الزوج فى الوطئ وطؤها فى دبرها يفوّتُ حقّها ولا

১. দেখুন সূরা মুজাদিলা, আয়াত ১ থেকে ৪ পর্যন্ত এবং সূরা বাকারা, আয়াত ২২৬ ও ২২৭। ফিকাহর যে কোনো বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যেতে পারে।
২. আবুদ দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ ফী জামেয়েন নিকাহ।
৩. ইবনে মাজা, আবওয়াবুন নিকাহ, অনুবাদ ঃ আন নাহি ঈতানিন নিছায়ি ফি আদবারীন।

www.bjilibrary.com

يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها وايضًا فانَّ الدبر لم يتهيّا لهذا العمل ولم يخلق له وانما الَّذِى هئ له الفرج فالعادلون عنه الى الدبر خارجون عن حكمة اللّه وشرعه جميعًا

"স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার হলো, স্বামী স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক ও যথাযথ পন্থায় মিলিত হবে। মলদ্বারে সংগম করার ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর উক্ত অধিকার নষ্ট করে এবং তার প্রকৃতিগত প্রয়োজন পূরণ করে না। এ পন্থায় নারীর লক্ষ ও উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। তাছাড়া নিতম্ব ও মলদ্বার এ জঘন্য কাজের জন্য তৈরী করা হয়নি। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রয়েছে যৌনাঙ্গ। যে ব্যক্তি তার যৌন চাহিদা পূরণের জন্য এ স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করে অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করে সে মহান আল্লাহর কৌশল এবং শরীআতের বিধি-বিধান সবকিছুই লংঘন করছে।"

এ কঠোর নির্দেশ বিনা কারণে দেয়া হয়নি। দাম্পত্য বন্ধন যদি ব্যক্তিকে পবিত্র জীবন যাপনে সাহায্য না করে এবং তাকে অনৈতিকতা ও জঘন্য কাজ থেকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে এ বন্ধন অর্থহীন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এর পরেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে তা আর আশা করা যায় না। এ কারণে শরীআত মনে করে, সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লক্ষ অর্জনের অনুকূল কারণসমূহ

সুতরাং যেসব উপায় ও পন্থা বিয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনে সহায়ক হতে পারে বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে সেসব উপায় ও পন্থা অবলম্বন করতে ইসলামী শরীআত উৎসাহিত করেছে এবং যেসব পথ ও পন্থা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে অবিবাহিতের পর্যায়ে রাখে তা বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যখন ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করি তখন বিস্মিত হতে হয় যে, ইসলামী শরীআত কতো সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে বিয়েকে একটি সুরক্ষিত দূর্গে রূপান্তরিত করেছে।

এখন আমরা এতদসংক্রান্ত কতকগুলো দিকের প্রতি সার্বিকভাবে কিছু ইংগিত করতে চাই ঃ

এক ঃ ভালোবাসা ও মন দেয়া নেয়া যৌন সম্পর্কের প্রাণ স্বরূপ। প্রেম ও ভালোবাসাই এ ফুল বাগানের বসন্ত ঋতু। যে অবস্থা পুরুষকে নারীর জন্য আনন্দ ও খুশীর কারণ এবং নারীকে পুরুষের জন্য হৃদয় মনের প্রশান্তির কারণ বানায় তা প্রেম ও ভালোবাসা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। কোনো

www.bjilibrary.com

নারী ও পুরুষের মধ্যে যদি স্বাভাবিকভাবে মিল মহব্বত ও ভালোবাসা গড়ে ওঠে তাহলে শরীআত তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لم ير للمتحابين مثل النكاح.

"পরস্পরকে ভালোবাসে এমন দু'জন নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই।"[১]

বৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার আগেই প্রেম, ভালোবাসা ও মন দেয়া নেয়া করতে হবে এ হাদীসের উদ্দেশ্য কখনো তা নয়। ইসলামের যে মেজাজ তাতে এরূপ কল্পনা করাও কঠিন। যে জীবন বিধান কোনো বেগানা নারী বা পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকানো পর্যন্ত ঠিক নয় বলে মনে করে তা রূপ, সৌন্দর্য ও প্রেম কাহিনী বলা এবং শোনার অনুমতি কিভাবে দিতে পারে ? এ হাদীসটি আমাদের সামনে দুটি দিক তুলে ধরে। একটি হলো, স্বাভাবিকভাবেই যদি কোথাও ভালোবাসার কারণসমূহ পাওয়া যায় তাহলে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা উচিত। যাতে ভালোবাসার এই কারণ ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয়ে কল্যাণপ্রসূ এবং সুফলদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়টি হলো, মন-মেজাজের ঐক্য ও সাদৃশ্য সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষায় অনেক সহায়ক হয়। কারণ, বৈধ উপায় উপকরণের প্রতি মানুষের যতো অধিক আকর্ষণ থাকবে অবৈধ উপায় উপকরণের প্রতি আকর্ষণ ততোটাই হ্রাস পাবে।

দুই ঃ বৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য শরীআত বয়সের সমতাকেও গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ, বয়সের ব্যবধান বেশী হলে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বিপথগামিতা রোধ করার মতো আকর্ষণ থাকে না।

নীচে বর্ণিত দুটি ঘটনা এ মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রতিই ইংগিত করছে। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু তার যৌবনকালে এক বিধবাকে বিয়ে করলে নবী স. তাঁকে বললেন ঃ

فهلاً جارية تلاعبُها وتلاعبك وتضاحكها ... وتضاحكك.

"তুমি কোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন ? তাহলে সে তোমার সাথে আর তুমি তার সাথে খেলতে ও হাসি তামাসা করতে পারতে।"[২]

কারণ, হতে পারে একজন বিধবা, যার আবেগ উত্তেজনা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়েছে সে একজন যুবকের হৃদয় মনে যে আবেগ উত্তেজনার অগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত তা বরদাশত করতে অক্ষম।

---

১. ইবনে মাজা, আবওয়াবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফী ফাদলিন নিকাহ, মুসতাদরিক হাকেম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬০।

২. বুখারী কিতাবুল নাফাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ 'আওনুল মারআতি যাওজাহা ফী ওয়ালাদিহি।'

www.bjilibrary.com

হযরত আবু বকর রা. ও উমর রা. হযরত ফাতেমা রা.-কে বিয়ে করার জন্য নবী স.-এর কাছে আবেদন জানালে তিনি তাঁদের প্রস্তাব এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, ফাতেমা এখনো ছোট। কিন্তু হযরত আলী রা. এ আবেদন জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং হযরত ফাতেমা রা.-কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বরং বলা হয়েছে যে, নবী স. নিজেই হযরত আলীর সাথে ফাতেমাকে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

এ ঘটনা সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী র. তাঁর সংকলিত হাদীসগ্রন্থ সুনানে নাসায়ীতে অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন এই বলে ঃ

تزوج المرأة مثلها فى السن.

"নারী কর্তৃক সমবয়স্ক পুরুষকে বিয়ে করা," এর অর্থ এটিই উত্তম ও উপযুক্ত ব্যবস্থা।

শরীআত যে উদ্দেশ্যে বিয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে ইমাম নাসায়ীর এ যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন সে উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে তা ফিরিয়ে দেয়ার কোনো যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি না। তবে শরীআতের মহত কোনো উদ্দেশ্য যদি বয়সের পার্থক্য উপেক্ষা করতে বাধ্য করে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।

তিন ঃ এ লক্ষ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শরীআত বেগানা নারীকে দেখার অনুমতি পর্যন্ত দেয় যাতে এ সম্পর্কের প্রতি ব্যক্তির মনের আগ্রহ আকর্ষণ ও উৎসাহ পবিত্র জীবন যাপনের সহায়ক হতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

عن المغيرة بن شعبة رض انه خطب امرأة فقال النبى ﷺ انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما.

"মুগীরা ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত। তিনি এক মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে নবী স. তাকে বললেন ঃ তাকে দেখ। কারণ, দেখাটা উভয়ের মধ্যে মিল মহব্বত সৃষ্টির উত্তম উপায়।"[১]

এটা উভয়ের মধ্যে মিল-মহব্বত সৃষ্টির সর্বোত্তম উপায়, কথাটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, শরীআত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার অত্যন্ত মজবুত সম্পর্ক কামনা করে এবং তাতে আঘাত লাগার মতো কোনো জটিলতা যেন সৃষ্টি না হয় তাও চায়। কারণ, দাম্পত্য জীবনে মতবিরোধ ও ঘৃণা সৃষ্টি

১. তিরমিযী, আবওয়াবুন নিকাহ, মা জায়া ফিন নাযরি ইলাল মাখতুবাহ ; নাসায়ী ; ইবনে মাজা, আবওয়াবুন নিকাহ।

www.bjilibrary.com

হলে সতীত্ব ও পবিত্রতার পরিপন্থী শক্তি সহজেই আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে স্বামীর দুশ্চরিত্রের কারণে স্ত্রী তার সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে আগ্রহী হতো না নবী স. সেসব বিয়ে বাতিল করে দিতেন।

চার ঃ এ আগ্রহ ও আকর্ষণকে বৃদ্ধি করার জন্য ইসলাম দাম্পত্য জীবনে নারীর রূপচর্চা ও সাজগোজকে উত্তম ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। অথচ বেগানা পুরুষের সামনে সাজগোজ ও সৌন্দর্য চর্চা করতে ইসলাম নারীকে আদৌ অনুমতি দেয় না। এর কারণ হলো, প্রথম ক্ষেত্রে ইসলাম যৌন আকর্ষণকে শক্তিশালী করতে চায় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিতে চায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নারীরা স্বামীর উদ্দেশ্যে রূপ ও সৌন্দর্য চর্চা করতো। একটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার হযরত আয়েশা রা. উসমান ইবনে মাযউন রা.-এর স্ত্রীকে দেখলেন তার শরীরে সাজগোজ ও সৌন্দর্য চর্চার কোনো চিহ্নই নেই। অথচ তখনকার দিনে স্বামীর উপস্থিতিতে মেয়েরা সাধারণত সাজসজ্জা করতো। এ অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা রা. তখনই তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ উসমান কি কোথাও সফরে গিয়েছেন ?[১]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী র. বলেন ঃ

واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب الطيب يشعر بانّ ذوات الازواج يحسن من هنّ التّزيّن للازواج بذالك.

"খিযাব তথা সাজসজ্জা না করার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়ে হযরত 'আয়েশার' তাকে জিজ্ঞেস করা থেকে প্রকাশ পায় যে, যেসব মেয়েদের স্বামী বর্তমান, স্বামীর জন্য তাদের সাজসজ্জা ও রূপচর্চা করা অতি পসন্দনীয় ব্যাপার।"[২]

নবী স. বলেছেন, দূরের সফর থেকে ফিরে এসে কারো হঠাৎ বাড়ীতে গিয়ে হাজির হওয়া উচিত নয়। কেননা, তাতে সে স্ত্রীকে এমন অবিন্যস্ত ও অপসন্দনীয় অবস্থায় দেখে ফেলার সম্ভাবনা থাকে যা তার অপসন্দ ও ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে।[৩]

---

১. মুসনাদে আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।
২. নায়লুল আওতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা।
৩. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ তালাবুল ওয়ালাদ ; মুসলিম, কিতাবুর রাদা, অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিহবাবু নিকাহিল বিকরে।

www.bjilibrary.com

হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আমরা বাড়ীতে যেতে উদ্যত হলে তিনি বললেনঃ

امهلوا حتى تدخلو الیلاً ای عشاء لکی تمتشط الشّعثة وتستحدّ المغيبة۔

"এখন বিরত থাকো এবং রাতের বেলা নিজ নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করো। যাতে যে নারী কেশ বিন্যাস করেনি সে কেশ বিন্যাস করে নিতে পারে এবং যার স্বামী অনুপস্থিত ছিল সে গোসল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ পায়।"[১]

পাঁচ ঃ ইসলাম পুরুষের আবেগ অনুভূতির প্রতি যেমন লক্ষ রেখেছে তেমনি নারীর আবেগ অনুভূতির প্রতি মর্যাদা দানের শিক্ষাও দিয়েছে। ইসলাম বিভিন্ন উপায় ও পন্থায় এ সত্য তুলে ধরেছে যে, নারী শুধু ভোগের উপাচার এবং যৌন কামনা পরিতৃপ্ত করার কোনো যন্ত্র কিংবা অনুভূতিহীন কোনো মাংস পিণ্ড নয়, বরং তার হৃদয় মন সূক্ষ্মতম আবেগ-অনুভূতির আবাসস্থল যা অনুরূপ সূক্ষ্ম কাজকর্মের দাবী করে। আচার আচরণের অসামঞ্জস্যতা ও কঠোরতা তার আবেগ অনুভূতির স্বচ্ছ কাঁচকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারে। এরপর সে একটি পাথরে রূপান্তরিত হবে যা ভাঙা যায় কিন্তু তা ছেঁটে কেটে আংটির মূল্যবান পাথর বানানো যায় না যে, পাথরের চাকচিক্য দৃষ্টি ও মনকে আকৃষ্ট করতে পারে এবং গোনাহর মনলোভা দৃশ্যকে আকর্ষণহীন করে দেয়। নবী স. বলেন ঃ

انّ المرأة كالضلع اذا ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها وفيها عوج

"নারী পাঁজরের হাড় সদৃশ। তুমি যদি তা সোজা করার চেষ্টা করো তাহলে ভেঙে ফেলবে। আর তা যেমন আছে তেমনি রেখে দাও তাহলে তা বাঁকা থাকলেও কাজে লাগিয়ে ফায়দা হাসিল করতে পারবে।"[২]

অপর একটি ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন ঃ

لايجلد احدكم امرأته جلد العبد ثمّ يجامعها فى اخر اليوم.

"স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর মতো মারপিট করা এবং দিনের শেষে আবার তার সাথে সহবাস করার মতো আচরণ যেন তোমাদের কেউ না করে।"[৩]

---

১. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ। অনুচ্ছেদ ঃ আল মাদরাতু মা'আন নিসা ; মুসলিম, কিতাবুর রাদা, বাবুল ওসিয়াতু বিন নিসা ; তিরমিযী, আবওয়াবুত তালাক, ভাষা মুসলিমের।

২. ঐ

৩. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মা ইয়াকরিহু মিন দারবিন নিসা।

www.bjilibrary.com

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন ঃ "আমার স্ত্রীর রুচি ও পরিতৃপ্তির জন্য আমি নিজে সাজগোজ করে থাকা পসন্দ করি। ঠিক যেমন আমি চাই সেও আমার জন্য সাজসজ্জা করে সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে থাকুক।"

ছয় ঃ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্র এবং উন্নত আচরণের যে শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, পারস্পরিক যে আকর্ষণ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে তাদের রক্ষা করে, দ্বন্দ্ব-কলহ যেন তাকে ধ্বংস করে না ফেলে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে এমন সব বিষয়েও আগ্রহ দেখিয়েছেন, যা তাকওয়া পরহেজগারী সম্পর্কে সাধারণ ধারণার পরিপন্থী বলে মনে হওয়াটাই বেশী সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কে সজীবতা আসে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

নীচে আমরা এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি। এর গভীরে যে প্রাণশক্তি কাজ করছে প্রত্যেক ব্যক্তিই তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

নবী স. একবার হযরত আয়েশা রা.-কে এগার জন মহিলা সম্পর্কে এক মজার কাহিনী শুনালেন। এগার জন মহিলার অধিকাংশই তাদের যার যার স্বামীর সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করেছিল। কিন্তু একাদশতমা মহিলা (উম্মে যারা') তার স্বামী সম্পর্কে বলেছিলেন, আমি আমার স্বামী আবু যারা'র (যারা'র পিতা) আর কি প্রশংসা করবো ? সে অলংকার দিয়ে আমার কান দুটি ঢেকে দিয়েছে এবং আমার চিকন বাহু দু'খানা মাংসল বানিয়ে দিয়েছে। মোটকথা, আমাকে সুখী ও আনন্দিত করার এতো উপকরণ সে আমাকে দিয়েছে যে, আনন্দ ও খুশীতে আমার জীবন কেটে যাচ্ছে। আমার সুখের কথা আর কি বলবো ? আমি বকরী পালক পরিবারে (নীচু মর্যাদা সম্পন্ন) কষ্টকর জীবন যাপন করছিলাম সে আমাকে ঘোড়া, উট ও ক্ষেত খামারের অধিকারীদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি তার সাথে খোলামেলাভাবে আলাপ করি। কিন্তু সে কখনো আমার কোনো কথায় বাধা দেয়নি। আমি নির্ভয়ে সকাল পর্যন্ত আরাম করি এবং সুস্বাদু খাবার ও পানীয় তৃপ্তিসহ খাই ও পান করি।

এ কাহিনী বলার পর তিনি হযরত আয়েশা রা.-কে বললেন ঃ আয়েশা! আমি তোমার জন্য আবু যারা'র মতো।[১] একবার হযরত আয়েশা রা. নিজের

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী, (কিতাবুন নিকাহ হুসনুল মুআশারাতি মা'আল আহাল); মুসিলম, নাসায়ী এবং আরো অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নবী স. পুরো ঘটনা শুনিয়েছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে, নবী স. শুধু শেষ অংশটুকু শুনিয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার র.-এর ব্যাখ্যা অনুসারে নবী স. নিজে এই পুরো ঘটনা বলেছিলেন। ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

সম্পর্কে নবী স.-এর কাছে একটি সুন্দর উপমা পেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি গাছপালা ও লতাগুল্মে ভরা উপত্যকায় যান তাহলে কি আপনার বকরী পালকে পাতা পল্লবধারী গাছপালার মধ্যে চরাবেন না কি যেসব গাছের পাতা পল্লব জীবজন্তু খেয়ে গিয়েছে সেখানে চরাবেন ? নবী স. জবাব দিলেন ঃ পাতা পল্লবধারী গাছের কাছেই চরাবো।[১] নবী স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশা ছিলেন কুমারী এবং আর সবাই ছিলেন বিধবা। লক্ষ করুন, বাক্যালংকারপূর্ণ এ উপমা-অনুপম হাসি-তামাশা ও সূক্ষ্ম রুচিবোধের কত সুন্দর উদাহরণ।

হযরত আয়েশা রা. বলেন ঃ "এক সফরে আমি এবং নবী স. দৌড়ের পাল্লা দিয়েছিলাম। আমি হালকা পাতলা থাকার কারণে বিজয়ী হয়েছিলাম। এর কিছু দিন পরে আমাদের মধ্যে আবার দৌড়ের পাল্লা হলে আমি পেছনে পড়ে রইলাম। কারণ, তখন আমি বেশ মোটা সোটা হয়ে গিয়েছিলাম। এভাবে আমি পরাজিত হলে নবী স. বললেন ঃ আমি পূর্বের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলাম।"[২]

সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহের একটি বর্ণনা হলো, কোনো এক ঈদে হাবশীরা খেলাধূলা দেখাচ্ছিল। নবী স. নিজে হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি খেলাধূলা দেখবে ? অথবা হযরত আয়েশা রা. নিজেই দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তাঁকে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা রা.-এর কৌতুহল মিটে গেলে তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে এখন তাহলে যাও।[৩]

হযরত আয়েশা রা. বলেন ঃ গোশত ওয়ালা হাড়ডি কিছুটা খেয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা দিতাম। তিনি সেটি ঠিক সে জায়গা থেকে খেতেন যেখান থেকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। অনুরূপ কোনো জিনিস পান করে আমি তাঁর দিকে এগিয়ে দিতাম। তিনি ঠিক সে জায়গায় পবিত্র মুখ লাগিয়ে পান করতেন যেখানে আমি মুখ লাগিয়ে পান করেছিলাম।

এ ধরনের ঘটনাবলী একত্রিত করলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হতে পারে। তবে এ কয়েকটি উদাহরণও সহজেই একথা প্রমাণ করে যে, ইসলাম দাম্পত্য

১. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ নিকাহুল আবকার
২. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯ ; আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ফিস সাবাকি আলার রাজুল।
৩. বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, অনুচ্ছেদ ঃ আল হিরাব ওয়াদ দারাক ইয়াওমাল ঈদ, মুসলিম, কিতাবুল ঈদাইন।

www.bjilibrary.com

জীবনকে কোনো আইনগত বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায় না। বরং তাতে এতটা বৈচিত্র ও সৌন্দর্যময়তা সৃষ্টি করে যে, তা নিজেই একটি আলাদা স্বাদ ও আনন্দের দুনিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং এমন কোনো যৌন আবেদনই নেই দাম্পত্য বন্ধনের সীমার মধ্যে যার ব্যবস্থা ইসলাম করেনি।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ

এসব সত্ত্বেও একথা সত্য যে, যৌন চাহিদা একটি ঝঞ্ঝার মতো। কখন যে তা কর্ম ও চরিত্রের জগতকে উলটপালট করে দেবে তা ঠিক মতো নির্ণয় করাও কঠিন। এ কারণে শরীআত ব্যক্তিকে এমন কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয় যা গোনাহর পথকে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করে দেয় এবং যা কার্যকরী করে মানুষ যৌন কলূষতা থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থান করতে পারে। এ ব্যাপারে কুরআন আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি দান করেছে। তাহলো ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلًا○ - بنى اسرائيل : ٣٢

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। কারণ তাহলো লজ্জাহীনতা এবং জঘন্য পথ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২

চিন্তা করে দেখুন, ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয়ার জন্য কি অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে ? বর্ণনা ভঙ্গি দ্বারা মানুষের মনস্তত্ত্বের এমনসব দিকের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে, যে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করার কারণে বর্তমান যুগ অশ্লীলতার যুগে রূপান্তরিত হয়েছে। কুরআন শুধু ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়ারই নির্দেশ দেয় না, বরং সেসব অবস্থা থেকেও দূরে অবস্থানের নির্দেশ দেয় যা বাহ্যিকভাবে যতো নির্দোষ এবং ক্ষতিহীনই মনে হোক না কেন পরিণামে এ কু-কর্মে লিপ্ত করে দেয়।

আপনি যদি গভীর দৃষ্টিতে মানুষের কাজকর্ম পর্যালোচনা করেন তাহলে তা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল হিসেবে দেখতে পাবেন এবং তাতে এক ধরনের ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনও দেখতে পাবেন। এমনটা কখনো হয় নাই যে, কোনো ব্যক্তি এক লাফেই নেকী ও তাকওয়ার সমস্ত পর্যায়গুলো অতিক্রম করে কিংবা গোনাহর শেষ সীমায় পৌঁছে যায় বরং তার প্রতিটি প্রথম পদক্ষেপ দ্বিতীয় পদক্ষেপের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কার্যকরণ যেভাবে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার ওপর প্রভাব বিস্তার করে তেমনি তার নিজের কাজ ও তার মেজাজ এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে প্রভাবিত করে। এক ব্যক্তি মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে এবং খেয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে। তার এসব কাজ তার আগের ও পরের জীবনের সাথে

www.bjilibrary.com

সম্পর্কহীন নয়। তার মধ্যে অতীতের রেশ ও ভবিষ্যতের রূপরেখা আছে। তা তার পরবর্তী যাত্রা পথের দিক নির্ণয় করে দেয় এবং তা সহায়ক হয়। নেকী বা সৎকর্মের অবস্থাও তাই। তার প্রতিটি মনযিল পরবর্তী মনযিলে উত্তরণ ঘটায় এবং সহজ করে দেয়। মানুষ কোন্ সীমারেখার মধ্যে থেকে তার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে এবং কোন্‌খান থেকে তার ধ্বংসের সীমারেখা শুরু হয় ইসলাম অতি সূক্ষ্মভাবে তা দেখিয়ে দেয়। তাই মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক কাজকর্মকেই কেবল সে নিষিদ্ধ করেনি বরং সেসব পথেও সে বাধা সৃষ্টি করেছে যা ধ্বংসের সূচনা ঘটায় এবং সে পথে গমনকারী জঘন্য পরিণামের মুখোমুখী হওয়া থেকে রক্ষা পায় না।

এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই। আমরা আমাদের বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ কয়েকটি দিক আলোচনা করছি যার ওপর শরীআত বিশেষভাবে জোর দিয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানের ব্যভিচার নানাভাবে হয়, চোখের ব্যভিচার দেখা, পায়ের ব্যভিচার চলা, মনের ব্যভিচার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা করা এবং অবশেষে যৌনাঙ্গ এসব বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদন করে কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে।[১]

এ হাদীসের বক্তব্য অনুসারে গোনাহর কাজে উৎসাহ দানকারী কাজও গোনাহর সমপর্যায়ভুক্ত। এজন্যই যিনা বা ব্যভিচারের প্রাথমিক পদক্ষেপ-সমূহকেও সে যিনা বলেই গণ্য করে। অন্য স্থানে শরীআত তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। আসুন, আমরা এখন তা অধ্যয়ন করে দেখি।

দৃষ্টি আনত রাখা

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। এজন্য সে বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করে। সে দুনিয়ার কোনো জিনিসকেই অসুন্দর ও এলোমেলো দেখতে চায় না বরং সুন্দর ও সৌন্দর্য মণ্ডিত দেখতে চায়। সে রাতদিন প্রকৃতির চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী দেখে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করতে বিরক্ত হয় না। কারণ, তা সুন্দর। তার মধ্যে আছে মনোহারিত্ব ও সৌন্দর্য। সভ্যতা ও তামাদ্দুনের বিভিন্নমুখী বহিপ্রকাশে এ রুচিবোধই দীপ্যমান।

---

১. ইমাম আবু দাউদ র. এ হাদীসের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন আমরা সবগুলো অংশ যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে তার অনুবাদ করেছি। কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ ইউমারু বিহি মিন গাদদিল বাছার। মুসলিমে এ পুরো হাদীসটি একই সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এর বেশীর ভাগ অংশ বুখারীতেও বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

মানুষের এ রুচিবোধ নিঃসন্দেহে প্রকৃতিগত। এর পূর্ণতা সাধন না করা মানবতার প্রতি জুলুমের নামান্তর। কার্যকর ও ফলদায়ী এ রুচিবোধকে ধ্বংস করার পর দুনিয়া তাহযীব তামাদ্দুনের এমন অসংখ্য কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে যা দ্বারা আজ তা সমৃদ্ধ। কিন্তু সৌন্দর্যপ্রিয়তার এ প্রবণতা ততোক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণকর ও উপকারী থাকতে পারে যতোক্ষণ পর্যন্ত তা মধ্যপন্থার সীমারেখা অতিক্রম করে না। তার ভারসাম্যহীনতা সভ্যতার ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ভারসাম্যহীনতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো যৌন আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

কিন্তু পার্থক্য এই যে, বিপরীত লিংগের কোনো সুন্দর গাল যত দ্রুত মানুষকে বিপথগামী করতে সক্ষম রূপ ও সৌন্দর্যের আর কোনো কিছুই ততো দ্রুত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে না। এর একটি কারণ স্বয়ং মানুষের গঠনাকৃতির সৌন্দর্য। মানুষ এতো সুবিন্যস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং যথোপযুক্ত দেহ কাঠামোর অধিকারী যে, গোটা পৃথিবীতে এর আর কোনো উদাহরণ নেই। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, বিপরীত লিংগের মানুষটি তার দেহ কাঠামোর সুবিন্যস্ততা এবং গঠন সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মানুষের একটি বড় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির কেন্দ্রবিন্দু এবং সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ অনুভব করে। এ কারণে শরীআত বিপরীত লিংগের মানুষের প্রতি তাকাতে নিষেধ করে। কারণ, ইচ্ছেমত দেখার পর যৌন উচ্ছৃংঙ্খলতা থেকে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

কুরআন মজীদের ঘোষণা হলো ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ○ - النور : ٣٠-٣١

"হে নবী! তুমি ঈমানদার পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য অতিব উত্তম ও পবিত্র ব্যবস্থা। তারা যা করে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা সবই জানেন। আর ঈমানদার নারীদের বলে দাও, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০-৩১

কুরআন মজীদ দৃষ্টি আনত রাখা এবং লজ্জাস্থানের হিফাজতের কথা এক সাথে উল্লেখ করেছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পবিত্রতার জন্য দৃষ্টির পবিত্রতা পূর্বশর্ত।

একথাটিই নবী স. ভিন্ন একটি ভংগিতে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

يا علىّ لاتتبع النظرة فانّ لك الاولى وليست لك الاخرة.

"হে আলী! প্রথমবার তাকানোর পর দ্বিতীয় বার আর তাকাবে না। কারণ, প্রথম (হঠাৎ) দৃষ্টিপাত তোমার। কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করার কোনো অধিকার তোমার নেই।"[১]

অর্থাৎ প্রথমটি অকস্মাত বা হঠাৎ পতিত হওয়া দৃষ্টি। তাই তা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা মোটেই বৈধ নয়। কারণ এটাই শয়তানের তীর। এদ্দ্বারাই সে মর্যাদা ও নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলামঃ যদি কোনো বেগানা নারীর ওপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে কি করতে হবে ? নবী স. বললেন ঃ তখনই দৃষ্টি সরিয়ে নাও।

শরীআত মুহরেম মেয়েদের সাথে মেলামেশার সুযোগ দেয় এ জন্য যে, তাদের সাথে থাকে স্নেহ ও ভালবাসার অনাবিল সম্পর্ক। সেখানে সর্বদা এ আবেগ-অনুভূতিই তরঙ্গায়িত হতে থাকে। কোনো দাইউস যদি স্নেহ ভালোবাসার এ পবিত্র আবেগ অনুভূতিকে যৌন কামনার আগুনে রূপান্তরিত করে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহলে শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম কাজে লিপ্ত হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন ঃ

فلوا نظر الى امه واخته وابنته يتلذّذ بالنظر اليها كما يتكذّذ بالنظر الى وجه المرأة الاجنبية كان معلوماً لكل احدٍ انّ هذا حرامٌ.

"কেউ যদি তার মা, বোন ও মেয়ের দিকে বেগানা নারীর দিকে তাকানোর মতো কামাতুর দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে তা হারাম একথা সবাই জানে।"[২]

শ্রবণ শক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা

দৃষ্টিশক্তির মতো শ্রবণশক্তিও মানুষের আবেগ ও অনুভূতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তা কল্যাণকরও হতে পারে আবার ক্ষতিকরও হতে পারে। যে কোনো আইনের সফলতা হলো লাভ ও ক্ষতির এ সীমারেখাকে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা। ইসলাম তার অনুসারীদের পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে,

১. আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মা ইউমারু বিহি মিন গাদদিল বাসার ; তিরমিযী, আবওয়াবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফী নাযরিল ফাযাআ।

২. ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া, ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

পৃথিবীর গুলবাগিচায় সে যে কোনো সুন্দর গান দ্বারা নিজের শ্রবণ আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। তবে তা যেন যৌন উত্তেজক ও চরিত্র বিধ্বংসী না হয়। কারণ, চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতা মানবতার মুকুট। এজন্য দুনিয়ার যে কোনো আনন্দ ও খুশীকে ত্যাগ করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো প্রকার আয়েশ-আরামের বিনিময়েই তার বিকিকিনি হতে পারে না। এ কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে বাদ্য ও বাদ্য যন্ত্র ব্যবহারের কোনো অবকাশই নেই। গান হারাম হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আমরা এখানে হাফেজ ইবনে জুযীর র. বক্তব্য পেশ করতে পারি ঃ

اعلم انّ سماع الغناء يجمع شيئين احدهما انّه يلهى القلب عن التّفكّر فى عظمة اللّه سبحانه والقيام بخدمته والثّانى انّه يميله الى الّذّات العاجلة الّتى تدعوا الى استيفائها من جميع الشّهوات الحسّيّة ومعظمها النكاح اليس تمام لذّاته الاّ فى المتجدّدات ولا سبيل الى كثرة المتجدّدات من الحلّ فلذالك يحثّ على الزّنا فبين الغناء والزّنا تناسب من جهة انّ العناء لذّة الرّوح والزّنا اكبر لذّات النّفس ولهذا جاء فى الحديث الغناء رقية الزنا.

"জানা থাকা দরকার যে, গান শোনার দুটি ক্ষতিকর দিক আছে। প্রথমটি হলো, গান মানুষকে আল্লাহর মহত্ত্বের চিন্তা ও অধিকারসমূহ আদায় করা থেকে গাফেল করে দেয়। গানের দ্বিতীয় ক্ষতিকর দিক হলো তা মানুষকে পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট করে। আর এটা তাকে সমস্ত বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধ্য করে। এসব আকাঙ্ক্ষার শীর্ষে অবস্থান করছে যৌন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু নিত্য নতুন সম্পর্ক ছাড়া যৌন আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। এটা জানা কথা যে, বৈধ সীমার মধ্যে এ ধরনের নিত্য নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির আদৌ কোনো অবকাশ নেই। অতএব গান এভাবে মানুষকে ব্যভিচারে উৎসাহিত করে। সুতরাং গান ও ব্যভিচারের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। গান মনের তৃপ্তি আর ব্যভিচার প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি। এজন্য হাদীসে আছে, মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করার ব্যাপারে গান যাদুর মতো কার্যকরী।"[১]

জবানের হিফাজত বা বাক সংযম

কথাবার্তা বলার ব্যাপারে মানুষ অত্যন্ত অসতর্ক। অথচ আমাদের মুখ থেকে যেসব কথা বের হয় তা শূন্যে মিলিয়ে যায় না বরং আমাদের

১. নাকদুল ইলম ওয়াল উলামা, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার ওপর প্রতিফলিত হয়। বাকশক্তির এ প্রভাব শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির প্রভাবের চেয়েও বেশী ব্যাপকতা ও গভীরতা রাখে। কারণ, যা আপনার জন্য সুদৃশ্য এবং সুশ্রাব্য তা নিজেও কোনো প্রভাব গ্রহণ করবে এমনটা জরুরী নয়। পক্ষান্তরে তার বাকশক্তি ধ্যান-ধারণা ও মতামত প্রকাশের এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে মানুষ তার ভাল বা মন্দ ধ্যান-ধারণার প্রভাব তার শ্রোতার ওপর ফেলতে চেষ্টা করে। এ চেষ্টার ফলে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া যদি তার অনুকূলে হয় তাহলে তার ধ্যান-ধারণা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তা ব্যক্তিগত গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করে। আর সে অনুপাতে তার শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভেবে দেখুন, যদি এ বিরাট শক্তি সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং আবেগ অনুভূতির মতো সূক্ষ্ম এবং দুর্বল ক্ষেত্রসমূহে আঘাত হানে তাহলে কি মারাত্মক ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে।

عن سهل بن سعد رض عن رسول الله ﷺ قال من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة.

"সাহল ইবনে সা'দ রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাজতের নিশ্চয়তা দিতে পারবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।"[১]

আর এক ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন ঃ

من وقاه الله شرما بين لحييه وشرما بين رجليه دخل الجنة.

"আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে জিহবা এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২]

পোশাকের গুরুত্ব

উলঙ্গপনা এ যুগের এক ফিতনা যা মানুষের আবেগ ও অনুভূতির জগতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং মানুষকে যৌনতা ও কুপ্রবৃত্তির পেছনে উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছে। নারী ও পুরুষ এমনিতেই তার বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। উলঙ্গপনা এ আকর্ষণকে এত তীব্রতা দান করে যে, মানুষের জন্য গোনাহ থেকে দূরে থাকা অসম্ভব হয়ে যায়। এ জন্য প্রকৃতির দাবী হলো, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের এ চালিকা শক্তিকে ধ্বংস করা হোক। প্রকৃতির এ দাবীর কারণেই মানুষ পোশাকের ব্যবস্থা করেছে।

---

১. বুখারী, কিতাবুর রিকাক ; অনুচ্ছেদ ঃ হিফযুল লিসান, তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহদ, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফী হিফযিল লিসান।

২. তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহদ।

www.bjilibrary.com

কিন্তু নতুন এ সভ্যতার মতে উন্নতি ও প্রগতি হলো, সতীত্ব ও পবিত্রতার ধারণার সাথে পর্যন্ত মানুষের কোনো পরিচয় থাকবে না। এ ধরনের উন্নতির পথে পোশাক যেহেতু একটি বড় বাধা, এজন্য সে তা খুলে দূরে নিক্ষেপ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার হারাম। সে মানুষকে এ অপরাধ থেকে বিরত রাখতে চায়। তাই সে গোনাহর এ প্রতিবন্ধক শক্তিকে আরো শক্তিশালী করতে চায়। তাই ইসলাম বিশদভাবে নারী ও পুরুষের 'সতরে'র সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলতে উভয়কে নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলাম উলঙ্গপনাকে কতোটা ধ্বংসাত্মক মনে করে তা আপনারা একটি হাদীস থেকে অনুমান করতে পারবেন ঃ

عن عائشة رض قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول ايما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيت زوجها هتكت سترما بينها وبين ربّها.

"হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী তার স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘরে পরিধেয় বস্ত্র খোলে সে তার ও তার রবের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে।"[১]

বেগানা নারীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত নিষিদ্ধ

সতীত্ব ও পবিত্রতার হিফাজতের পথে আরো একটি পর্যায় আসে যা খিয়ানতের দৃষ্টিতে দেখা, যৌন উত্তেজক সংগীত, অশ্লীল বাক্যালাপ এবং উলঙ্গপনা থেকেও ভয়ানক। সেটি হলো নারী পুরুষের নির্জনে সাক্ষাত, যখন উভয়ের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক পর্দা বা আড়ালও থাকে না। এরূপ পরিস্থিতিতে এমন কোনো বাহ্যিক চাপ থাকে না যা মানুষকে আবেগ-উত্তেজনার কাছে পরাভূত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

মানুষের এ দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে বেগানা নারী পুরুষের নির্জনে দেখা সাক্ষাত ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

عن جابر رض عن النبىّ ﷺ قال لاتلجوا على المغيبات فانّ الشّيطان يجرى من احدكم مجرى الدّم.

"হযরত জাবের রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, যেসব মেয়েদের সাথে মুহরেম পুরুষ নেই তাদের কাছে যেও না। কারণ, মানুষের শরীরে রক্ত যেমন চলাচল করে

১. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

শয়তানও তেমনি মানুষের শরীরে মিশে যেতে পারে। (কখন যে সে মানুষকে গোনাহর চোরাবালিতে আটকিয়ে ফেলবে তা কেউ জানে না।)"

মানুষকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ বানাতে এবং গোনাহ্ থেকে রক্ষা করতে শরীআত যেসব বিধি-নিষেধ তার ওপর আরোপ করেছে আরো অনেক শিরোনামের অধীনে তার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে তা ওপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার মধ্যে এসে যায় সে জন্য এখানে তার স্বতন্ত্র আলোচনা পরিহার করা হচ্ছে। এখন আমাদের দেখতে হবে ব্যক্তির গঠন প্রশিক্ষণের সাথে সাথে ইসলাম সমাজ সংস্কারের জন্য এমন কী পদ্ধতি অবলম্বন করে যা থেকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনে সহায়তা পাওয়া যায়।

❐

www.bjilibrary.com

সমাজ সংস্কার

প্রত্যেক সমাজেরই কিছু মৌলিক দাবী থাকে যা পূরণ করা সমাজের ব্যক্তিদের জন্য অপরিহার্য। এসব দাবী উপেক্ষা করা বা তার বিরোধিতা করা কোনো সমাজই বরদাশত করতে পারে না। কারণ, ঐসব দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। কোনো সমাজ যদি এসব দাবী পরিত্যাগ করে কিংবা জনগণকে তার অনুগত করতে না পারে তাহলে তার অস্তিত্বই মুছে যায়।

ইসলামী সমাজেরও কিছু মৌলিক দাবী আছে যা পূরণ করা তার প্রত্যেক অনুসারীর অবশ্য কর্তব্য। কুরআন মজীদ এসব দাবীকে বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরেছে। এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○- الممتحنة : ١٢

"হে নবী ! ঈমানদার নারীরা যখন এ মর্মে তোমার কাছে বাইয়াত হতে চায় যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জেনে শুনে কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করবে না এবং কোনো ভাল কাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তুমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো। আর আল্লাহর কাছে তাদের গোনাহ মাফ করার জন্য প্রার্থনা করো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

–সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ১২

এসব হুকুম আহকাম নারীদের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণ হলো, যে সময় মদীনায় ইসলামী সমাজ নির্মাণের কাজ চলছিলো সে সময় সুদূর প্রসারী কিছু লক্ষ সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্র মক্কাবাসীদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলো। চুক্তি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কুরাইশদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের কোনো পুরুষকে আশ্রয় দিবে না। তাই আইনগতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কেবল সেসব মেয়েদেরই আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেয়ার অধিকারী ছিল যারা তার শাসনাধীনে থাকতে আগ্রহী ছিল। এ পটভূমিতে কুরআন মজীদ সেসব শর্তের

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা দান করেছে যা অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরই কেবল কোনো নারী ইসলামী সমাজের অঙ্গীভূত হতে পারে। এ বিশেষ পটভূমির কথা বাদ দিলে এগুলো ইসলামী সমাজের এমন সব দাবী কোনো অবস্থাতেই পুরুষরা যার গণ্ডির বাইরে নয়।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. বলেন ঃ

اخذ علينا رسول اللّه ﷺ كما اخذ على النّساء ان لأنشرك باللّه شيئًا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل اولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে মেয়েদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন আমাদের থেকেও ঠিক তেমনি ওয়াদা নিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমরা যেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করি, চুরি না করি, যিনা না করি, আমাদের সন্তানদের হত্যা না করি এবং একজন অন্যজনের ওপর অপবাদ আরোপ না করি।"[১]

এসব প্রতিশ্রুতি বা শপথনামা দেখে যে কেউ অনায়াসে বলতে পারবে ইসলামী সমাজ কাকে বলে ? তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ ও উদ্দেশ্য কি ? মানবতার কাফেলাকে সে কোন পথে নিয়ে যেতে চায় ? এবং এর সমাজ পরিবেশে কোন ধরনের ব্যক্তিবর্গ বেড়ে উঠতে পারে ? কারণ, সমাজই ব্যক্তির তৎপরতার ক্ষেত্র সরবরাহ করে এবং ব্যক্তি তার সমস্ত চেষ্টা-সাধনাকে নিজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য। সে এর বাইরে পা রাখতে চাইলে সমাজের শক্তিসমূহ তার সাথে সহযোগিতা করতে শুধু অস্বীকৃতিই জানায় না বরং এ পথে তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে সমাজ যে রূপ ধ্যান-ধারণা ও আবেগ অনুভূতির ধারক ও বাহক হবে অনুরূপ চরিত্রই সেখানে সৃষ্টি হবে। একটি পবিত্র পরিবেশ অপবিত্র ও নোংরা আচার-আচরণ এবং অভ্যাস-সমূহকে নিজ দেহে স্থান দিতে পারে না। আবার পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা কোনো সমাজ কোনো চরিত্রবান লোককে বরদাশত করতে পারে না।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

১. মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ ঃ আল হুদুদ কাফফারাতুন লি আহলিহা।

www.bjilibrary.com

"হে নবী! তুমি এসব লোকদেরকে লূতের কাহিনী শোনাও। যখন সে তার কওমকে বললো ঃ তোমরা চরম অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার কাজ করছো। তোমাদের পূর্বে আর কেউ-ই এ জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়নি। তোমরা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য মেয়েদের কাছে না গিয়ে পুরুষদের কাছে যাও। প্রকৃতপক্ষে তোমরা সীমালংঘনকারী জাতি। একথা শুনে তার কওমের জবাব এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তাদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। তারা তো খুব পবিত্র লোক।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৮০-৮২

অতএব, আপনি যদি প্রবৃত্তি পূজা ও ব্যভিচারকে মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক মনে করেন তাহলে সর্বপ্রথম আপনাকে অপরাধের পৃষ্ঠপোষক বর্তমান সমাজ পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং এমন পরিবেশ তৈরী করতে হবে যেখানে পবিত্রতা ও সতীত্ব সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

বর্তমান সমাজের ব্যর্থতার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, তা সমাজের সদস্যদের যে আইন ও বিধি-বিধানের আনুগত্য করাতে চায় নিজেই আবার সে পথের বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ ঃ আমাদের আলোচ্য বিষয়টির কথাই ধরুন। পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে যিনা আজও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা এক কথায় সমস্ত সামাজিক শক্তি সর্বত্র এ আইন ও বিধি-বিধানের অমর্যাদা ও অবমাননা করতে বাধ্য করছে। বর্তমান কালের তাহযীব তামাদ্দুনের কোনো অঙ্গনই আর এমন নেই যেখানে যৌনতা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা জেঁকে বসেনি। অশ্লীল সাহিত্য, লেংটা ছবি, উলংগ পোশাক, নারী-পুরষের অবাধ মেলামেশা, যৌন উত্তেজনাকর নৃত্যগীতের আসর এসব মানুষের পবিত্র ও সৎ জীবন যাপনের সহায়ক উপকরণ না গোনাহর কালিমায় লিপ্ত করার উপকরণ? এ ধরনের নোংরা ও কলুষিত সমাজে সতীত্ব ও পবিত্রতার দাবীই একটি অপরাধ। সমাজ যখন ব্যক্তির ওপর কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করে তখন তা যথাযথভাবে পালনের ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করাও সমাজের অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। অন্যথায় আইনের আনুগত্য দাবী করার কোনো অধিকারই তার থাকে না।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো, আইন দেয়ার আগেই সে এমন পরিবেশ তৈরী করে যেখানে সে আইন চালু হতে পারে এবং সে আইন অনুসারে কাজ করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা এবং সতীত্ব ও পবিত্রতার দাবী করার সাথে সাথে এমন পরিবেশও সৃষ্টি করে যে পরিবেশে গোনাহর বিষ বৃক্ষ শরতের আবহাওয়ায় শুকিয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। যেখানে

www.bjilibrary.com

পবিত্র ও সচ্চরিত্র থাকা অধিকতর সহজ এবং ব্যভিচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকা অধিকতর কঠিন।

কোনো মতবাদ বা আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য সমাজের কাছে তিনটি শক্তি থাকে। চিন্তা ও মতবাদ বা আদর্শিক শক্তি, সামাজিক অনুভূতির শক্তি এবং আইনের শক্তি। ইসলাম সমাজকে চরিত্রবান ও পবিত্র বানানোর জন্য নিজের এসব শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগায়, আসুন এখন আমরা তা বিশ্লেষণ করে দেখি।

মতবাদ বা আদর্শিক শক্তি

কোনো সমাজের সফলতা সেসব মতবাদ ও আদর্শের মধ্যে নিহিত যা সে সমাজকে পরিচালিত করে ও নেতৃত্ব দেয়। মতবাদ ও আদর্শ যদি অন্তঃসারশূন্য ও দুর্বল হয় তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই তার পরিপূরক হতে পারে না। এ পৃথিবী আইন-কানুনের শত শত দলীল দস্তাবেজ তৈরী করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষকে বিপথগামীতা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তার কাছে এমন কোনো শক্তিই নেই যা মানুষকে প্রতি মুহূর্তের জন্য আইনের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পারে।

ইসলাম এমন মতবাদ পেশ করে যা মানুষের সংকল্প ও কাজের ওপর রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় কর্তৃত্ব করে। জীবনের এমন একটি মুহূর্তও নেই যখন তার কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ○ - الانعام :١٢٠

"গোপন ও প্রকাশ্য সবরকম গোনাহর কাজ পরিত্যগ করো। যারা গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়, অচিরেই তাদেরকে এ কুকর্মের শাস্তি দেয়া হবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১২০

আরেকটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ - الاعراف : ٣٣

"হে নবী! বলে দাও, আমার রব প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব রকম অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার কাজ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩৩

গোনাহ ও অশ্লীলতার প্রকাশ যে রঙে এবং যে ঢঙেই ঘটুক না কেন তার বৈধতার কোনো সনদ ইসলামের পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে না। কারণ, ইসলাম যেভাবে ব্যক্তির প্রশিক্ষণ এবং সমাজের বিনির্মাণ ও পুনর্গঠন চায় তাতে

www.bjilibrary.com

গোনাহর কোনো অবকাশ নেই। ইসলাম কোনো পশুচারণ ক্ষেত্র তৈরী করতে চায়না যেখানে সর্বত্র মানুষ নামের পশু চরে বেড়াবে এবং যথেচ্ছা যৌনাচারে লিপ্ত হবে। বরং ইসলাম মানুষের এমন একটি জনপদ গড়ে তুলতে চায় যা হবে মানবতা, শিষ্টাচার ও নৈতিক চরিত্রের লালন ক্ষেত্র। যা উত্তম গুণাবলী এবং পবিত্র চরিত্র ও কর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে এবং তাকে লালন করবে। ইসলাম মানুষকে মানবতার হাতে ঢেলে গড়ে তোলে যাতে তার প্রতিটি পদচিহ্ন কর্মের পবিত্রতা ও উত্তম চরিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে। তার পবিত্র শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে রূহ সমৃদ্ধি এবং অনুভূতি পরিচ্ছন্নতা লাভ করে। আর এ মহত চরিত্রের কারণে সমাজ সতীত্ব ও পবিত্রতার রক্ষকে পরিণত হয়।

عن سليمان بن بريدة رض عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امّهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين فى اهله فيخونه فيهم الاوقف له يوم القيامة فياخذ من عمله ما شاء فما ظنكم.

"সুলায়মান ইবনে বুরায়দা রা. তার পিতা বুরায়দা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে না গিয়ে বাড়ীতে অবস্থান করে তাদের কাছে মুজাহিদদের স্ত্রী, মায়ের মতো সম্মানিতা। যুদ্ধে না গিয়ে যে মুজাহিদের স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের মধ্যে অবস্থান করে খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে কিয়ামতের দিন সেই বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে উক্ত মুজাহিদের সামনে দাঁড় করানো হবে। আর সে যতটা ইচ্ছা তার নেক কাজ নিয়ে নেবে। চিন্তা করে দেখো, সে সময় উক্ত অপরাধীর অবস্থা কেমন হবে ?"[১]

عن زيد بن خالد رض انّ رسول الله ﷺ قال من جهّز غازيًا فى سبيل الله فقد غزاو من خلف غازيًا فى سبيل الله بخير فقدغزا ـ

"যায়েদ ইবনে খালেদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো জিহাদকারীকে যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত করে দিল সে যেনো আল্লাহর পথে জিহাদ করলো। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনের উত্তম রূপে তত্ত্বাবধান করলো সেও আল্লাহর পথে জিহাদ করলো।"[২]

---

১. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, অনুচ্ছেদ ঃ হুরমাতু নিসাইল মুজাহিদীনা ওয়া ইসমু মান খানাহুম ; আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ফী হুরমাতি নিসাইল মুজাহিদীন।
২. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ফাদলু মান জাহ্হাযা গাযিয়ান আও খাল্লাফাহু বিখাইরিন ; মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, অনুচ্ছেদ ঃ ফাদলু ইয়ানাতুন গাযী....।

www.bjilibrary.com

নৈতিক চরিত্রের মূল্য ও মর্যাদা

একথা স্পষ্ট যে, এ ধরনের শিষ্ট ধ্যান-ধারণা এবং পবিত্র অনুভূতির ওপর যে সমাজের ভিত্তি সে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের মূল্য ও মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। পবিত্রতা আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্রের মতো উন্নত গুণাবলী শুধু ওয়ায়েজদের অসহায় ওয়াজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তার মধ্যে আইন ও রাজনীতির শক্তি সৃষ্টি হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নৈতিক গুণাবলীকে নিজের সম্ভ্রম ও মর্যাদার পুঁজি মনে করবে। আর সমাজে মর্যাদা ও গৌরবের সাথে থাকার জন্য ব্যক্তি ওগুলোকে নিজের জান, মাল এবং বংশ ও গোত্রের মতো হিফাজত করবে।

ইসলামী সমাজ ব্যক্তির পবিত্রতার আবেগ অনুভূতিকে অত্যন্ত মর্যাদা দান করে এবং তাকে এতো গুরুত্ব দেয় যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. লিখেছেন ঃ

ومن طلب منه الفجور كان عليه ان يدفع الصّائل عليه فان لّم يندفع الاّ بالقتل كان له ذالك باتّفاق الفقهاء

"যদি কোনো ব্যক্তিকে জোর পূর্বক চরিত্রহীনতার কাজ করতে বলা হয় তাহলে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা তার জন্য জরুরী। এতে যদি সে বিরত হয় তাহলে ভালো। আর হত্যা ছাড়া যদি তাকে প্রতিহত করা না যায় তাহলে এক্ষেত্রে সমস্ত ফকীহদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো, তাকে হত্যা করার অধিকারও সে ব্যক্তির আছে।"[১]

ইসলাম ব্যক্তির এ পবিত্র আবেগ তার স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করে। এর অবমাননা কোনো অবস্থাতেই বরদাশত করা যেতে পারে না। আর তাকে আহত করার যে কোনো প্রচেষ্টা ইসলামী সমাজের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কারণে ইসলামী সমাজ কাউকে অন্যের সম্ভ্রমহানি করার এবং তার নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার অধিকার দেয় না। কারণ, অপবাদ আরোপকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্রের ওপর শুধু হামলা করে না বরং সমাজে তার সম্মানজনক অবস্থানকেও বিপন্ন করে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ - النور : ٤

"যেসব লোক সতীসাধ্বী স্ত্রীলোকদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় কিন্তু চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারে না তাদেরকে আশিটি কোঁড়া মার। আর তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। এসব লোকই হলো ফাসেক।"

–সূরা আন নূর ঃ ৪

১. মুখতারাতুন ইলমিয়া, ১৭৩ পৃষ্ঠা; বুখারী, কিতাবুল মুহারিবীন, অনুচ্ছেদ ঃ ইযা যানাতিল আমাতু।

www.bjilibrary.com

ব্যভিচারীদের হেয় করা

ইসলামী সমাজ একদিকে কোনো চরিত্রবান মানুষের প্রতি অপবাদ আরোপকে আইনগত অপরাধ বলে গণ্য করে যাতে সে সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করতে পারে। অন্যদিকে সে কোনো ব্যভিচারীকে এমন সামাজিক মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয় যা একজন সচ্চরিত্র মানুষের প্রাপ্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সমাজব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে তার দৃষ্টিতে নৈতিক মূল্যবোধের যেহেতু কোনো মর্যাদা নেই তাই সে সমাজে একজন মানুষ চরিত্রহীন, গুণ্ডা ও বখাটে হয়েও সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। এ পন্থায় সমাজ পরোক্ষভাবে ব্যক্তিকে কুকর্মে উৎসাহিত করতে থাকে।

কিন্তু ইসলাম এমন একটি সমাজ কায়েম করতে চায় ব্যভিচারী ও চরিত্রহীন মানুষের যেখানে কোনো স্থানই থাকবে না, বরং সমাজের চোখে তার মান ইজ্জত হ্রাস পাবে। সমাজ তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখতে থাকবে। সমাজে সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট উপাদান হিসেবে গণ্য হবে। শরীফ ও মর্যাদাবান লোকেরা তার সান্নিধ্য থেকে দূরে অবস্থান করবে। পরিণামে সে তার নিজের মতো নিকৃষ্ট মানুষগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হবে।

اَلزَّانِىْ لاَيَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز وَّالزَّانِيَةُ ز لاَيَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○ - النور : ٣

"ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। আর ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ ছাড়া বিয়ে করবে না। মু'মিনদের জন্য এটি হারাম করা হয়েছে।"–সূরা আন নূর ঃ৩

عن ابى هريرة رض وزيد بن خالد رض انّ رسول اللّه ﷺ سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثمّ ان زنت فاجلدوها ثمّ بيعوها ولو بظفير.

"আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, অবিবাহিত ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে তাহলে কি করতে হবে ? তিনি বললেন ঃ সে যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাকে কোঁড়া মার। আবার করলে আবার কোঁড়া মার। এরপরও যদি সে ব্যভিচার করে তাহলে তাকে পুনরায় কোঁড়া মার এবং এক গাছা রশির বিনিময় হলেও বিক্রি করে দাও।"[১]

১. বুখারী, কিতাবুল মুহারিবীন, অনুচ্ছেদ ঃ ইযা যানাতিল আমাতু।

www.bjilibrary.com

অবিবাহিত বা কুমার জীবনের উচ্ছেদ সাধন

অপরাধীকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করলে এবং তার সংশ্রব এড়িয়ে চললেই কি সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায়? তা কখনো নয়। সমাজের প্রকৃত দায়িত্ব হলো লোকদের সৎপথে নিয়ে আসা এবং পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের সৎ ও পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা। যাতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি পবিত্র ও রুচিশীল জীবনের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে এবং উন্নত নৈতিক জীবন যাপনে আগ্রহী ব্যক্তি যেন বিশাল প্রান্তরে নিসঙ্গ মুসাফিরের ন্যায় না হয়ে পড়ে বরং তাকওয়া ও সৎকর্মশীল গোটা একটা কাফেলাই যেন তার সহযাত্রী হয়। সে যদি গোনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায় তা হলে যেন শত সহস্র হাত তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। সে যদি গোনাহ ও পাপ পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তাহলে যেন শত সহস্র কণ্ঠ তার সহযোগী হয়। সে যদি ব্যভিচার ও পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে গোটা সমাজ যেন তার জন্য বর্মের ভূমিকা পালন করে।

স্বাভাবিকভাবে এ দায়িত্ব সর্বাধিক বেশী বর্তায় কোনো ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর। ব্যক্তি তার জীবনের সমস্ত ব্যাপারে যেসব ব্যক্তিবর্গকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে, দুঃসময়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয় এবং নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের মুহূর্তে যাদেরকে সহায় বলে গণ্য করে সে তাদেরকেই পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনে সাহায্যকারী, সৎপথের সংগী এবং ভালকাজে সহায়তাকারী বলে মনে করবে, এটাই যথোপযুক্ত নীতি।

আপনি কোনো খান্দান বা গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তাদের প্রতি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু এতটুকু নয় যে, তারা অভুক্ত হলে খাদ্য দেবেন, বস্ত্রহীন হলে বস্ত্র সরবরাহ করবেন এবং গৃহহীন হলে বাসগৃহের ব্যবস্থা করবেন বরং তাদেরকে নৈতিক অধপতন থেকে রক্ষা করা, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যধির প্রতিকার এবং তাদের রূহানী চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করাও আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে শিশুর শরীরে একটা সাধারণ আঘাত লাগাও আপনি পসন্দ করেন না, সে জঘন্য কাজকর্মে লিপ্ত হোক তা কি আপনি বরদাশত করতে পারবেন?

এ স্বাভাবিক অধিকারকে কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط - النور : ٣٢

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিয়ে করিয়ে দাও। আর তোমাদের দাস-দাসীদেরও বিয়ে করিয়ে দাও।"–সূরা আন নূর ঃ ৩২

এ নির্দেশটিকে ফিকাহর যে পরিভাষায়ই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন আর তা দ্বারা অভিভাবক, সরকার ও রাষ্ট্র যাকেই সম্বোধন করা হোক না কেন এ

www.bjilibrary.com

আয়াতের স্পষ্ট দাবী হলো, ইসলামী সমাজে কেউ কুমার জীবন যাপন করতে পারবে না। যাতে প্রবৃত্তিকে দমনের জন্য তাকে অবৈধ পথ ও পন্থা খুঁজতে না হয়।

মুসলিম সমাজের পুরুষ, নারী, দাসদাসী সব শ্রেণীর মানুষই এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম যুগের ইসলামী সমাজ এসব কটি শ্রেণীর যৌন দাবী ও চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতো।

বিখ্যাত তাবেয়ী আহনাফ র. বলেন, তিনটি বিষয় এমন যাতে দেরী করা যায় না। বিষয়গুলো কি সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমলে সালেহ করা, মৃতকে দাফন করা এবং কোনো অবিবাহিতা যুবতী মেয়ের উপযুক্ত সম্বন্ধ জুটলে বিয়ে দিয়ে দেয়া।

তিনি বলতেন ঃ কোনো অবিবাহিতা যুবতী মেয়ের জন্য সমমর্যাদার কোনো পুরুষের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসলে তা প্রত্যাখান করাকে গৃহের মধ্যে বিষধর সাপ থাকার চেয়েও অধিক অপসন্দনীয় বলে আমি মনে করি।

শাদ্দাদ ইবনে আওস রা. তাঁর আত্মীয় স্বজনদের বলতেন, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অছিয়ত করেছেন, আমি যেন অবিবাহিত থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত না করি।[১]

মুজাহিদ র. বলতেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর দাসদের বিয়ে করার প্রস্তাব পেশ করতেন এবং বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে থেকে যে বিয়ে করতে ইচ্ছুক আমি তাঁকে বিয়ে দিতে প্রস্তুত (মনে রেখ) অবিবাহিত জীবন যাপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর ব্যভিচারের জঘন্যতা এতোই গুরুতর যে, ব্যভিচারী ব্যক্তি যে মুহূর্তে ব্যভিচার করে আল্লাহ তাআলা তখন তার গলদেশ থেকে ঈমানের মালা ছিনিয়ে নেন। তিনি চাইলে পুনরায় তা তার গলায় পরিয়ে দেন এবং না চাইলে পরিয়ে দেন না।"[২]

ইমাম নাখয়ী র. বলেন ঃ সালফগণ তাদের ক্রীতদাসদের বিয়ে করতে বাধ্য করতেন। তারা বিয়ে করতে প্রস্তুত না হলে, তাদেরকে গৃহবন্দী করতেন।[৩] যাতে তারা সমাজ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

ইসলামী সমাজে পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনে সাহায্য করা শুধু ব্যক্তির একার দায়িত্ব নয়, বরং এটি রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসেবেও পরিগণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

---

১. আহকামুল কুরআন, জাস্‌সাস, ২য় খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা।
২. আল মুহাল্লা লি ইবনে হাযম, ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২১।
৩. তাফসীরে কুরতুবী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪১।

www.bjilibrary.com

السلطان ولىّ من لاولىّ له.

"যার (নারীর) কোনো অভিভাবক নেই সমসাময়িক শাসন কর্তৃত্ব তার অভিভাবক।"[১]

নবী স. হযরত আলী রা.-কে তিনটি বিষয় মনে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। সময় মতো নামায আদায় করতে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে কাফন দাফনে দেরী না করতে এবং উপযুক্ত সম্বন্ধ জুটলে অবিবাহিতাকে অবিলম্বে বিয়ে দিতে।[২]

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রা. কুফার গভর্নর যায়েদ ইবনে আবদুর রহমানের একখানা পত্রের জবাবে লিখেছিলেন ঃ তুমি লিখেছো সৈন্যদের বেতন দেয়ার পরও তোমার কাছে অর্থ উদ্বৃত আছে। অতএব বাস্তব প্রয়োজনে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে উদ্বৃত এ অর্থ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করো। আর যারা মোহরানা পরিশোধে অক্ষম তাদের মোহরানা আদায় করে দাও।[৩]

চার স্ত্রী রাখার অনুমতি

বয়সের একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পুরুষের দেহে যৌন উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু নারী বার বার এমন অবস্থার মুখোমুখি হয় যখন তার উত্তেজনা থিতিয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার এ অবস্থা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। তাই সে সবসময় পুরুষের যৌন চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এ কারণে ইসলামী সমাজ পুরুষকে চার পর্যন্ত বিয়ে করার অধিকার দেয়। ফূর্তিবাজির জন্য এ অধিকার দেয়া হয় না। বরং দেয়া হয় এ জন্য যে, কোনো কোনো সময় পুরুষ তার যৌন চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের একাধিক বৈধ ক্ষেত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কিন্তু শরীআত প্রদত্ত এসব অধিকার ভোগের জন্য জরুরী হলো, পুরুষ তার সাধ্য অনুসারে স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশের অনুগত থাকবে।

কুরআন মজীদের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط. النساء : ٣

১. তিরমিযী, আবু দাঊদ, আবওয়াবুন নিকাহ।
২. তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফীল ওয়াকতিল আউয়াল মিন ফাদলিন।
৩. সীরাতে উমর ইবনে আবদুল আযীয, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম, মৃত্যু ২১৪ হিজরী।

www.bjilibrary.com

"যেসব মেয়েদেরকে তোমাদের পসন্দ হবে তাদের মধ্যে থেকে দুই, তিন অথবা চারজনকে বিয়ে করো। তবে যদি আশংকা করো যে, ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে একজনকেই বিয়ে করো কিংবা দাসীদের যথেষ্ট মনে করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩

আল্লামা ইবনে ইলহাম হানাফী এ আয়াতের আইনগত দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এভাবে।

فاستفرنا ان حل الاربع مقيد بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن اكثر من واحدة عند خوفه فعلم ايجابه عند تعددهن.

"এ থেকে জানা গেল যে, চার স্ত্রী একটি শর্তাধীনে হালাল। আর তা হলো বেইনসাফীর আশংকা না থাকা। এ আশংকা বর্তমান থাকলে একের অধিক বিয়ে করা নিষিদ্ধ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে ইনসাফ করা আবশ্যক।"[১]

আল্লামা বদরুদ্দীন কাশানী বলেন ঃ

لو كانت تحته امرأتان حرتان او امتان يحب عليه ان يعدل بينهما فى الماكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيوته ـ

"স্বামীর যদি দু'জন স্বাধীন কিংবা দু'জন ক্রীতদাসী স্ত্রী থাকে তাহলে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, রাত্রি যাপন এবং আচার-আচরণের ব্যাপারে তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফ করা তার জন্য ওয়াজিব।"

নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার

জন্ম ও প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষের অবস্থা পরস্পর ভিন্ন। তাই একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকা ইসলাম সঠিক মনে করে না। তবে বৈধ উপায়ে যৌন তৃপ্তি লাভ করা থেকে সে যেন বঞ্চিত না থাকে তা নিশ্চিত করা ইসলাম জরুরী মনে করে। তাই সে যতোটা কড়াকড়িভাবে পুরুষের বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করে নারীর বিয়ের জন্যও ততোটা কড়াকড়িভাবেই চাপ সৃষ্টি করে। যদি বৈধতা অথবা তালাক বা খোলা তাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাহলে অবিলম্বে পুনর্বিবাহ দিতে সমাজকে তাগিদ দেয় ও উৎসাহিত করে। তাই নবী স. ও তাঁর চার খলীফার যুগে অতি সহজেই মেয়েদের দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে যেতো।

---

১. ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, ২১৬-পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

আতেকা বিনতে যায়েদের বিয়ে হয়েছিলো হযরত আবু বকর রা.-এর পুত্র আবদুল্লাহর সাথে। বিশেষ কিছু কারণে হযরত আবু বকর রা. তাকে তালাক দেয়ার জন্য আবদুল্লাহকে পরামর্শ দেন। পিতার পরামর্শ অনুসারে আবদুল্লাহ স্ত্রীকে তালাক দিলেন বটে, কিন্তু এ কাজের জন্য তাঁর যথেষ্ট মনস্তাপ ও দুঃখ ছিল। কারণ, তিনি আতেকাকে খুবই ভালবাসতেন। আবদুল্লাহর আগ্রহ দেখে হযরত আবু বকর রা. আতেকাকে পুনরায় বিয়ে করার জন্য তাকে অনুমতি দিলে তিনি তাকে পুনরায় বিয়ে করলেন। তায়েফের যুদ্ধে আবদুল্লাহ শহীদ হলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে এরপর যায়েদ ইবনে খাত্তাব আতেকাকে বিয়ে করলেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হলে হযরত 'উমর' রা. এবং তার পর হযরত যুবায়ের রা.-এর সাথে তার বিয়ে হয়। হযরত যুবায়ের রা.-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী রা. তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আতেকা নিজেই তা অস্বীকার করেন।

সুহায়লা বিনতে সুহাইলের বিয়ে হয়েছিলো পর পর চারজন অর্থাৎ হযরত হুযাইফা রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফ রা., আবদুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ এবং শামাখ ইবনে সাঈদের সাথে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কন্যা জামিলার বিয়ে হয়েছিলো হযরত হানযালার সাথে। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করলে সাবেত ইবনে কায়েস তাকে বিয়ে করেন। সাবেত রা.-এর ইনতিকালের পর মালেক ইবনে দুখশাম এবং সর্বশেষে হাবীব ইবনে লিয়াফ তাকে বিয়ে করেন।

আসমা বিনতে উমায়েসের প্রথম বিয়ে হয়েছিলো হযরত আলী রা.-এর ভাই হযরত জাফরের সাথে। তাঁর ইনতিকালের পর হযরত আবু বকর রা. এবং তাঁর পরে হযরত আলী রা. তাকে বিয়ে করেন।

হযরত আলী রা.-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয় হযরত উমর রা.-এর সাথে। হযরত 'উমর রা. শহীদ হলে 'আওন ইবনে জা'ফরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আওনের মৃত্যুর পর তার ভাই আবদুল্লাহ তাকে বিয়ে করেন।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীর দ্বিতীয় বিবাহ দূষণীয় বা অপসন্দনীয় হওয়ার কোনো ধারণাই ছিল না যেমনটি হিন্দু ধর্ম এবং অন্য কিছু ধর্মে বিধান রয়েছে। এ কারণে সে যুগে নারীদের একের অধিকবার বিয়ে হয়েছে ব্যাপকভাবে। বিশেষ যাঁচাই বাছাই বা অনুসন্ধান ছাড়াই আমরা কয়েকটি উদাহরণ পেশ করলাম।

১. এসব উদাহরণের জন্য দেখুন, ইবনে সা'দের তাবাকাত এবং ইবনে আবদুল বারের "আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব" গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট সাহাবিয়াদ্বয়ের সম্পর্কে বর্ণনা।

www.bjilibrary.com

অন্যথায় এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা এতো অধিক যে, এখানে তার ব্যাখ্যা দেয়াও অসম্ভব।

বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পবিত্র জীবন যাপনে সাহায্য করা। এ উদ্দেশ্য কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের যৌন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। এ কারণে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে অধিকার দিয়েছে উভয়ের কোনো একজনের যৌন দাবী পূরণ করার যোগ্যতা না থাকলে সে যেন দাম্পত্য বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

হযরত উমর রা., হযরত আলী রা. এবং আরো কিছু সংখ্যক সাহাবা ও তাবেয়ীর মতে শুধু যৌন অক্ষমতার কারণেই নয়, বরং কুষ্ঠ, অন্ধত্ব এবং মানসিক রোগও এমন ত্রুটি হিসেবে গণ্য, যে কারণে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার রয়েছে।[১]

ইমাম ইবনে কাইয়েম এসব ত্রুটির ওপর অন্য সব ত্রুটি-বিচ্যুতি কিয়াস করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اما الاقتصار على عيبين اوستة او سبعة اوثمانية دون ما هو اولى منها مساوٍ لها فلا وجه له ... والقياس ان كل عيب ينفر الزوج الاخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار.

> "দু'টি, ছয়টি, সাতটি বা আটটি দোষের ওপর নির্ভর করা এবং তার চেয়ে বড় বড় বা সমপর্যায়ের দোষসমূহ গণ্য না করার কোনো অর্থ হয় না......কিয়াসের ভিত্তিতে এমন প্রত্যেকটি দোষের কারণে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার থাকা উচিত যা তাদের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং যে কারণে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য পারস্পরিক দয়া-মায়া ও স্নেহ ভালবাসার অবসান ঘটে।"

বৈধ সম্পর্কের মর্যাদা

যেসব সম্পর্ক পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনে সাহায্য করে না ইসলাম একদিকে সেসব সম্পর্ক ছিন্ন করার স্বাধীনতা দেয়। অপরদিকে যেসব সম্পর্ক

---

১. আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, ৭ম খণ্ড, ২১৪-২১৫ পৃষ্ঠা। হানাফীদের মতে স্বামীর যদি কুষ্ঠ বা অনুরূপ কোনো রোগ জনিত ত্রুটি থাকে তাহলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করার অধিকার থাকবে না। তবে স্বামী যদি কর্তিত লিংগ কিংবা খাসি হয় তাহলে তার বিবাহ বিচ্ছেদ দাবী করার অধিকার থাকবে। বিস্তারিত ফিকহী মাসয়ালা জানার জন্য দেখুন "আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরাবায়া, ৪র্থ খণ্ড, ১৮০ থেকে ১৮৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

www.bjilibrary.com

পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনে সাহায্য করে তাকে দৃঢ়তর করার এবং যথাসাধ্য আঁকড়ে ধরার শিক্ষা দেয়। কারণ, যতোক্ষণ এ সম্পর্ক দৃঢ় না হবে এবং তার মহত্ত্ব ও মর্যাদা হৃদয় মনে শিকড় গেড়ে না বসবে ততোক্ষণ সে মানসিকতা নিশ্চিহ্ন হয় না যা মানুষকে সবসময় একজন নতুন প্রিয়পাত্রের অনুসন্ধানে ব্যস্ত রাখে। যেসব লোক দুশ্চরিত্র ও দুরাচার, যৌন ক্ষুধা মেটানোর বৈধ উপকরণ তাদের নেই এমন নয়। কিন্তু এগুলোকে তারা এমন উপকরণ বলে মনে করে যা যৌন ক্ষুধার আগুন নির্বাপিত করার জন্য সর্বক্ষণ তাদের আয়ত্তে আছে। নির্দিষ্ট পন্থা ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় যৌন-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করা বৈধ নয় এ ধারণার সাথেই তারা পরিচিত নয়। এ কারণে তাদের যৌন ভালবাসার কেন্দ্র আজ একটি হলে কালকে অন্য একটি হতে পারে। পথে চলতে গিয়ে কোনো গুণ্ডাকে ধাক্কা দিতে গিয়ে তারা যতোটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও চিন্তা-ভাবনা করে আপন জীবন সঙ্গিনীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে ততোটা চিন্তা-ভাবনা করাও জরুরী মনে করে না।

ইসলাম এ মানসিকতার শত্রু। সে এ মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়। তার দৃষ্টিতে বিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ চুক্তি ও অঙ্গীকার। এভাবে যতোদিন ইচ্ছা ফূর্তি উড়ানো হবে এবং যখন ইচ্ছা ছিন্ন করা হবে এজন্য এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় না। বিয়ের বন্ধন যদি এতোই গুরুত্বহীন হয় তবে বিয়ে ও প্রকাশ্য ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য কি ? যে ব্যক্তি প্রতিদিন নতুন বিয়ে এবং নতুন সম্পর্কের প্রয়োজন অনুভব করে আর যে তার যৌন-ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোনো বেশ্যার আস্তানায় ঘুরঘুর করে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি ? এ জঘন্য মানসিকতা ও আবেগের বিরুদ্ধে ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত কঠোর। নবী স. বলেছেন ঃ

المنتزعات والمختلعات هنّ المنافقات.

"যেসব মহিলা অকারণে স্বামীর কাছে তালাক বা খোলা প্রার্থনা করে তারাই মুনাফিক।"[১]

নবী স. আরো বলেছেন ঃ

ايّما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنّة.

"প্রকৃত কোনো কারণ ছাড়া যে মহিলা তার স্বামীর কাছে তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত হারাম।"[২]

---

১. নাসায়ী, কিতাবুত তালাক, বাবু মা জায়া ফিল খোলা।
২. তিরমিযী, আবওয়াবুত তালাক ওয়াল লি'আন, বাবু মা জায়া ফিল মুখতালিয়াত ; ইবনে মাজা, আবওয়াবুত তালাক, বাবু কারাহিয়াতুল খোলা লিল মারআ।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় আরো একটি হাদীসে আছে ঃ

ان اعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته طلقها وذهب بمهرها.

"আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ হলো, সেই ব্যক্তির গোনাহ, যে কোনো নারীকে বিয়ে করে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার মোহরানাও পরিশোধ করে না।"[১]

বৈধ সীমার মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন শুধু ব্যক্তির জন্যই জরুরী নয়, সমাজও সে জন্য বাধ্য। ইসলাম বলে সমাজ যেহেতু অবৈধ সম্পর্কের নিন্দা করে তাই বৈধ সম্পর্কের সম্মান ও মর্যাদা দেয়াও তার কর্তব্য। সুতরাং শরীআতসম্মত একটি সম্পর্ককে সমাজ মায়ের মতোই সম্মানিত বলে ঘোষণা করে। আইনের অস্ত্র যতোক্ষণ না এ সম্পর্ক কেটে দেয় ততোক্ষণ পর্যন্ত এ মর্যাদা নষ্ট করার অধিকার কারো নেই। কুরআন মজীদ ঘোষণা করে ঃ "বিবাহিতা নারীরা তোমাদের জন্য হারাম।" এ নিষেধাজ্ঞা নস্যাতকারী যে কোনো প্রচেষ্টা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبداً على سيده.

"যে ব্যক্তি কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কিংবা কোনো দাসকে তার মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে সে আমার দলভুক্ত নয়।"[২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন ঃ কেউ কারো স্ত্রীকে নিজে বিয়ে করার জন্য কিংবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য যদি তার স্বামীকে হত্যা করে আর এ ষড়যন্ত্রে উক্ত নারী অংশীদার থাক বা না থাক উভয় অবস্থায় ইসলামের নীতিমালার দাবী হলো ঐ ব্যক্তিকে উক্ত নারীর সাথে বিয়ে থেকে বঞ্চিত করতে হবে।[৩]

সামষ্টিক অনুভূতি

মানুষ তার পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তার জীবনে যদি কর্ম ও কৃতিত্বের আলো থাকে তাহলে আরো অনেক জীবন তা থেকে ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। আর সে যদি মন্দ ও অকল্যাণের বাহক হয় তাহলে এ অকল্যাণ শুধু তার নিজের ব্যক্তি জীবন পর্যন্ত সীমবদ্ধ থাকে না ; বরং তার পরিবেশের

১. মুসতাদরিকে হাকেম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮২।
২. আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, বাবু মান খাব্বাবা ইমারা আতান আলা যাউজিহা।
৩. ইকামাতীদ দালীল আলা ইহ্তালিত তাহলিল, আল মাতবু মাআল ফাতওয়া, পৃষ্ঠা-১৪৭-১৪৮।

www.bjilibrary.com

মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। এভাবে মানুষ চরিত্র ও কর্ম দিয়ে অন্যকে গড়ে এবং ধ্বংসও করে। তাই কোনো ব্যক্তি যতোক্ষণ পর্যন্ত অনুভব না করবে যে, সে সমাজের চরিত্র ও কর্মের রক্ষক ও প্রহরী ততোক্ষণ পর্যন্ত নৈতিকতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটবে না।

ইসলাম ব্যক্তির মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, তুমি সমাজের নির্মাতা। তোমার কাজ শুধু নিজের একার চরিত্র নির্মাণ নয়, বরং অন্যের সংস্কার এবং সংশোধনও তোমার দায়িত্ব। তোমার নিজের পরিবেশে তুমি শুধু নৈতিকতার অধিকারী হয়েই থাকবে না বরং নৈতিক চরিত্রের শিক্ষকও হবে তুমি। শুধু নিজের চরিত্র ও কর্ম উন্নত করাই নয় অন্যদেরও হীন চরিত্র এবং কর্ম থেকে রক্ষা করাও তোমার কাজ। নবী স. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعية.

"শুনে রাখো, তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল বা প্রহরী। আর প্রত্যেককেই তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম বা নেতা যিনি শাসন করেন সাধারণ মানুষকে তাকেও তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন পুরুষ তার বাড়ীর লোকদের রাখাল বা প্রহরী। তাকে তার অধীন লোকদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের লোকদের এবং তার সন্তানদের রাখাল বা প্রহরী। তাকে তার অধীন লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। দাস তার মনিবের সম্পদের পাহারাদার। তাকেও ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই জেনে রাখো, তোমরা সবাই রাখাল বা প্রহরী। আর সবাইকে তার অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১]

সামাজিক চাপ বেশ কঠিন। সমাজ যদি নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের অনুমতি না দেয় তাহলে কেউ-ই তা করতে সাহস পায় না। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক পরিবেশ যদি খারাপ হয় তাহলে চারদিক থেকে পাপ পঙ্কিলতার সয়লাব ঘিরে ধরে এবং নৈতিকতা ও সুকৃতির উৎসসমূহ শুকিয়ে যেতে থাকে।

১. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবু কাওলিল্লাহি আতিয়ুল্লাহ।

www.bjilibrary.com

ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম সমাজের নৈতিক অনুভূতি এতোটা জাগ্রত করে যে, কোনো নগণ্য অনৈতিকতাকেও সে বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়।

জনৈকা মহিলা বেশ করে আতর ও সুগন্ধি লাগিয়ে রাস্তা দিয়ে চলছিলো। এমতাবস্থায় হযরত আবু হুরাইরা রা. তাকে দেখে ফেললেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো ? সে বললো ঃ হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ মসজিদে যাওয়ার জন্যই কি তুমি এ সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলে ? মহিলা ইতিবাচক জবাব দিল। হযরত আবু হুরাইরা রা. তাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যায় আল্লাহ তা'আলা তার নামায কবুল করেন না যতোক্ষণ পর্যন্ত সে গুরুত্ব সহকারে জানাবাতের গোসলের মতো গোসল না করবে।[১]

অনুরূপ উম্মে দারদাকে হাম্মামখানা থেকে আসতে দেখে নবী স. তাকে হাম্মামখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে বললেন ঃ যে নারী তার নিজের গৃহ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে পরিধেও বস্ত্র খুলে রাখে সে তার নিজের ও মহান আল্লাহর মধ্যেকার পর্দা ছিন্ন করে ফেলে।[২]

যেসব লোকের সাথে মানুষের সামাজিক এবং রক্ত সম্পর্ক বর্তমান সেসব লোকের নৈতিক পাহারাদারী তাদের কর্তব্যের অর্ন্তগত বলে ইসলাম মনে করে। এ সম্পর্কে যতো গভীর এবং মজবুত হয় মানুষের দায়িত্বও ততো বেড়ে যায়। এ কারণে কোনো আপন জনের সম্ভ্রমহানি করা ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের দুষ্কর্মের জঘন্য উদাহরণ। কোনো কোনো ফকীহর মতে এ ধরনের ব্যক্তির শাস্তি হত্যার চেয়ে লঘু নয়।[৩]

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সতীত্ব হানিরও এ একই পরিণাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন ঃ

قال رجل يا رسول الله ایّ الذنب اكبر عند الله قال ان تدعوا الله نداء وهو خلقك قال ثم ایّ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قال ثم ایّ قال ان تزنى حليلة جارك.

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গোনাহ কি ?

১. আবু দাউদ, কিতাবুর রাজুল, বাবু ফী তীবিল মারয়াতে লিলখুরুজ।
২. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬২।
৩. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭২।

www.bjilibrary.com

তিনি বললেন ঃ সবচেয়ে বড় গোনাহ হলো আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললো এরপর কোন গোনাহটি বড় ? তিনি বললেন ঃ এরপরে সবচেয়ে বড় গোনাহ হলো, রুজীতে শরীক হবে (আর তোমাকে অভুক্ত থাকতে হবে) এ ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা। সে আবার জিজ্ঞেস করলো ঃ এরপরে আর কোন্ গোনাহটি সবচেয়ে বড় ? তিনি বললেন ঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।"[১]

ব্যভিচার সর্বাবস্থায় একটি অপরাধ। শুধু অপরাধ নয়, একটি জঘন্য অপরাধ। কিন্তু যে ব্যক্তির উচিত ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় হওয়া এমন ব্যক্তি যদি নিজেই এ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে এ অপরাধের জঘন্যতা অনেক গুণে বেড়ে যায়।

একবার নবী স. সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যভিচার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি ? সাহাবাগণ জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যভিচার হারাম করেছেন। তাই তা কিয়ামত পর্যন্ত হারামই থাকবে। নবী স. বললেন ঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সতীত্ব বিনাশ করার চেয়ে দশজন নারীর সতীত্ব বিনাশ করা তুলনামূলকভাবে হালকা গোনাহ।[২]

❐

১. মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে।
২. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড ,পৃষ্ঠা-৮।

www.bjilibrary.com

ইসলামী আইন

এখন আমরা ইসলামী আইন পর্যালোচনা করে দেখবো, তা কিভাবে সমাজকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার হাত থেকে রক্ষা করে।

এক ঃ স্থায়ী হারাম

জন্মলাভ করার পর মানুষ সর্বপ্রথম তার মা, বাপ, ভাই, বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে পরিচিত হয়। এটা মানুষের একান্ত আপন পরিবেশ। এ পরিবেশেই সে লালিত পালিত হয়ে বেড়ে ওঠে। সে নিজের চেষ্টা-সাধনার দ্বারা এ পরিবেশ সৃষ্টি করে না। বরং স্বাভাবিকভাবেই সে এ পরিবেশ লাভ করে থাকে। এ পরিবেশ যদি তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাহলে সে এমন কোনো পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় যা তার নিস্বার্থ সেবক হবে, যা তার দুঃখ-বেদনা ও হাসি-কান্নাকে নিজের দুঃখ-বেদনা ও হাসি-কান্না মনে করবে, যা জীবনের সমস্ত পর্যায়ে তার সত্যিকার সহযোগী ও সাহায্যকারী হবে। এ কারণে মানুষ অবচেতনভাবেই তার এ নিকট পরিবেশকে এমন সাহায্য বলে মনে করে আসছে যা তার লালন ও প্রতিপালনের জন্য অদৃশ্যভাবে যোগান দেয়া হয়। এ অনুভূতি ঐ পরিবেশকে একটি পুত-পবিত্র হেরেমের মর্যাদা প্রদান করেছে এবং তার সাথে বিশ্বাস ও ভালবাসা জনিত আবেগ মিশে গিয়েছে।

এর একটি বড় উপকার হলো, মানুষ রাতদিন যে গণ্ডির মধ্যে অবস্থান ও জীবন যাপন করে তা অনেকটা অকল্যাণের স্পর্শ থেকে নিরাপদ হয়েছে। অন্যথায় ব্যাপক মেলামেশার কারণে এ গণ্ডির মধ্যে পথ হারানোর সম্ভাবনা বিদ্যমান।

ইসলাম এ সম্ভাবনাকে আরো কমিয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত কারণে যেসব মানুষ একে অপরের নিকটবর্তী, ইসলাম আইনগতভাবে তাদের পরস্পরের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সাথে সাথে ইসলাম সেসব ব্যক্তিকে চিহ্নিতও করে দিয়েছে যাদের সাথে যৌন সম্পর্ক বৈধ নয়। যাতে কোনো সম্ভোগ বিমুখ ব্যক্তি এমন কাউকে তাদের অন্তর্ভুক্ত না করে যাদের সাথে যৌন সম্পর্ক থাকার পথে কোনো যুক্তিসংগত বাধা নেই। আবার কোনো অবাধ যৌনাচারী যেন এ সুযোগও লাভ না করে যে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে যে অঙ্গন পবিত্র থাকা উচিত সে তাকেও তার যৌনতার লক্ষ বানিয়ে ফেলে।

www.bjilibrary.com

দুই ঃ গোপন সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

এ নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে সে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে দেয় এ শর্তে যে, এ সম্পর্কের ফল হিসেবে যেসব দায়-দায়িত্ব পালন অনিবার্য হয়ে ওঠে তা পালন করার প্রতিশ্রুতি সে দেবে। এজন্য যা প্রয়োজন তা হলো, প্রকাশ্যে সমাজের চোখের সামনে এ সম্পর্কের গোড়া পত্তন হতে হবে। যাতে এ দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমাজ ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে আসে। আর ব্যক্তি যদি তা পালন করতে অবহেলা করে বা পাশ কাটিয়ে যেতে চায় তা হলে তাকে জবাবদিহির জন্য পাকড়াও করতে পারে।

কুরআন মজীদ যেখানেই যৌন সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেছে সেখানেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে,

وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

"মেয়েরা গোপনে বা চুপিসারে বন্ধুত্ব করবে না।"

وَلَا مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ

"পুরুষেরাও গোপনে বা চুপিসারে বন্ধুত্ব করবে না।"

ব্যক্তি এ সম্পর্ককে গোপন রাখতে চায় এজন্য যাতে সমাজের পক্ষ থেকে কোনো চাপ তার ওপর না আসে এবং পরিবেশের সৃষ্ট বন্ধন থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে। কারণ, এ বন্ধন ও বাধ্যবাধকতাই তার বিপথগামিতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সে যে কোনো প্রান্তরে পথ হারিয়ে নিরুদ্দেশ হতে পারে এবং এ সম্পর্ক ও পরিণাম যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। ইসলাম মানুষকে এ বন্ধনহীনতা থেকে রক্ষা করার জন্য এ সম্পর্ক গোপন না রেখে বরং প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বাধ্য করে। একবার হযরত উমর রা.-এর কাছে একটি বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা হলো। এ বিয়ের সাক্ষী ছিল মাত্র একজন নারী ও একজন পুরুষ। হযরত উমর রা. বললেন ঃ এটি গোপন বিয়ে। আমি তা বৈধ করতে পারি না। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা হযরত আবু বকর রা.-এর কোনো নজীর যদি আমার সামনে থাকতো তাহলে আমি এ সম্পর্ককে ব্যভিচার বলে গণ্য করে রজম করতাম।[১]

তিন ঃ বেশ্যাবৃত্তি পেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা

যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থানের জন্য ব্যভিচারে উৎসাহ দানকারী সবকিছুকে সমাজ থেকে নির্মূল করা জরুরী এবং চিন্তা ও

১. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুন নিকাহ, বাবু জামেউ মা লা ইয়াযুয।

www.bjilibrary.com

কর্মে দেউলিয়াত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমন সব পথ বন্ধ করা প্রয়োজন। এছাড়া মানুষের সঠিক পথে টিকে থাকা অসম্ভব। কোনো এক সময় অপবিত্র পথে তার পা পড়বেই।

এ উদ্দেশ্যে ইসলাম সমাজকে বেশ্যাবৃত্তির নোংরামি থেকে পবিত্র করে। বৃক্ষের যে শাখে অলক্ষুণে পাখি নীড় রচনা করে ইসলাম সে শাখাই কেটে ফেলে।

আরবের জাহেলী সভ্যতা ব্যভিচারের নিয়মিত আখড়া প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। এসব আখড়ায় যৌনাচারের সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। পুঁজিপতিরা সম্ভ্রম বিক্রি করতে দাসীদের বাধ্য করতো। আর সে অর্থ দিয়ে তারা তাদের লালসা চরিতার্থ করতো। উপার্জনের এ লাঞ্ছনাকর পথ কুরআন মজীদ একেবারেই নিষেধ করে দিয়েছে ঃ

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط - النور : ٣٣

“পার্থিব জীবনের নগণ্য ভোগের উপকরণ লাভের জন্য নিজের দাসীদের ব্যভিচার করতে বাধ্য করো না, যদি তারা পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়।”–সূরা আন নূর ঃ ৩৩

অনেক সময় দাসীর মালিক দাসীকে সরাসরি তার সম্ভ্রম বিক্রি করতে হুকুম দিতো না বটে কিন্তু এতো অধিক অর্থ প্রদান তার জন্য বাধ্যতামূলক করে দিতো যে, বেচারী কোনো বৈধ পথে তা উপার্জন করে দিতে পারতো না। তাই এজন্য সে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হতো। নবী স. দাসীর মালিকের এ যুলুমমূলক অধিকার মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন ঃ সে দাসীকে পবিত্রতার গণ্ডির মধ্যে রেখেই কেবল কোনো কাজ করাতে এবং তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে।

রাফে' ইবনে রিফা'আ বলেন ঃ

نهانا رسول اللّه ﷺ عن كسب الامة الاّ ما عملت بيدها وقال هكذا باصابعه نحو الخبز والغزل والنفش -

“রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দাসীদের উপার্জন খেতে নিষেধ করেছেন। তবে তার হাতের উপার্জন খেতে নিষেধ করেননি। রাসূলুল্লাহ স. তাঁর আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ এভাবে অর্থাৎ রুটি পাকানো, সুতা কাটা এবং তুলা ধুনার উপার্জন।”[১]

১. আবু দাঊদ, কিতাবুল বুয়ু, বাবু ফী কাসবিল ইমা।

www.bjilibrary.com

রাফে' ইবনে খাদীজ রা. বর্ণনা করেছেন ঃ

نهى رسول اللّه ﷺ عن كسب الامة حتى يعلم من اين هو.

"রাসূলুল্লাহ স. ততোক্ষণ পর্যন্ত দাসীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন যতোক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা না যাবে সে কিভাবে তা উপার্জন করেছে।"[১]

জাহেলী যুগে বেশ্যাবৃত্তির জন্য দাসীরা নির্দিষ্ট ছিল। এ কারণে উপরোক্ত আয়াতে এবং হাদীসে তাদেরকে এ পেশা থেকে দূরে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু নবীন সভ্যতার আলো যদি অভিজাত ও সুশিক্ষিতা মেয়েদের দ্বারা এ জঘন্য কাজ করায় ইসলামের শিক্ষা তাকেও অপবিত্র ও হারাম বলে ঘোষণা করে। ইসলাম কোনো কাজ সম্পাদনকারীর দৈহিক গঠন ও আকৃতি, তার অবস্থান, পদমর্যাদা, বংশ ও গোত্র কি তা দেখে না। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় বেশ্যাবৃত্তির উপার্জনকে সরাসরি অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

হযরত আবু মাসউদ আনসারী বলেন ঃ

انّ رسول اللّه ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى.

"রাসূলুল্লাহ স. কুকুরের মূল্য এবং বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"[২]

অন্য একটি হাদীসের ভাষা হলো ঃ

مهر البغى خبيث ـ

"ব্যভিচারিণীর আয় অপবিত্র ও নোংরা।"[৩]

এ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ইসলামী জ্ঞান গবেষক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত কত কঠোর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নিম্ন বর্ণিত বক্তব্য থেকে তা অনুমান করতে পারা যায় ঃ

فاما اذا كان هو يرسلها لتبغى وتنفق على نفسها من مهر البغاء او يأخذ هو شيئًا من ذالك فهذا ممّن لّعنه اللّه ورسوله وهو فاسقٌ خبيث اذنُ فى الكبيرة واخذُ مهر البغى ولم ينهها عن الفاحشة ومثل هذا لايجوز ان

১. আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ু, বাবু ফী কাসবিল ইহইয়া।

২. বুখারী, কিতাবুল ইজারাহ, বাবু কাসবিল বাগয়ে ওয়াল ইমা ; মুসলিম, কিতাবুল মাসকাহ ওয়াল মুযারিয়াহ।

৩. আবু দাউদ, বাবু ফী কাসবিল হাজজাম ; তিরমিযী, আবুওয়াবুল বুয়ু, বাবু সুমুনিল কালব।

www.bjilibrary.com

يكون معدّلا بل لايجوز اقراره بين المسلمين بل يستحق العقوبة الغليظة حتّى يصون اماءه واقلُّ ... العقوبة ان يهجر فلا يسلّم عليه ولا يصلي خلفه اذا امكنت الصّلاة خلف غيره ولا يستشهد ولا يولّى ولايةً اصلاً ومن استحل ذالك فهو كافرٌ مرتدٌّ يستتاب فان تاب والاَّقتل وكان مرتدّا لاترثه ورثته المسلمون وان كان جاهلاً بالتحريم عرف ذالك حتى تقوم عليه الحجة فانَّ هذا من المحرّمات المجمع عليها.

"যদি কেউ তার দাসীকে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য কিংবা নিজে ব্যয় করার জন্য অর্থ উপার্জন করতে পাঠায় এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল লা'নত করেছেন। সে ফাসেক ও পাপী। কেননা সে একটি কবীরা গোনাহর অনুমতি দিয়ে রেখেছে। ব্যভিচারিণীর উপার্জন গ্রহণ করছে এবং ব্যভিচার থেকে বিরত রাখছে না। এ ধরনের লোককে আইনগত দিক দিয়ে অগ্রহণীয় ও অনির্ভরযোগ্য মনে করতে হবে বরং তাকে মুসলমানদের সমাজে থাকতে দেয়া যাবে না। এরূপ পাপী ও দুষ্কর্মশীল ব্যক্তি যদি তার দাসীকে একাজ থেকে বিরত না রাখে তাহলে সে অত্যন্ত কঠোর শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তার সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তি হলো তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, সালাম দেয়া বন্ধ করতে হবে এবং অন্য কোনো ইমাম পাওয়া গেলে তার পেছনে নামায পড়া যাবে না। তাকে সাক্ষী বানানো যাবে না এবং কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না। যদি সে একাজকে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তাকে তাওবা করতে হবে। সে যদি তাওবা করে তাহলে সব ঠিক। অন্যথায় হত্যা করা হবে। মুরতাদ হওয়ার কারণে তার মুসলিম উত্তরাধিকারীরা তার ওয়ারিশ হবে না। একাজের হারাম হওয়া সম্পর্কে তার জানা না থাকলে দলীল বা 'হুজ্জত' পূরণ হওয়ার জন্য তাকে জানানো হবে (এবং তার সাথে ওপরে বর্ণিত আচরণ করা হবে)। কারণ, এটি এমন একটি কাজ যা হারাম হওয়া সম্পর্কে গোটা উম্মত ঐকমত্য পোষণ করেছে।"[১]

চার ঃ অবাধ মেলামেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা

মানুষ বীরাঙ্গনাদের আখড়া এবং পাপের আস্তানার পাশ দিয়ে দৃষ্টি আনত করে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু যেখানে গোটা সমাজকে ব্যভিচারের

১. ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫।

www.bjilibrary.com

আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে সেখানে সে কোথায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে ? নিজের নৈতিকতা ও কর্মের পরিমার্জনের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ? বর্তমানে অবস্থা এই যে, কোনো ব্যক্তি সে বাজারের দোকানদার হোক কিংবা কারখানার শ্রমিক, কলেজের ছাত্র হোক কিংবা অফিসের কেরানী সে কোনো হোটেলে বসে থাকুক বা পার্কে ভ্রমণরত হোক প্রতিটি স্থানেই বিপরীত লিঙ্গ তার সামনে পাপের পয়গাম নিয়ে হাজির আছে। জীবনের এমন কোনো অঙ্গন নেই বর্তমান সভ্যতা যেখানে নারী ও পুরুষের এক সাথে কাজকর্ম অনিবার্য করে দেয়নি। শুধু তাই নয়, বরং এ একত্র মেলামেশাকে এতটা বৈচিত্রময় ও আকর্ষণীয় করে দিয়েছে যে, প্রতি পদে দৃষ্টি বিভ্রান্ত এবং ইচ্ছা ও সংকল্প পরাভূত হতে থাকে। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, সমাজের ওপরে যৌন ক্ষুধা ও যৌন উপবাসের মতো পরিস্থিতি ছেয়ে আছে। মনে হয় যেন যৌনতা সর্বত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা যতোদিন উচ্ছেদ করা না যাবে সমাজ ততোদিন এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। আগুন ও তুলা একত্রিত হলে তা সর্বদাই ধ্বংসের কারণ হয়েছে। ইসলাম সবসময় নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পুরোপুরি আলাদা করে রেখেছে। তাই ইসলামের নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ নিতান্ত কম থাকে। কোনো সময় নারী ও পুরুষকে একই গণ্ডির মধ্যে কাজ করতে হলেও ইসলাম তাদের পরস্পর মেলামেশা থেকে দূরে থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়।

عن ابن عمر رض انَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى ان يمشي يعني الرَّجل بين المرأتين.

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. কোনো পুরুষকে দু'জন স্ত্রীলোকের মাঝ দিয়ে চলতে নিষেধ করেছেন।"[১]

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী ও পুরুষের পরস্পর মিশে যেতে দেখে নারীদের বললেন ঃ

استأخرن فانَّه ليس لكنَّ ان تحقّقن الطَّريق عليكنَّ بحافات الطَّريق.

"পিছনে চলে যাও। রাস্তার মাঝখানে দিয়ে চলার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। তোমাদের রাস্তার একপাশ দিয়ে চলা উচিত।"[২]

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবু মাশইউন নিসায়ি ফিত্তারীক।
২. ঐ

www.bjilibrary.com

এর ফল হলো এই যে, রাস্তায় চলার সময় মেয়েরা এতোটা সংযত হয়ে ও প্রাচীরের গা ঘেঁষে চলতো যে, তাদের কাপড় অনেক সময় প্রাচীর গাত্রে আটকে যেতো।[১]

হযরত আলী রা. বলেন ঃ

الا تستحيون فانه بلغني أنّ نساءكم يخرجن فى الاسواق يزاحمن العلوج.

"তোমরা কি লজ্জা অনুভব করো না ? আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মেয়েরা বাজারে যায় এবং সেখানে কাফেরদের সাথে তাদের দেখা সাক্ষাত হয়ে যায়।"[২]

একবার হযরত উমর রা. বাজারে ঘুরছিলেন। তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি এক মহিলার সাথে কথাবার্তা বলছে। শাস্তি স্বরূপ তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতে শুরু করলেন। তখন লোকটি বললো ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! সে তো আমার স্ত্রী। একথা শুনে হযরত 'উমর অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার প্রতি যুলুম করেছি। তুমি ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ নিতে পার। সে বললো ঃ আমি ক্ষমা করে দিলাম।[৩]

ইসলামী শরীআত নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাই শুধু বন্ধ করে না বরং অত্যন্ত সৌখিন পোশাক পরে এবং সেজেগুজে ঘরের বাইরে যেতেও নিষেধ করে, যাতে সমাজের পূত-পবিত্র পরিবেশে গোনাহর বীজ ছড়িয়ে না পড়ে।

عن ابى موسى عن النّبىّ ﷺ قالَ كلّ عين زانية والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهو كذا وكذا يعنى زانية.

"হযরত আবু মূসা রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি চোখ যিনা করে থাকে। (এ জন্য নারীর উচিত পুরুষের চোখের আড়াল দিয়ে চলে যাওয়া) নারী যখন সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে যায় তখন সে এরূপ এবং এরূপ অর্থাৎ ব্যভিচার করে।"[৪]

---

১. আবু দাউদ, পূর্বোক্ত সূত্র।
২. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং -১১১৮।
৩. আল ইকদুল ফারীদ।
৪. তিরমিযী আবওয়াবুল আদাব, বাব ঃ মা জায়া ফী কারাহিয়াতি খুরুজিল মারআতি মুতাআততিরান।

www.bjilibrary.com

عن ابى هريرة رض قال قال رسول اللّه ﷺ ايّما امرأة اصابت بخوراً فلا تشهدنّ معنا العشاء ـ

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে সে যেন আমাদের সাথে ইশার নামাযে শরীক না হয়।"[১]

ইমাম নববী র. বলেন ঃ বিভিন্ন হাদীসের ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ বলেছেন ঃ নারীকে তখনই কেবল মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে যখন সে—

ان لاتكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولاشابة ونحوها ممن يفتتن بها وان لايكون فى الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها.

"সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, সেজে গুজে বের হবে না, পায়ে ঝংকার সৃষ্টিকারী মল পরবে না, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে না, পুরুষদের মধ্যে মিশে যাবে না, যুবতী হবে না, বা ফিতনা সৃষ্টিকারী অনুরূপ কোনো অবস্থা থাকবে না এবং যাতায়াতের পথে ফিতনা ফাসাদ বা অনুরূপ কোনো অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতি থাকবে না।"[২]

وحيث ابحنالها الخروج فانما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة الى مالا يكون داعية الى نظر الرجال والاستمالة.

"যখন আমরা বলি নারীর ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয তখন কয়েকটি শর্ত থাকে। সেজেগুজে বের হবে না। এমন অবস্থায় বের হবে যা পুরুষদেরকে চেয়ে দেখতে বা আকৃষ্ট হতে উৎসাহিত না করে।"[৩]

ইমাম ইবনে কাইয়েমের নিম্নোক্ত উক্তিসমূহ ইসলামী শরীআতের উদ্দেশ্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

انّ ولى الامر يجب عليه ان يمنع من اختلاط الرّجال بالنساء فى الاسواق والفروج ومجامع الرّجال فالامام مسئول عن ذالك والفتنة به عظيمة قال صلى اللّه عَلَيْهِ وَسلّم ما تركت بعدى فتنةً اضرّ على الرّجال من النساء

১. আবু দাউদ, কিতাবুর রাজুল বাব ঃ ফী তীবিল মারআতি লিল খুরুজ।
২. শারহে মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩।
৩. ফাতহুল কাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

www.bjilibrary.com

وفی حدیث اخر انّه قال للنساء لکنّ حافاتُ الطّرق ویجب علیه منع النساء من الخروج متزیّنات متجمّلات ومنعهنّ من الثیاب الّتی یکنّ بها کاسیاتٍ عاریاتٍ کالثّیاب الواسعة والرّقاق ومنعهنّ من حدیث الرّجال فی الطّرقات ومنع الرّجال من ذالك وان رأی ولی الامر ان یفسد علی المرأة اذا تجمّلت وتزیّنت ثیابها بحبرٍ ونحوه فقد رخّص فِی ذالك بعض الفقهاء وأصاب وهذا من ادنی عقوبتهنّ المالیَّة وله ان یحبس المرأة اذا اکثرت الخروج من منزلها ولا سیّما اذا خرجت متجمَّلة بل اقرار النساء علی ذالك اعانةٌ لَّهم علی الاثم والمعصیة واللّه سائل ولیّ الامر عن ذالك وقد منع امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رض النساء من المثنی فی طریق الرّجال والاختلاط بهم فی الطریق فعلی ولیّ الامران یقتدی به فی ذالك.

"বাজারে উন্মুক্ত স্থানে এবং পুরুষদের সমাবেশে পুরুষদের মেয়েদের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত রাখা শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ, ইমাম বা শাসককে এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা, এটা একটা মস্তবড় ফিতনা। এ ফিতনা বন্ধ করা ইমামের অপরিহার্য কর্তব্য। নবী স. বলেছেন, আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়ে কোনো বড় ফিতনা রেখে যাচ্ছি না। অন্য একটি হাদীসে তিনি মেয়েদের লক্ষ করে বলেছেন ঃ রাস্তার এক পাশ দিয়ে তোমাদের চলা উচিত। ইমাম বা শাসকের আরো দায়িত্ব হলো, স্ত্রীলোকদের সেজেগুজে বের হতে নিষেধ করা এবং এমন পোশাক পরিধান করে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি না দেয়া যা পরিধান করার পর তাদের উলঙ্গ মনে হয়। যেমন চওড়া ও পাতলা মিহি কাপড়। তাছাড়া রাস্তায় নারী ও পুরুষের পরস্পর কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখাও তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কোনো কোনো ফিকাহবিদ এমর্মে অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছেন যে, নারী যদি সাজসজ্জা করে বাইরে বের হয় তা হলে কালি বা অন্যান্য বস্তু দ্বারা তার কাপড় চোপড় নষ্ট করে দেয়ার অধিকার শাসকের আছে। এ অত্যন্ত লঘু প্রকৃতির আর্থিক শাস্তি। নারী যদি (বিনা প্রয়োজনে) বার বার বাইরে বেড়াতে যেতে থাকে বিশেষ করে জমকালো ও যৌনতা আবেদনময়ী

www.bjilibrary.com

পোশাক পরে, তাহলে তাকে বন্দী করে রাখার অধিকার ইমামের আছে। বরং এরূপ করতে দেয়া তাকে গোনাহর কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর। হযরত উমর রা. নারীদেরকে পুরুষদের পথে (মাঝ পথ দিয়ে) চলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে শাসকদের হযরত উমর রা.-কে অনুসরণ করা প্রয়োজন।"[১]

পাঁচ ঃ অশ্লীলতার প্রচার অবৈধ

ব্যভিচারের প্রচার নারী পুরুষের বেপর্দা মেলামেশার চেয়ে ফিতনা হিসেবে কোনো অংশে কম নয়। ধ্যান-ধারণা ও আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করতে ও তা বিকৃত করতে প্রচার প্রোপাগাণ্ডা বিরাট ভূমিকা পালন করে। মানুষের কাছে চিন্তা, অনুভূতি ও আবেগের যে পুঁজি আছে প্রচার প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমসমূহ তার ব্যয়ের খাতসমূহ নির্ধারণ করে এবং ঐ পুঁজি কোনো ধরনের পরিতৃপ্তির কাজে ব্যবহার করা উচিত তা বলে দেয়।

যদি ব্যভিচারের দিকে আহ্বানকারীর জিহ্বা কেটে ফেলা হয় এবং গোনাহ ও পাপের অনুশীলন বন্ধ করা যায় তবে জীবনকে পবিত্রভাবে যাপন করা সম্ভব। যে সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পবিত্রতার ধারণার সাথে একেবারেই অপরিচিত যেখানে রেডিও, সংবাদ পত্র ও সাময়িকীসমূহ ব্যভিচারের প্রচারকারী হয়ে বসে আছে এবং যেখানে সাহিত্য ও শিল্পের নামে পাপের প্রসার ঘটানো হচ্ছে, সে সমাজে মানুষ নফস ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে রক্ষা পাবে, তা কি করে সম্ভব ? যেখানে মানুষের আবেগ অনুভূতিতে অগ্নি সংযোগকারী অসংখ্য শক্তি তৎপর সেখানে মানুষ তার পবিত্রতা কি করে রক্ষা করবে ? রাত হোক বা দিন হোক, ঘরে হোক বা বাজারে হোক এবং নির্জনে হোক বা লোকালয়ে হোক যেখানে সর্বাবস্থায় প্রবৃত্তি পূজায় উৎসাহিত করা হচ্ছে সেখানে মানুষ কিভাবে নিজেকে গোনাহ থেকে রক্ষা করবে ?

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা অনেকটা এরূপই ছিল। তাদের সভা-সমাবেশে আখলাক ও শরাফতের নৃত্যের আয়োজন করা হতো। কবি তার কবিত্ব দ্বারা নোংরা আবেগ অনুভূতিকে উত্তেজিত করতো। সাহিত্যিক তার সাহিত্য কর্মের সাহায্যে ব্যভিচারের বিভিন্ন পর্যায়ে ও অবস্থা এমন অশ্লীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করতো যে, কোনো শরীফ মানুষের পক্ষে তা মুখে উচ্চারণ করাও কঠিন ছিল।

ইসলাম ঘোষণা করলো, গোনাহ ও অশ্লীলতার প্রচার কথা ও লেখনীর মাধ্যমে হোক কিংবা শিল্পের নমুনা এবং সভ্যতার পূরাকীর্তির মাধ্যমে

১. আত তুরুকুল হুকমিয়া ফিসসিয়াসাতিস শারীয়া, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৮-২৫৯।

www.bjilibrary.com

হোক, তার প্রকাশ করা জন সমাবেশে হোক বা ব্যক্তিগত মেলামেশার পর্যায়ের হোক অতি বড় ঘৃণ্য এক অপরাধ যা কোনোভাবেই বরদাশত করা যায় না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ۝ - النور : ١٩

"যারা চায় ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। (এর যৌক্তিকতা) আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।"–সূরা আন নূর ঃ ১৯

তাবেয়ী আতা বলেন ঃ

على من اشاع الفاحشة نكل وان صدق.

"যে ব্যক্তি অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়াবে সে সত্য কথা বলে থাকলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।"[১]

কেউ কেউ বৈধ যৌন সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থা এমন সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভঙ্গিতে বর্ণনা করে যে, শ্রবণকারীর পাশবিক স্পৃহা জেগে ওঠে। নবী স. এ কাজ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

انَّ من اشرّ الناس منزلةً يوم الْقيامة الرّجال يفضى الى امرأته ثمَّ ينشر سرّها.

"কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম স্থান হবে সে ব্যক্তির যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং পরে সে গোপন কথা বলে বেড়ায়।"[২]

একবার নবী স. নামাযের পরে উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তখন কি সে পর্দা লটকায় এবং দরজা বন্ধ করে নেয়? জবাবে সবাই বললো, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতপর কি সে মানুষের মধ্যে বসে সেই মিলন মুহূর্তের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে না? এ প্রশ্ন শুনে সবাই চুপ করে রইলো।

মেয়েদের সমাবেশকে লক্ষ করে পুনরায় তিনি একই প্রশ্ন করলেন। তারাও সবাই চুপ রইলো। কিন্তু একটি যুবতী মেয়ে উঠে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ! নারী পুরুষ সবাই পরস্পর এরূপ কথাবার্তা বলে থাকে।

১. আল মুহাল্লাহ, ইবনে হাযম, ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১।
২. মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, বাব ঃ তাহরীমু ইফশায়ে সিররুল মারআতি।

www.bjilibrary.com

মেয়েটির জবাব শুনে তিনি বললেন ঃ

هل تدرون ما مثل ذالك فقال انّما مثل ذالك مثل شيطانة لقيت شيطانا فى السّكّة فقضى منها حاجته والناس ينظرون اليه الا انّ طيب الرّجال ماظهر ريحه ولم يظهر لونه وطيب النّساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه

"এর উপমা কেমন তা কি তোমরা জান ? এর উপমা হলো, কোনো গলির মধ্যে এক মাদি শয়তানের সাথে পুরুষ শয়তানের সাক্ষাত হয়ে গেল, আর মানুষের চোখের সামনে সে (পুরুষ শয়তান) তাকে (মাদি শয়তান) ধরে নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে লেগে গেল। জেনে রাখো, (বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসার নানা পন্থায় হয়ে থাকে। এমন কি সাজসজ্জার মধ্যেও হয়ে থাকে। তাই) পুরুষের প্রসাধন হলো, যার সুগন্ধি আছে কিন্তু রং নেই। মেয়েদের প্রসাধন হলো, যার রং আছে কিন্তু সুগন্ধি নেই।"[১]

عن ابن مسعود رض قال قال رسول اللّه ﷺ لاتباشر المرأة لتنعتها لزوجها كانّما ينظر اليها -

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো স্ত্রীলোক অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সাথে একই কাপড়ের মধ্যে যেন না ঘুমায়। এতে পরে সে তার স্বামীর কাছে তার দেহের সৌন্দর্য এমনভাবে বর্ণনা করতে পারে যাতে মনে হবে সে তাকে দেখছে।"

ছয় ঃ তাযীর

এসব সংস্কার সাধনের পরও যদি কোনো ব্যক্তি বা দল পবিত্রতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ইসলাম পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে। যেসব কর্মতৎপরতা মানবতার জাহাজকে গোনাহর আবর্তের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে ইসলাম তাকে ডালপালা বিস্তার করার কোনো সুযোগই দেয় না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুনাফিকরা তাদের কাজ-কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করছিলো যে, তারা সমাজকে পূত-পবিত্র দেখতে পসন্দ করে না। মানবতার যে কাফেলা, নৈতিকতা ও মর্যাদার পথে এগিয়ে

১. আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, বাব ঃ মা ইয়াকারাহু মিন যিকরির রাজুলী মা ইয়াকুনু মিন ইসাবাতি আহলিহি।

www.bjilibrary.com

চলছিল তাকে তারা সে পথ থেকে বিচ্যুত করতে সচেষ্ট ছিল। কুরআন মজীদ এসব ফিতনাবাজদের কঠোরভাবে সাবধান করেছে এবং বলে দিয়েছে ঃ তারা যেন এ আচরণ থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের ইচ্ছা ফলবতী হওয়ার আগেই তাদের মস্তক চূর্ণ করে দেয়া হবে।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَيُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلاَّ قَلِيْلاً ۝ مَّلْعُوْنِيْنَ ج اَيْنَمَا ثُقِفُوْآ اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً ۝ - الاحزاب : ٦٠-٦١

"যদি মুনাফিকরা, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং যারা মদীনাতে ভীতিজনক গুজব ছড়ায় তারা তাদের এসব আচরণ থেকে বিরত না হয় তাহলে (হে মুহাম্মদ) তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি তোমাকে লাগিয়ে দেব। এরপর তারা এ শহরে তোমার কাছে কমই থাকতে পারবে। তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন তাদের ওপর লা'নত। যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং জঘন্যভাবে হত্যা করা হবে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৬০-৬১

হযরত উমর রা. এমন সব ব্যক্তিবর্গকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন যারা সমাজকে বিপর্যস্ত করার কাজে লিপ্ত ছিল। মদীনায় জা'দাতুস সালমা নামে এক ব্যক্তি ছিল। মুজাহিদরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করতেন তখন এ ব্যক্তি তাদের স্ত্রীদের শহরের বাইরে বাকী নামক স্থানে নিয়ে যেতো এবং তাদের সাথে আলাপ-সালাপে লিপ্ত হতো। মুজাহিদরা বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উমর রা.-কে তা লিখে অবহিত করলো। এতে তিনি ঐ ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন।[১]

এক রাতে হযরত উমর রা. প্রহরা দিচ্ছিলেন। তিনি এক নারীকে কবিতার এ পংক্তিটি আবৃতি করতে শুনলেন ঃ

هل من سبيل الى خمر فاشربها اومن سبيل الي نصر بن حجاج

"মদপানের কোনো সুযোগ কি পাওয়া যেতে পারে এবং নাসর ইবনে হাজ্জাজের কাছে পৌঁছার কি কোনো পথ আছে ?"

পরের দিনই তিনি নাসর ইবনে হাজ্জাজকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে হাজির হলে তিনি দেখলেন সে অত্যন্ত সুন্দর। তাকে বললেন ঃ তোমার চুল কিছুটা ঠিকঠাক করে নাও। সে তার মাথার চুল ঠিক করলে তাকে

১. ফাতহুল বারী, ১২ শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩০।

www.bjilibrary.com

আরো অধিক সুন্দর দেখাচ্ছিলো। এরপর তিনি বললেন ঃ এবার পাগড়ি বাঁধো। সে পাগড়ি পরলে তার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেল।

ঐ নারীর গত রাতের অস্থিরতা এবং দুঃখ ভরা আকুতি থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছিল যে, নাসর ইবনে হাজ্জাজ ও তার মধ্যে অবৈধ ভালবাসা গড়ে উঠেছে। তাই তিনি তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে তাকে বসরায় পাঠিয়ে দিলেন। কারণ, তার মদীনায় অবস্থানের ফলে উভয়ের পাপে লিপ্ত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা ছিল।[১]

একজন হিজড়া ছিল। সে প্রয়োজনে অবাধে সবার বাড়ীতে আসা যাওয়া করতো। কারণ, সবার ধারণা ছিল, তার কোনো যৌন আকাঙ্ক্ষা নেই। একবার সে হযরত উম্মে সালামার ভাই আবদুল্লাহকে বলছিল, তায়েফ বিজিত হলে তোমাকে অতি সুন্দরী অমুক নারীকে দেখাব। তারপর সে এমনভাবে উক্ত মহিলার রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে থাকলো যাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, তার মধ্যেও যৌন আকর্ষণ বিদ্যমান।

ঘটনাক্রমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার সে কথাবার্তা শুনে ফেললেন। এরপর একদিকে তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিলেন সে যেন তোমাদের কাছে না আসে।[২] অপর দিকে কোনো কোনো রেওয়ায়াত অনুসারে তাকে মদীনার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।[৩]

হযরত উমর রা.-ও এক হিজড়াকে বহিষ্কার করেছিলেন।[৪]

হযরত আবু বকর রা. সম্পর্কেও অনুরূপ একটি পদক্ষেপ গ্রহণের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৫]

সাত ঃ পাথর ও বেত্রাঘাতের শাস্তি

ব্যভিচারের পথে যে যতো বেশী অগ্রগামী হতে থাকে ইসলামের শাস্তিও তার জন্য ততো কঠোর হতে থাকে। প্রেম ও ভালবাসার কথা বর্ণনা করার কারণে সে মানুষকে বহিষ্কার করলে পবিত্রতাহানির জন্য তাকেও বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেয়। যদি কেউ তার যৌন কামনার তৃপ্তির জন্য বৈধ ক্ষেত্র ও পন্থা থাকা সত্ত্বেও অবৈধ পন্থায় মজা লুটে বেড়ায় তা হলে তাকে কোনো পবিত্র সমাজে জীবিত থাকার উপযুক্তই মনে করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ নোংরা উপাদান থেকে সমাজকে পবিত্র করা একান্ত প্রয়োজন।

---

১. আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৭৯।
২. বুখারী, কিতাবুল লিবাস ; মুসলিম, কিতাবুস সালাম।
৩. আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, বাব ঃ ফী কাওলিহি গাইরী উলিল ইরবা।
৪. বুখারী, কিতাবুল লিবাস।
৫. বায়হাকী, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৪।

www.bjilibrary.com

কুরআন ঘোষণা করছে ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاءَةَ جَلْدَةٍ ص وَلاَ تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ - النور : ٢

"ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে একশটি করে কোঁড়া মার। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করো তাহলে আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কোনো রকম দয়ামায়া না আসা উচিত। আর তাদের শাস্তি দানের সময় একদল ঈমানদার লোক উপস্থিত থাকা উচিত।"–সূরা আন নূর ঃ ২

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে নবী স. বলেছেন ঃ এ নির্দেশ অবিবাহিত নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে 'রজম' বা পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

عن عبادة بن الصّامت قال قال رسول اللّه ﷺ خذوا عنّى خذوا عنّى فقد جعل اللّه لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مأة ونفى سنة الثيب بالثيب جلد مأة والرّجم -

"উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লও, আমার নিকট থেকে এ নির্দেশটি গ্রহণ করো। আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারিণী নারীদের জন্য উপায় বলে দিয়েছেন। অবিবাহিত নারী ও পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশটি করে কোঁড়া মারতে হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। আর বিবাহিত নারী পুরুষ যদি ব্যভিচার করে তাহলে উভয়কে একশটি করে কোঁড়া মারতে হবে এবং 'রজম' করতে হবে।"[১]

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং দাউদ জাহেরী বলেন ঃ বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাকে প্রথমে কোঁড়া মারতে হবে এবং তারপর 'রজম' করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা র., আবু ইউসুফ র.,

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব ঃ হাদদিয যিনা। নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সনদে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এজন্য শুধু খারেজী এবং কোনো কোনো মুতাযিলা ছাড়া গোটা উম্মত 'রজম' বা পাথর মেরে হত্যা করার ব্যাপারে 'ইজমা' বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। দেখুন, নাইলুল আওতার, ৭ম খণ্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

যুফার র., মুহাম্মদ র., ইমাম শাফেয়ী র., ইমাম মালেক র., ইবনে আবী লায়লা র., আওযায়ী র., সাওরী র., হাসান ইবনে সালেহ র. সহ অধিকাংশ আলেমের মত হলো, 'রজম'-এর সাথে কোঁড়া মারার শাস্তি দেয়া যাবে না।

অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে গোটা উম্মতের 'ইজমা' অনুসারে তাকে একশটি কোঁড়া লাগানো হবে। কিন্তু দেশান্তরকরণ নির্ধারিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত কিনা সে ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত হলো, ব্যভিচারী ব্যক্তি নারী হোক বা পুরুষ হোক অবিবাহিত হলে তাকে একশটি কোঁড়া লাগানো হবে এবং এক বছরের জন্য বহিষ্কারও করা হবে। তবে এর সাথে ইমাম শাফেয়ী আরো এতটুকু যোগ করেন যে, ব্যভিচারী ব্যক্তি ক্রীতদাস হলে তাকে শুধু ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার বা দেশান্তরিত করা হবে।

ইমাম মালেক র. ও ইমাম আওযায়ী র. বলেন ঃ বহিষ্কারের শাস্তি শুধু পুরুষদের দেয়া হবে। মেয়েদের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না। হানাফী ফকীহগণ বহিষ্কারকরণকে শরীআত নির্ধারিত শাস্তির অংশ মনে করেন না। তাদের মতে ইমামের সিদ্ধান্ত এবং সময়ের দাবীর সাথে এর সম্পর্ক। যে পরিস্থিতিতে ইমাম উপযুক্ত মনে করবেন এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবেন আর যখনই তা রাষ্ট্র ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে করবেন তখনই তা স্থগিত রাখবেন।[১]

দেশান্তরকরণের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে। এক, অপরাধীর জন্য প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং এমন পরিবেশ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়া যেখানে গোনাহের কাজে উৎসাহদানকারী উপকরণ ও পরিবেশ বর্তমান আছে এবং যেখানে অবস্থান করে গোনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা তার জন্য অসম্ভব। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, এভাবে অপরাধীর সঠিক পথে ফিরে আসার ব্যাপারে সহযোগিতা হয়। কারণ, জন্মস্থান থেকে দূরে অবস্থান এবং আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া পরিস্থিতি মানুষের যৌন উত্তেজনাকে মাথা তুলতে দেয় না। জীবনের সত্যিকার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ তার যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করার অবকাশ খুব কমই পেয়ে থাকে।

এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম বিশেষ কয়েকটি সীমার মধ্যেই যৌন-তৃপ্তিলাভের অনুমতি দেয়। যে ব্যক্তি এ সীমার বাইরে পা রাখে, ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিনতর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও দ্বিধা করে না। মানুষ তা প্রকৃতিগত আবেগ-অনুভূতিকে

১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আহকামুল কুরআন, জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪ থেকে ৩১৯। নাইলুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৯ থেকে ২৫৬।

www.bjilibrary.com

পরিতৃপ্তি করার ব্যবস্থা করুক ইসলাম তা অবশ্যই চায় এবং সেজন্য সমাজকে সবরকম সুযোগ-সুবিধা দেয়ার নির্দেশও দান করে। কিন্তু মানুষ মনুষ্যত্বের পোশাক খুলে ফেলুক এবং সমাজকে পশুত্বের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করুক সেজন্য ইসলাম কখনো অনুমতি দেয় না। সে মানুষের মতো সৃষ্টির সবচেয়ে প্রিয় সম্পদকে নির্দয়ভাবে খতম করে দেয়া পসন্দ করে, কিন্তু সমাজে ব্যভিচারের ধ্বংসাত্মক জীবাণু লালিত হতে থাক তা বরদাশত করে না।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com